প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে বিভিন্ন পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণের লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে কোনো শিক্ষার্থী, যতটা মনোনিবেশ করবেন ততই বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

২৭তম পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, 2018

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau
of the University Grants Commission.

পরিচিতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

[Post Graduate Political Science (PGPS)]

নতুন সিলেবাস (জুলাই, ২০১৫ থেকে প্রবর্তিত)

ষষ্ঠ পত্র : জনপ্রশাসন

[Paper VI : Public Administration]

উপদেষ্টামণ্ডলী

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য   অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী
অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

বিষয় সমিতি

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত
অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক বর্ণনা গুহঠাকুরতা (ব্যানার্জী)
অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক
অধ্যাপক মনোজ কুমার হালদার

পাঠ রচনা

পর্যায়	একক	রচনা
প্রথম	১—৪	অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী
দ্বিতীয়	১—৪	ড. সোমা ঘোষ
তৃতীয়	১—৪	অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী
চতুর্থ	১—৪	ড. দীপিকা মজুমদার

সম্পাদনা : অধ্যাপক দীপঙ্কর সিন্‌হা

সম্পাদকীয় সহায়তা বিন্যাস এবং সমন্বয়সাধন :

অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক এবং অধ্যাপক মনোজ কুমার হালদার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGPS — (VI)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায়—১ : জনপ্রশাসন : বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশাসনের অনুসন্ধান

একক-১ ☐ জনপ্রশাসন : সনাতন দৃষ্টি 9—15
একক-২ ☐ তুলনামূলক জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসন 16—22
একক-৩ ☐ নয়া জনপ্রশাসন ও নয়া জনব্যবস্থাপনা 23—29
একক-৪ ☐ জনপ্রশাসনের সাম্প্রতিক অগ্রগতি : পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীবাদ 30—36

পর্যায়—২ : প্রশাসনিক তত্ত্বসমূহ

একক-১ ☐ মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি : এলটন মেয়ো, চেস্টার বার্নার্ড ও মেরি পার্কার ফলেট 39—52
একক-২ ☐ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি—হারবার্ট সাইমন 53—63
একক-৩ ☐ উন্নয়ন প্রশাসন—এফ. রিগ্‌স 64—80
একক-৪(ক,খ) ☐ জনপছন্দ তত্ত্ব ও জননীতি বিশ্লেষণ 81—108

পর্যায়—৩ : গণতান্ত্রিক প্রশাসন ও সুশাসন

একক-১ ☐ সুশাসন : অর্থ ও উদ্দেশ্য 111—118
একক-২ ☐ জনপ্রশাসনে দায়বন্ধতা ও স্বচ্ছতা 119—125
একক-৩ ☐ বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা হস্তান্তর ও উন্নয়ন 126—133
একক-৪ ☐ ভারতীয় প্রেক্ষিতে সুশাসন 134—142

পর্যায়—৪ : জনপ্রশাসনের সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ

একক-১ ☐ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন 145—161
একক-২ ☐ জনপ্রশাসন ও সুশীল সমাজ 162—175
একক-৩ ☐ বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন 176—194
একক-৪ ☐ উদারিকরণের যুগে ভারতীয় প্রশাসন 195—211

পর্যায়—১

জনপ্রশাসন : বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশাসনের অনুসন্ধান

একক-১ ❑ জনপ্রশাসন : সনাতন দৃষ্টি
একক-২ ❑ তুলনামূলক জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসন
একক-৩ ❑ নয়া জনপ্রশাসন ও নয়া জনব্যবস্থাপনা
একক-৪ ❑ জনপ্রশাসনের সাম্প্রতিক অগ্রগতি : পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীবাদ

একক-১ ❐ জনপ্রশাসন : সনাতন দৃষ্টি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ তাত্ত্বিক বিষয় হিসাবে এর বিবর্তনের ধারা

১.৪ সনাতন দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য

১.৫ সারসংক্ষেপ

১.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.৭ নির্বাচিত গ্রন্থ

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আমরা জানতে পারবো :

- ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে জন প্রশাসনের বিবর্তন।
- সনাতন জনপ্রশাসনের প্রকৃতি।
- সনাতন দৃষ্টিকোণের সীমাবন্ধতা।
- যে সব চ্যালেঞ্জ উঠে আসছে তার প্রেক্ষিত।

১.২ ভূমিকা

জনপ্রশাসন একই সঙ্গে একটি ক্রিয়া ও একটি তাত্ত্বিক অনুধাবনের ক্ষেত্র। তাত্ত্বিক ক্ষেত্র হিসাবে এটি নবীন এবং প্রধানতঃ পাশ্চাত্যের পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা।

জনপ্রশাসনকে সাধারণতঃ সরকারি প্রশাসন হিসাবে দেখা হয়, যাতে আমলাতন্ত্রের উপর গুরুত্ব থাকে। যদিও বৃহত্তর অর্থে জনপ্রশাসন বলতে জনসাধারণের উপর বড়রকম প্রভাব পড়ে এমন যে কোন প্রশাসনকেই গণ্য করা যায়, সাধারণত প্রথমোক্ত অর্থে জনপ্রশাসনকে দেখা হয়।

আজ গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রশাসনের পাঠ্যক্রম আছে ও বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করতে বিস্তারিত গবেষণা চলছে। সময়ের সাথে সাথে এর পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে।

পাঠ্য বিষয় হিসাবে জনপ্রশাসন যে দিকগুলির উপর গুরুত্ব দেয় সেগুলি হল—

(ক) জনসংগঠনের কাঠামো

(খ) প্রশাসনিক প্রক্রিয়া

(গ) আমলাতান্ত্রিক আচরণ

(ঘ) সংগঠন-পরিবেশ সম্পর্ক।

জনপ্রশাসনের কতকগুলি বিশেষীকৃত জ্ঞানের দিক হল—

(১) প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক তত্ত্ব

(২) জন কর্মী প্রশাসন

(৩) জন অর্থনৈতিক প্রশাসন

(৪) তুলনামূলক জনপ্রশাসন

(৫) জননীতি।

জনপ্রশাসনের সনাতন বা ধ্রুপদী দৃষ্টিকোণ ওয়েবার, উইল্‌সন, টেলর, ফেয়ল ও তাঁর সহযোগীদের হাতে গড়ে ওঠে। এর প্রভাব বিংশ শতাব্দীর এক বড় অংশ জুড়েই লক্ষ করা যায়। ধ্রুপদী তাত্ত্বিকরা সংগঠনের বিশ্বজনীন নীতি গড়ে তোলার উপর জোর দেন। আনুষ্ঠানিক সংগঠনের উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে। ধ্রুপদী জনপ্রশাসনের মূল ধারণা ছিল—(১) রাজনীতি-প্রশাসন বিভাজন, (২) সব সরকারের একটি কেন্দ্র ও ক্ষমতার উৎস, (৩) ক্রমোচ্চ বিন্যাস ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি।

১.৩ তাত্ত্বিক বিষয় হিসাবে এর বিবর্তনের ধারা

মহাভারতের শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্বে রাষ্ট্র পরিচালন, সরকার ও প্রশাসন প্রসঙ্গে আলোচনা আছে। ম্যাকিয়াভেলি-র দু হাজার বছর আগে, বিষ্ণু গুপ্ত,—যিনি চাণক্য বা কৌটিল্য নামে বেশি পরিচিত—অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। তাতে তিনি সরকার ও প্রশাসনের পদ্ধতি, রাজার কর্তব্য, মন্ত্রী ও আমলাদের কথা, এমনকি কূটনীতির পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

ইউরোপে ১৯ শতকের মধ্যে জনপ্রশাসন তার একটা স্থান করে নিয়েছিল। ফরাসি, জার্মান ও ব্রিটিশ তাত্ত্বিকরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তবে সময়ের সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জনপ্রশাসনের একক বৃহত্তম তথ্যসূত্র হিসাবে উঠে আসে।

আনুষ্ঠানিক অর্থে জনপ্রশাসন ১৮৮৭-এ তাত্ত্বিক বিষয় হিসাবে উদ্ভূত হয়। ১৮৮৭-এর জুন-এ *Political Science Quarterly*-তে উড্‌রো উইল্‌সনের *'The Study of Administration'* শীর্ষক ২৬ পাতার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

রচনাটিতে উইল্‌সন্ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য করার আর্জি রাখেন। ফলে, জনপ্রশাসনের পৃথক বিশেষীকৃত জ্ঞানচর্চার বিষয় হিসাবে উঠে আসার যুক্তি তৈরি হয়। উইল্‌সন তাঁর নিবন্ধটিতে বলেন, 'একটি সংবিধান রচনা করার চেয়ে তাকে কার্যকর করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে উঠছে।' তিনি মনে করেন, 'প্রশাসনের একটি বিজ্ঞান থাকা উচিত; সেটি সরকার পরিচালনের পথকে সোজা করবে, ...তার সংগঠনকে শুদ্ধ ও শক্তপোক্ত করবে...।' উইল্‌সনের এই নিবন্ধটি আমলাতন্ত্রের সংশোধনের দাবীর সপক্ষে আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে spoils system-এর গভীর শিকড় ছিল যা গৃহ যুদ্ধের সময়ে তুঙ্গে ওঠে। এক বিক্ষুব্ধ কর্মপ্রার্থীর হাতে যখন মার্কিন

রাষ্ট্রপতি গার্‌ফিল্ড (Garfield) খুন হ'ন তখন ১৮৮৩-তে কংগ্রেস Pendleton Act পাস করে। এর ফলে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মনিয়োগের পথ খুলে যায়। উইল্‌সন্ এই Act-এর পক্ষে সক্রিয় প্রচারক ছিলেন।

উইলসন জনপ্রশাসনের পিতা হিসাবে স্বীকৃত। বেশ কিছু সময়কাল ধরে উইলসনের রাজনীতি প্রশাসনের বিভাজনের ধারণাটা প্রশাসন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। এই বিভাজনের ধারণার ফলে জনপ্রশাসনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে পৃথকীকরণের যুক্তি খাড়া করা যায়। ১৯২৫ পর্যন্ত এটাই প্রাধান্য পায়।

১৯০০ সালে ফ্র্যাঙ্ক জে. গুড্‌নাও-এর Politics and Administration প্রকাশিত হয়। তাতে উইলসনের তত্ত্বটিকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়। বলা হয়, রাজনীতি ও প্রশাসন সরকারের দুটি পৃথক কাজ। রাজনীতি 'রাষ্ট্রের নীতি বা ইচ্ছার প্রকাশ'-এর সঙ্গে জড়িত। প্রশাসন সেই নীতিগুলির রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত। এই কাজগুলি করার সংস্থাগুলিও আলাদা। রাজনীতির ক্ষেত্র হল আইনসভা ও সরকারের উঁচু তলা, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ হয়। অপর দিকে, প্রশাসন যুক্ত থাকে আমলাতন্ত্রের সাথে।

১৯২৬-এ লিওনার্ড ডি. ওয়াইট্-এর *Introduction to the Study of Public Administration* প্রকাশিত হয়। এটি জনপ্রশাসনের উপর রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক। এর ভিত্তিই ছিল রাজনীতি প্রশাসন বিচ্ছেদ। বলাবাহুল্য, এই দৃষ্টিকোণ জনপ্রশাসনের পৃথক পাঠ্য বিষয় হিসাবে উঠে আসায় সহায়ক হয় ও তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। তবে সময়ের সাথে সাথে এই দৃষ্টিকোণের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তা বর্জনের দাবী ওঠে।

জনপ্রশাসনের বিবর্তনের ধারায় একটা সময় আসে যখন রাজনীতি-প্রশাসন বিচ্ছেদের উপর জোর দেওয়া হয় ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপন বিজ্ঞান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলে। এই সময়ে জনপ্রশাসনের 'জন' অংশটার গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং সম্পূর্ণ গুরুত্ব দক্ষতার উপর আরোপ করা হয়। 'মুল্যবোধ', 'রাজনীতি' বিষয়গুলি অবান্তর হয়ে যায়। প্রশাসক ও শিল্পমহল হাত মিলিয়ে ব্যবস্থাপনার যান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলতে সক্রিয় হন। সংগঠনকে সুষ্ঠভাবে সংগঠিত করা, দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন ব্যবস্থাপন নীতি গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। ফ্রেডারিক্ উইন্‌স্‌লো টেলার ও আঁরি ফেয়লের রচনাদি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ফ্রেডারিক উইন্‌স্‌লো টেলর্ (১৮৫৬-১৯১৫) তাঁর সময় ও গতি সমীক্ষার (Time and Motion Study) মাধ্যমে ধ্রুপদী জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা' (Scientific Management) আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সংগঠনের নিম্নতম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শ্রমিকদের কাজের উপর।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর টেলর জোর দেন—

(১) পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের পৃথকীকরণ

(২) Functional Foremanship-এর ধারণা

(৩) সময় ও গতি সমীক্ষা

(৪) প্রেরণামূলক ফুরন মজুরি নীতি

টেলর তাঁর নীতিগুলিতে কর্ম প্রক্রিয়ার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানেজারের নিপুণ পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে টেলরের পরিচালন পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। ১৯১১-য়

প্রকাশিত টেলরের *Principles of Scientific Management* জার্মান ভাষায় অনুদিত হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে ‘টেলরবাদ’ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিছু লেখক আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামোর উপর ও মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উপরে জোর দিয়ে ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব (Classical Management Theory) বা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব (Administrative Management Theory) গড়ে তোলেন। এই তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা ছিলেন আঁরি ফেয়ল্, লুথার গুলিক ও লিন্ডাল্ আউইক্।

আঁরি ফেয়ল্ তাঁর ১৯১৬-য় প্রকাশিত General and Industrial Administration-এ প্রশাসনের মূল কাজগুলিকে নিম্নরূপ চিহ্নিত করেন—

(১) পরিকল্পনা করা।

(২) জনসম্পদ ও উৎপাদন সামগ্রী সংগঠিত করা।

(৩) অধস্তনদের কি করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া।

(৪) সমন্বয় সাধন করা।

(৫) নিয়ন্ত্রণ করা।

ফেয়ল্ সংগঠনের কাজকে ছটি ভাগে ভাগ করেন—টেক্নিক্যাল, বাণিজ্যিক, আর্থিক, নিরাপত্তামূলক, হিসাব রক্ষা ও প্রশাসনিক।

তিনি প্রশাসকদের কাজের সুবিধার জন্য চোদ্দটি নীতির কথা বলেন—

(১) শ্রম বিভাজন

(২) কর্তৃত্ব

(৩) শৃঙ্খলা

(৪) আদেশের ঐক্য

(৫) নির্দেশের ঐক্য

(৬) ব্যক্তি স্বার্থের ওপর সার্বিক স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করা

(৭) কর্মীদের পারিশ্রমিক প্রদান

(৮) কেন্দ্রীকতা

(৯) কর্তৃত্বের শৃঙ্খল

(১০) বিন্যাস

(১১) সাম্য

(১২) চাকুরির স্থায়িত্ব

(১৩) উদ্যোগ

(১৪) গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কাজ করা

ফেয়লের মতাদর্শ—লুথার্ গুলিক্ ও লিন্ডাল্ আরউইক (Urwick)-এর হাতে আরো সম্প্রসারিত হয়। ১৯৩৭-এ লুথার্ গুলিক্ ও লিন্ডাল্ আউইক্-এর Papers on the Science of Administration প্রকাশিত হয়। তাঁরা প্রশাসনিক

কতকগুলি নীতির প্রচারে POSDCoRB শব্দটি প্রয়োগ করেন। নীতিগুলি হল—পরিকল্পনা (Planning), সংগঠন (Organisation), কর্মী সংস্থান (Staffing), নির্দেশনা (Directing), সমন্বয়সাধন (Coordinating), তথ্যজ্ঞাপন (Reporting) ও বাজেট করা (Budgeting)। ইংরাজি শব্দগুলির প্রথম অক্ষরগুলি একত্রিত করে POSDCORB শব্দটি তৈরি হয়।

১৯২৭-১৯৩৯-এর মধ্যে প্রশাসনিক সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতি গড়ে তোলার বেশ কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে ১৯২৭-এ ডবলিউ. এফ্. উইলোবি-র *Principles of Public Administration*-এর প্রকাশ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে মেরি পার্কার ফলেট্, *Creative Experience*, ১৯২৪ ও জেমস্ ডি মুনি ও অ্যালেন্ সি. রিলি-র *Principles of Organization*, ১৯৩৯।

ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনায় ম্যাক্স ওয়েবারের (১৮৬৪-১৯২০) নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর আমলাতান্ত্রিক মডেল সাধারণতঃ ধ্রুপদী প্রশাসনিক চিন্তার মধ্যে স্থান পায়। সাধারণতঃ দুটি কারণে তাঁকে এই গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়। প্রথমতঃ তিনি রাজনীতিবিদ্ ও প্রশাসকের সম্পর্ক অন্যান্য ধ্রুপদী চিন্তাবিদ্‌দের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক কর্তাদের প্রেক্ষিতে প্রশাসকের নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা উচিত। এই দৃষ্টিকোণ রাজনীতি প্রশাসন বিভাজন প্রসঙ্গে অন্যান্য ধ্রুপদী চিন্তাবিদদের মতন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর আদর্শ আমলাতন্ত্রের ধারণা সংগঠন সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতির ধ্রুপদী ধারণার সঙ্গে অনেকটাই মেলে। তবে, এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সময়কাল হিসাবে ওয়েবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের ও ধ্রুপদী প্রশাসনিক চিন্তার প্রাথমিক পর্যায়ের সময়ের হলেও ঐ চিন্তাবিদ্‌দের অধিকাংশই তাঁর রচনার সাথে পরিচিত ছিলেন না। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর যখন তাঁর Wirtschaft ও Gesellschaft-এর বড় অংশ ইংরাজিতে অনূদিত হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর রচনার পরিচিতি ঘটে।

১.৪ সনাতন দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য

জনপ্রশাসনের বিবর্তনের শুরুর দিকে বেশ কিছু বছর ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গি জনপ্রিয় ছিল। যদিও তার কোনো একটি সুস্পষ্ট ধারা ছিল না, তবুও এই সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিকে সরকারি প্রশাসনের জন্য সব থেকে সফল তত্ত্ব বলে মনে করা হত। এর তাত্ত্বিক উৎস ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উইলসন ও টেলরের চিন্তায়, আর জার্মানিতে ম্যাক্স ওয়েবারের চিন্তায়। তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্রুপদী জনপ্রশাসন নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। নতুন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবেশ নতুন চিন্তা-ভাবনার উদ্ভবের পরিবেশ তৈরি করে। এই পটভূমিতে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভব ঘটে। তার সাথে যুক্ত থাকে হার্বার্ট সাইমন্, ডুয়াইট ওয়াল্ডো ও পল্ অ্যাপেল্‌বি-র নাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জনপ্রশাসনের ধ্রুপদী দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ ও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে প্রশ্নের মুখে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধিক মতবাদ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। সনাতন মতবাদের সব থেকে বড় সমালোচক ছিলেন হার্বার্ট সাইমন্। তাঁর কাজ সনাতন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল।

১৯৪৭-এ হার্বার্ট সাইমনের *Administrative Behaviour* প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি সনাতন জনপ্রশাসনের তাঁর ভাষায় 'প্রবাদ'গুলির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর উপর গুরুত্ব না দিয়ে জনপ্রশাসনের সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া উচিত। ডুয়াইট্ ওয়াল্ডো তাঁর *The Administrative State*-এ বলেন যে, বাস্তবে রাজনীতি ও প্রশাসনের মধ্যে বিভাজন বজায় রাখা সম্ভব নয়। উনি প্রশাসনিক রাজনীতির কথা বলেন। *Morality and Administration in Democratic Government*-এ পল্ অ্যাপেল্‌বি প্রশাসনিক নৈতিকতার বিষয়টি তোলেন।

ধ্রুপদী মতবাদের বহু দুর্বলতা চিহ্নিত হতে থাকে। মনে করা হয়, সনাতন তাত্ত্বিকরা প্রশাসন সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন; সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর উপরই তাঁদের নজর সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদের চোখে সংগঠনের বাইরের পারিপার্শ্বিকের সংগঠনের উপর কোন প্রভাব ধরা পড়ত না। তাঁরা মনে করতেন, ব্যক্তি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উৎসাহদানে উৎসাহিত হয়। অন্য কিছু উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে না।

সময়ের সাথে সাথে ধ্রুপদী চিন্তাবিদ্‌রা যে সব সমালোচনার মুখে পড়েন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) তাঁদের নীতিগুলো পরীক্ষিত নয়; সার্বিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়।

(২) তাঁরা সংগঠনে ব্যক্তিকে অবহেলা করেন—তাদের নিরুত্তাপ যন্ত্রের মত বিবেচনা করেন।

(৩) তাঁরা কর্তৃপক্ষের প্রতি পক্ষপাত দেখান; আনুষ্ঠানিক সংগঠনের উপর জোর দেন ও সংগঠনের অ-আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডকে তাচ্ছিল্য করেন।

(৪) আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে অ-আনুষ্ঠানিক ও আচারণগত ধারাগুলি অগ্রাহ্য হয়।

(৫) সংগঠনকে ধ্রুপদী চিন্তাবিদ্‌রা একটি পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন closed system হিসাবে দেখেন।

১.৫ সারসংক্ষেপ

জনপ্রশাসনের একটি পৃথক বৌদ্ধিক বিষয় হিসাবে উঠে আসার পিছনে আছে উইল্‌সনের ১৮৮৭ (জুন)-এ *Political Science Quarterly*-তে প্রকাশিত নিবন্ধ। যদিও তার আগে প্রশাসনের উপর লেখাপত্র ছিল, রাজনীতি ও প্রশাসনের পৃথকীকরণের দাবী ও প্রশাসন বিষয়ে পৃথক পাঠের অনুরোধ রাখায় উইলসনের নিবন্ধ বিশেষ গুরুত্ব পায়। জনপ্রশাসনের সনাতন বা ধ্রুপদী দৃষ্টিকোণ প্রধানতঃ উইল্‌সন্, টেলর্, ফেয়ল্, ওয়েবার্ ও তাঁদের অনুগামীদের পথ ধরে গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ্য দিক ছিল—রাজনীতি প্রশাসন বিভাজন ও সব সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ নীতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। এছাড়াও, সনাতন মতবাদে সংকীর্ণভাবে আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়; সংগঠনের কার্যাবলির সূক্ষ্ম দিকগুলি ও পরিবেশের সাথে সংগঠনের অন্তর্সম্পর্ক অবহেলিত থাকে।

১.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) পৃথক আলোচ্য বিষয় হিসাবে জনপ্রশাসনের ক্রমবিবর্তন আলোচনা করুন।

(২) জনপ্রশাসন বিষয়ে ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা কী কী?

(৩) রাজনীতি ও জনপ্রশাসনের বিভাজনের পক্ষে কারা বক্তব্য রাখেন এবং তাঁদের যুক্তি কী ছিল?

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে উইল্‌সনের অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

(২) কি কি নীতিকে POSDCORB-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়?

(৩) ফেয়ল্ প্রশাসকদের কাজের সুবিধার জন্য কয়টি নীতির কথা বলেন? সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসনের সনাতন দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(২) ফেয়ল্ সংগঠনের কাজকে কয়টি ভাগে ভাগ করেন? সেগুলি কী কী?

১.৭ নির্বাচিত গ্রন্থ

Waldo, Dwight ed, (১৯৫৩), *Ideas and Issues in Public Administration*, McGraw-Hill, নিউ ইয়র্ক।

Goodnow, Frank J., (১৯০০), *Politics and Administration : A Study in Government*, Macmillan.

Maheshwari, Shriram, (২০০৩), *Administrative Theory : An Introduction*, Macmillan India, দিল্লি।

Bhattacharya, Mohit. (২০০৮), *New Horizons of Public Administration*, Jawahar Publishers and Distributors, দিল্লি।

Self, Peter, (১৯৭৯), *Administrative Theories and Politics : An Enquiry into the Structure and Process of Modern Government*, Allen and Unwin, লন্ডন।

Basu, Rumki, (২০০৪), *Public Administration : Concepts and Theories*, Sterling Publishers, নয়া দিল্লি।

বসু, রাজশ্রী, (২০০৫), *জনপ্রশাসন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, (২০০৪), *আধুনিক জনপ্রশাসনের রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, নবোদয় পাবলিকেশনস্, কলকাতা।

একক-২ ☐ তুলনামূলক জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসন

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ তুলনামূলক জনপ্রশাসনের উদ্ভব

২.৪ তুলনামূলক জনপ্রশাসনের প্রকৃতি

২.৫ তুলনামূলক জনপ্রশাসনের সমস্যা

২.৬ উন্নয়ন প্রশাসনের মূল কথা

২.৭ উন্নয়ন প্রশাসনের উদ্দেশ্য

২.৮ উন্নয়ন প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা

২.৯ সারসংক্ষেপ

২.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.১১ নির্বাচিত গ্রন্থ

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আমরা জানতে পারবো—

- কি পরিস্থিতির মধ্যে তুলনামূলক জনপ্রশাসন ও উন্নয়নে প্রশাসনের উদ্ভব ঘটে।
- তুলনামূলক জনপ্রশাসনের গুরুত্ব।
- তুলনামূলক জনপ্রশাসনের প্রকৃতি।
- উন্নয়ন প্রশাসনের মূল কথাগুলি।
- উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য।
- উন্নয়ন প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা।

২.২ ভূমিকা

উন্নয়ন ও তুলনামূলক দিকগুলি জনপ্রশাসনের বৌদ্ধিক ও প্রয়োগিক ক্ষেত্রের দুটি দিক। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিসাবে এই দিকগুলির অগ্রগতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঘটে এবং ১৯৬০-এর দশকে শীর্ষে পৌঁছয়। উন্নয়ন প্রশাসন ও তুলনামূলক

জনপ্রশাসন সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি, নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের পটভূমিতে উদ্ভূত হয়।

২.৩ তুলনামূলক জনপ্রশাসনের উদ্ভব

অনেকগুলি কারণ জ্ঞান চর্চার এই দিকটি গড়ে ওঠার পিছনে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে আচরণবাদী বিপ্লব ঘটে, জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, সনাতন জনপ্রশাসনের দুর্বলতাগুলি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকায় অনেকগুলি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নেয়; এগুলি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা অর্জন করার জন্য নতুন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন অনুভূত হয়। আর সর্বশেষ, তুলনামূলক জনপ্রশাসনের অগ্রগতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছ থেকে আসা অর্থ তার গবেষণার উৎসাহ প্রদান করে।

আমেরিকান সোসাইটি অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আস্‌পা) ও আমেরিকান পলিটিকাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন (আপ্‌সা)-র ছত্রছায়ায় ১৯৬৩-তে একদল গবেষক Comparative Administration Group (CAG) গঠন করে। গোড়ার দিকে ফোর্ড ফাউন্ডেশন তাঁদের আর্থিক অনুদান দেয়। ১৯৭০ পর্যন্ত এর নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রেড রিগ্‌স্‌। লিওনার্ড ওয়াইট্‌-এর মতো জনপ্রশাসনের উৎস পুরুষরা মনে করতেন সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন বড় প্রভাব ফেলে না এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতি গড়ে তোলা সম্ভব; তুলনামূলক জনপ্রশাসনের প্রবক্তারা কিন্তু তা মনে করতেন না। তাঁদের লক্ষ ছিল যথার্থ তুলনামূলক তত্ত্ব গড়ে তোলা। ফ্রেড্‌ রিগস্‌-এর নেতৃত্বে ও ফোর্ড ফাউন্ডেসনের অনুদানে Comparative Administration Group (CAG) গঠিত হওয়ায় তুলনামূলক জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে বড় উৎসাহ আসে। ফোর্ড ফাউন্ডেসনের সাহায্য ১৯৭১-এ শেষ হয়।

২.৪ তুলনামূলক জনপ্রশাসনের প্রকৃতি

তুলনামূলক জনপ্রশাসন ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশগত পটভূমিতে বা আন্তর-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জনপ্রশাসনের অধ্যয়ন করায় ও তাত্ত্বিক মডেল গড়ে তোলায় ব্রতী হয়।

ফেরেল্‌ হেডি তুলনামূলক জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে পাঁচটি উদ্দীপকের উল্লেখ করেন। সেগুলি হল—

— তত্ত্বের অনুসন্ধান;

— বাস্তব প্রয়োগের আগ্রহ;

— বৃহত্তর ক্ষেত্রে তুলনামূলক রাজনীতির প্রভাব;

— প্রশাসনিক আইনের ধারায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল গবেষকের আগ্রহ;

— জনপ্রশাসনের সমস্যার তৎকালীন চলমান তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

উপনিবেশবাদের অবসানের পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বহু নতুন স্বাধীন দেশের জন্ম হওয়ায় তুলনামূলক জনপ্রশাসন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। রবার্ট ডাহ্‌ল্‌ (Robert Dahl) ও ডুয়াইট ওয়াল্ডো (Dwight Waldo)-র মতন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে সাংস্কৃতিক কারণের ফলে এক দেশের জনপ্রশাসন অন্য দেশের জনপ্রশাসনের থেকে পৃথক হতে পারে। তাঁরা মনে করেন, জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অধ্যয়ন ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসনের নীতি রূপায়ণের পার্থক্য ও সাদৃশ্য বুঝতে সাহায্য করবে।

তুলনামূলক জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, এই ক্ষেত্রে নানা দৃষ্টিকোণ বা মতবাদ থাকলেও কোনো একটির প্রাধান্য বা অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত মতবাদ এখনও লক্ষ্য করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যেমন রিগ্স্ বলেন, তুলনামূলক জনপ্রশাসনে তিনটি ধারা দেখা যায়—(১) 'কি হওয়া উচিত' থেকে 'কি আছে'-র দৃষ্টিভঙ্গি; (২) 'কি আছে' বা এম্পিরিকাল দৃষ্টিকোণেও এক একটি দেশের বিষয়ে অধ্যয়নের পরিবর্তে মূল প্যাটার্ন বা বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানে বেশি জোর দেওয়া হয়; (৩) অ-পরিবেশগত মতবাদের থেকে পরিবেশগত মতবাদের দিকে ঝোঁকা। তৃতীয়তঃ, বলা যায়, এই অধ্যয়ন ক্ষেত্রটিতে মার্কিন গবেষকদের আধিপত্য লক্ষণীয়। অবশেষে, তুলনামূলক জনপ্রশাসন তত্ত্বগঠন ও উন্নয়ন প্রশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

তুলনামূলক গবেষণার অবশ্যই অনেক সুবিধা আছে। সেগুলির মধ্যে আছে—

(১) প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর স্থানীয়ভাবে মডেল গড়ে তোলায় সাহায্য করে।

(২) ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা অর্জন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উন্নততর করায় সাহায্য করে।

(৩) অনুন্নত অঞ্চলের প্রশাসনিক সমস্যাদি বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

(৪) জনপ্রশাসনের পরিধি বিস্তৃত করে।

তুলনামূলক জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে দুটি মডেল প্রাধান্য পেয়েছে। একটি হল ম্যাক্স ওয়েবারের বুরোক্র্যাটিক মডেল; এটি মূলত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে যুক্ত। অপরটি হল ফ্রেড্ রিগ্স্-এর প্রিজম্যাটিক্ সালা মডেল। এগুলি ছাড়াও আছে ট্যালকট পার্সনের স্ট্রাক্চারাল ফাংশানাল মডেল, জন টি জর্সি-র ইকুইলিব্রিয়াম তত্ত্ব, পল মেয়র, ব্রায়ান চ্যাপম্যান ও এফ. এম. মার্কস-এর কর্মী ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করা মডেল সমূহ ইত্যাদি। তবে ওয়েবার ও রিগ্স্-এর মডেল ছাড়া অন্য মডেলগুলি তেমন সাফল্য অর্জন করেনি।

২.৫ তুলনামূলক জনপ্রশাসনের সমস্যা

তুলনামূলক জনপ্রশাসনের অগ্রগতির পথে নানা সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। যথা—

(১) কর্মসূচিগুলি ব্যয়বহুল—কোন একটি গোষ্ঠী বা সংস্থার ক্ষমতার বাইরে।

(২) ভাষাগত সমস্যা।

(৩) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।

(৪) কর্মসূচিগুলিতে বিশেষ মূল্যবোধজনিত সমস্যা; পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির শ্রেষ্ঠত্ব আছে এমনটাই ধরে নেওয়া হয়।

(৫) সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতির অভাব।

এছাড়াও তুলনামূলক জনপ্রশাসনের অগ্রগতির পথে আরো কিছু বাধা আছে। সেগুলির মধ্যে আছে পাশ্চাত্যের দেশগুলি ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য, জনপ্রশাসনের এই উপ-এলাকায় পাঠ্যসূচির অভাব ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষণীয় তাত্ত্বিক মডেলের উদ্ভাবনের অভাব।

তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলক জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসন সত্তরের দশক থেকে বৌদ্ধিক ও আর্থিক সমর্থনের ঘাটতির মুখে পড়ে। তবে, ১৯৮০-র দশক থেকে জনপ্রশাসনের এই দুটি ক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে ও উল্লেখযোগ্য গবেষণাধর্মী কাজের সংখ্যা এইসব ক্ষেত্রে বাড়তে থাকে।

২.৬ উন্নয়ন প্রশাসনের মূল কথা

উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে অনেকাংশেই বলা যায় তুলনামূলক জনপ্রশাসনের প্রয়োগিক দিক বা শাখা হিসাবে গড়ে ওঠে। এর মোটামুটি দুটি কারণ ছিল। এক, উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রশাসনিক সমস্যাদির অনুসন্ধানের ব্যাপারে সি.এ.জি-র আগ্রহ। দ্বিতীয়তঃ, এই দেশগুলির আর্থিক উন্নয়ন বিষয়ে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের দেওয়া অ্যাজেন্ডা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি যখন স্বাধীন হয় তখন তারা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহু ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়; অতি অল্প সময়ে তাদের সেই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। সমস্যাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ব্যাপক দারিদ্র্য, বহু সামাজিক সমস্যা, ব্যাপক হারে নিরক্ষরতা, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা, হাজার হাজার নিরাশ্রয় মানুষ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। সব মিলিয়ে ক্ষমতাসীন এলিটের কাজ হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত কঠিন। তাদের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে। এই রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই ছিল কৃষিনির্ভর যেখানে শিল্পের বিকাশ কমই হয়েছে। এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে মাপের শিল্প বিকাশ প্রয়োজন তা ঘটানোর মত সম্পদ তাদের ছিল না।

সহজেই বোঝা যায়, অল্প সময়ে এই সব সমস্যার মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্র ছাড়া আর কারো পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। এই মাপের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, রসদ, পরিকাঠামো বা আগ্রহ বেসরকারি সংস্থাদের থাকবে না।

ফ্রেড রিগ্‌স্‌-এর মতে, ("The Context of Development Administration" এফ. ডব্লিউ রিগ্‌স্‌ সম্পাদিত, *Frontiers of Development Administration,* 1971)—"উন্নয়ন প্রশাসন তাকেই বলে যেখানে, যাঁরা জড়িত তাঁদের মতে, উন্নয়নের অগ্রগতির উদ্দেশ্য সাধিত হবে এমন প্রকল্প সংগঠিতভাবে কার্যকর করার প্রচেষ্টা চালানো হয়..."। উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি প্রধানতঃ জাতি গঠন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

জর্জ গান্ট-এর মতে, উন্নয়ন প্রশাসন "জনপ্রশাসনের সেই দিক যেখানে সরকারি সংস্থাকে সংগঠিত ও পরিচালন করা হয় এমন ভাবে যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে উদ্দীপিত করে ও তার সহায়ক হয়। সরকারিভাবে উন্নয়নের উপযোগী করার লক্ষ্যে পরিচালন প্রক্রিয়াকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ও প্রয়োগ করা হয়।" এড্‌ওয়ার্ড ডব্লিউ ওয়াইডনার-এর মতে, "উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ উদ্ভাবন প্রবর্তন করা উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য।"

উন্নয়ন প্রশাসনের সারমর্মকে নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরা যায়—

> যে সব পরিস্থিতিতে (সাবেকী, পরিবর্তনশীল ও সদ্য স্বাধীন হওয়া ও কম উন্নত দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়), যেখানে অস্বাভাবিক রকম বহুবিস্তৃত প্রয়োজন (যেগুলি মিলতে পারে রাজনৈতিক এলিটের দাবীসমূহের সঙ্গে, উন্নয়নকামী মতবাদের সঙ্গে ও সংগঠিত করার প্রচেষ্টার সাথে) এবং অদ্ভুত রকমের অপ্রতুল সম্পদ ও প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে তীব্র বাধা আছে, সেখানে উন্নয়ন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এক বৈশিষ্ট্যের চেতনা থাকে।

ব্যাপক প্রয়োজন, স্বল্প সক্ষমতা ও তীব্র বাধার অস্বস্তিকর মেলবন্ধনে উন্নয়ন প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য। একদিকে আছে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তনের পথ খোঁজা, এবং অন্যদিকে আছে প্রশাসনের প্রতি অবিশ্বাস ও অসন্তোষ যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনবিরোধী অবস্থানের সৃষ্টি করে।

২.৭ উন্নয়ন প্রশাসনের উদ্দেশ্য

উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য হল পরিবর্তনকে একই সাথে সম্ভব ও আকর্ষণীয় করা। উন্নয়নশীল দেশগুলি যখন আর্থ-সামাজিক আধুনিকিকরণের গন্ডি পার হওয়ার প্রচেষ্টা চালায় তখন অভূতপূর্ব দ্রুত ও ব্যাপক হারে পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই বিপুল পরিবর্তনের কথা ভাবা যেতো না।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কর্মসূচী রূপায়ণ করতে উন্নয়ন প্রশাসন মূলতঃ কর্মভিত্তিক (action oriented) ও লক্ষ্যভিত্তিক (goal oriented) প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আমলাতন্ত্রকে জাতি গঠনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে যোগানকে উন্নয়নগত উৎপাদনে পরিণত করা যায়। বিপুল এই কাজের জন্য একমাত্র আমলাতন্ত্রেরই মূলধন, আগ্রহ ও দায়বদ্ধতা থাকা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য হল উন্নয়নের ব্যবস্থাপনা। এর জন্য প্রয়োজন হয় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা ও সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক দক্ষতার চেয়েও প্রয়োজন হয় অংশগ্রহণভিত্তিক, সংবেদনশীল ও দায়বদ্ধ ব্যবস্থাপনা। এখানে আশা করা হয় ব্যবস্থাপক সংস্থা, জনগণকে সংগঠিত করে সক্রিয় সমর্থন অর্জন করবে, মানুষের দাবী-দাওয়ার প্রতি সংবেদনশীল হবে ও তাদের কাছে দায়বদ্ধতা বজায় রাখবে। জর্জ গান্ট-এর ভাষায়, *(Development Administration : Concepts, Goals, Methods,* The University of Wisconsin Press, ১৯৭৯) 'উন্নয়ন প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য হল তার উদ্দেশ্য, তার দায়বদ্ধতা ও তার দৃষ্টিভঙ্গি।' সনাতন প্রশাসনিক নীতির পরিবর্তে প্রয়োজন হয় নমনীয়তা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

উন্নয়ন প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের কাজ হওয়া উচিত স্থায়িত্ব বজায়ের উপর জোর না দিয়ে পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তার দূরদর্শিতা থাকা উচিত; তার পারিপার্শ্বিকে বড় পরিবর্তনের গতি ও দিক নির্ণয় করার ক্ষমতা থাকা দরকার; তার পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। রাজনৈতিক স্তরে পরিকল্পিত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারা উচিত, আর নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকা উচিত।

উন্নয়ন প্রশাসন আন্দোলন সনাতন জনপ্রশাসন থেকে স্পষ্টতই পৃথক ছিল। তত্ত্ব ও প্রয়োগের দিক থেকে এটি পরবর্তীকালে উদ্ভুত হয়। সনাতন ও উন্নয়ন প্রশাসনের পার্থক্যগুলো কিছুটা কাঠামোগত ও কিছুটা আচরণগত।

২.৮ উন্নয়ন প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা

উন্নয়ন প্রশাসনকে বেশ কিছু সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। তার মধ্যে কতকগুলি হল—

(১) উন্নয়ন ও অ-উন্নয়ন প্রশাসনের পার্থক্য নেহাৎই কৃত্রিম। উন্নয়ন প্রশাসন ও জনপ্রশাসনের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে।

(২) উন্নয়ন প্রশাসন আমলাতন্ত্রকে তার যোগ্যতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেয়।

(৩) উন্নয়নশীল দেশগুলির মৌলিক অসাম্যকে উন্নয়ন প্রশাসন ধামাচাপা দেয়। যতদিন সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাস অ-পরিবর্তিত থাকবে ততদিন উন্নয়ন প্রশাসন রাষ্ট্রের আসল মতাদর্শগত চরিত্রকে আড়াল করবে।

(৪) সমালোচকদের একাংশ মনে করেন পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন প্রশাসন মদৎ দেওয়ার স্বার্থ আছে। সদ্য

স্বাধীন হওয়া উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিকে উন্নয়নের লক্ষ্যে সাহায্য দেওয়ার মাধ্যমে সেই দেশগুলির রাজনীতি ও অর্থনীতিকে পশ্চিমী দেশগুলি প্রভাবিত করতে পারবে। তাদের আশা, সাম্রাজ্যবাদের পতনের ফলে হারিয়ে যাওয়া জমির অন্ততঃ কিছুটা পুণরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

(৫) উন্নয়ন প্রশাসন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেনি। পুরাতন প্রশাসনিক কাঠামোগুলিকে উন্নয়ন প্রশাসনের নাম দেওয়া রীতি দাঁড়িয়ে যায়। একই কর্মী ও যন্ত্রকে ব্যবহার করার ফলে উন্নয়ন প্রশাসন ব্যর্থ হয়।

২.৯ সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদের পতন ও নয়া রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভবের সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশের প্রশাসন বিষয়ে তত্ত্বগত আগ্রহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই পটভূমিতে তুলনামূলক জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসনের উদ্ভব ঘটে। এই বৌদ্ধিক এলাকাগুলি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গোড়ার দিকে CAG-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তুলনামূলক জনপ্রশাসন ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে জনপ্রশাসনের অধ্যয়নে গুরুত্ব দেয়; আর, উন্নয়ন প্রশাসন উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনাকে মূল বিষয় রাখে।

২.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) তুলনামূলক জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন প্রশাসনের উদ্ভবের কারণগুলি আলোচনা করুন।

(২) তুলনামূলক জনপ্রশাসনের বিকাশের ক্ষেত্রে ফ্রেড্ রিগ্‌স্-এর অবদান বিশ্লেষণ করুন।

(৩) উন্নয়ন প্রশাসনের মূল্যায়ন করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) উন্নয়ন প্রশাসন বলতে কী বোঝেন?

(২) তুলনামূলক জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে CAG-র অবদান কী ছিল?

(৩) উন্নয়ন প্রশাসন আমলাতন্ত্রকে কী ভূমিকা দেয়?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) তুলনামূলক জনপ্রশাসনের প্রকৃতি উল্লেখ করুন।

(২) তুলনামূলক প্রশাসনের পাঁচটি সমস্যা লিখুন।

(৩) উন্নয়ন প্রশাসনের উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

২.১১ নির্বাচিত গ্রন্থ

Riggs, Fred, (১৯৬৪), *Administration in Developing Countries*, Houghton Mifflin, বস্টন।

Heady, Ferrel and Sybill Stokes সম্পাদিত (১৯৬২), *Papers in Comparative Public Administration*, University of Michigan.

Gant, George (১৯৭৯), *Development Administration : Concepts, Goals, Methods*, University of Wisconsin Press.

Bhattacharya, Mohit (২০০৮), *New Horizons of Public Administration*, Jawahar Publishers and Distributors, দিল্লি

Otenyo, Eric E. and Nancy S. Lind সম্পাদিত (২০০৬), *Comparative Public Administration : The Essential Readings*, Research in Public Policy Analysis and Management, সংখ্যা-১৫.

বসু, রাজশ্রী (২০০৫), *জনপ্রশাসন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

একক-৩ ❑ নয়া জনপ্রশাসন ও নয়া জনব্যবস্থাপন

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ নয়া জনপ্রশাসনের উদ্ভবের পটভূমি
৩.৪ নয়া জনপ্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি
৩.৫ নয়া জনব্যবস্থাপনের বিবর্তন
৩.৬ নয়া জনব্যবস্থাপনের বৈশিষ্ট্য
৩.৭ নয়া জনব্যবস্থাপনের পর্যালোচনা
৩.৮ সারসংক্ষেপ
৩.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী
৩.১০ নির্বাচিত গ্রন্থ

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আমরা জানতে পারবো—

- নয়া জনপ্রশাসন গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট।
- নয়া জনপ্রশাসনের মূল নীতিগুলি।
- মিনোব্রুক্ সম্মেলনগুলির গুরুত্ব।
- নয়া জনব্যবস্থাপনের উদ্ভবের পটভূমি।
- সনাতন জনপ্রশাসন ও নয়া জনব্যবস্থাপনের পার্থক্য।
- নয়া জনব্যবস্থাপনের দুর্বলতা।

৩.২ ভূমিকা

১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে ও ১৯৭০-এর প্রথমার্ধে নয়া জনপ্রশাসন আন্দোলন সনাতন জনপ্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে তার মতাদর্শগত অস্পষ্টতার জন্য সমালোচনা করে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যাপক সামাজিক অসন্তোষের পটভূমিতে এর উদ্ভব ঘটে। নয়া জনপ্রশাসনের মূল নীতিগুলি ছিল—অংশগ্রহণ, বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক আমলাতন্ত্র। নয়া জনব্যবস্থাপনা ১৯৮০-র দশক থেকে বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিশ্ব রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পটভূমিতে সামনে আসে। এটি একদিকে অনেক কাজ বে-সরকারি হাতে দিয়ে সরকারের দায়িত্ব ভার হ্রাস করার পক্ষপাতী; অপর দিকে কাজের ফলের নিরিখে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ চায়।

৩.৩ নয়া জনপ্রশাসনের উদ্ভবের পটভূমি

ভিয়েৎনাম যুদ্ধ ও ওয়াটারগেট্ কেলেঙ্কারির পর পরই নয়া জনপ্রশাসনের উদ্ভব। ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার সক্রিয় ভূমিকায় ছিল; দ্রুত নগরায়ণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হতে দেখা যায়। তবে '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই তীব্র সামাজিক অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়; শহরাঞ্চলে দাঙ্গা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অসন্তোষ। এগুলি ভিয়েৎনামে যুদ্ধের মাসুল। নানা দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েৎনামের যুদ্ধের প্রভাব পড়ে।

একদিকে মার্কিন ক্ষয়ক্ষতির ফলে সে দেশের জনমতের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল; অপরদিকে, মার্কিন নাগরিকদের বিবেক তাড়িত হচ্ছিল। ওয়াটারগেট্ কেলেঙ্কারি জনপ্রশাসনকে ঝাঁকানি দিয়ে তাকে মুল্যবোধ নিরপেক্ষতার থেকে বার করে আনে। শিক্ষা জগতে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিকদের পক্ষে দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়া জনপ্রশাসন আন্দোলনের সূচনা হয়। এটি গড়ে তোলায় উদ্যোগ নেন একদল তরুণ, বুদ্ধিদীপ্ত বিশেষজ্ঞ। তাঁদের লেখায় প্রায়শই নৈতিকতার সূর ফুটে উঠতো। তাঁরা মনে করেন, প্রশাসকরা কখনই মৌলিক নীতিগত বিষয়গুলি এড়াতে পারেন না, তাই তাঁরা মূল্য নিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে থাকার চেষ্টা করেন। এই চিন্তাবিদ্‌রা মনে করেন, সমাজবিজ্ঞান কখনও মূল্যনিরপেক্ষ হতে পারে না। নয়া জনপ্রশাসন জনপ্রশাসনে মানবিকতার কথা বলে; এবং প্রবক্তারা বিকেন্দ্রিকরণ, সামাজিক ন্যায় প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেন।

কতকগুলি ঘটনা নয়া জনপ্রশাসনের উদ্ভবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যথা—

(১) ১৯৬৭-র জনপরিসেবার জন্য উচ্চশিক্ষা বিষয়ে হানি রিপোর্ট (Honey Report on Higher Education for Public Service)। ১৯৬৬-তে সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ সি হানি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পৃথক পাঠক্রম হিসাবে জনপ্রশাসনের একটি মূল্যায়ন করেন। তিনি ১৯৬৭-তে তাঁর রিপোর্টটি জমা দেন। এটিই হানি রিপোর্ট নামে পরিচিত। এতে চারটি সমস্যার কথা বলা হয়। সেগুলি হল সম্পদের অভাব, পরিকাঠামোগত দুর্বলতা, বিষয়টি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তি এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে ফাঁক।

(২) জনপ্রশাসনের তত্ত্ব ও প্রয়োগ-এর বিষয়ে সম্মেলন। এটি ১৯৬৭ সালে ফিলাডেল্‌ফিয়াতে আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেস দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ ছিল "জনপ্রশাসনের তত্ত্ব ও প্রয়োগ-পরিধি, উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া" প্রসঙ্গে আলোচনা করা।

(৩) ১৯৬৮-এ প্রথম মিনোব্রুক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ডুয়াইট্ ওয়াল্ডো-র নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞরা সম্মিলিত হন। তাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসনের প্রতিষ্ঠিত চিন্তাভাবনাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানান। এই সম্মেলনের ফল হিসাবে দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। একটি ছিল ডুয়াইট ওয়াল্ডো সম্পাদিত, ১৯৭১-এ প্রকাশিত *Public Administration in a Time of Turbulence*, এবং অপরটি ছিল ঐ একই বছরে প্রকাশিত ফ্র্যাঙ্ক মারিনি সম্পাদিত *Towards a New Public Administration : The Minnowbrook Perspective*।

৩.৪ নয়া জনপ্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি

নয়া জনপ্রশাসন মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল এবং সমকালীন জনপ্রশাসনকে প্রযুক্তিগত ঝোঁকের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালায়। ১৯৬৮-র মিনোব্রুক্ কনফারেন্স চারটি মূল বিষয়ে আলোচনা করে—প্রাসঙ্গিকতা, মূল্যবোধ, সাম্য ও পরিবর্তন। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা অভিমুখী জনপ্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিকে এই সম্মেলনে বর্জন করা হয়। নয়া জনপ্রশাসনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল সামাজিক সাম্যের জন্য পরিবর্তন সাধন করা। তাই তারা স্থিতাবস্থাকে আক্রমণ করে; তারা প্রশাসনের উপর রাজনীতির প্রাধান্য দাবী করে।

মিনোব্রুক-১-এর যে দিকগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রশাসনের ভবিষ্যৎ ধারাকে প্রভাবিত করে তা হল—

(১) স্পষ্টতঃই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে নীতি-নির্ধারণ বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(২) সনাতন জনপ্রশাসনের দুটি লক্ষ্য-দক্ষতা ও ব্যয়সংকোচ-এর সাথে তৃতীয় একটি লক্ষ্য যুক্ত হয়; সেটি হল সামাজিক সাম্য।

(৩) জনপ্রশাসনের কার্যকারিতা নির্ধারণ করার পন্থা হল নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাত্রা দেখা।

(৪) নয়া জনপ্রশাসন কোনো বিমূর্ত যুক্তিবাদ বা ক্রমোচ্চ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল না। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ওগুলির উপযোগিতাকে সীমিত মনে করা হত।

(৫) জন ক্ষমতার বিশ্লেষণে বহুত্ববাদকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হলেও, সেটি জন প্রশাসনের মূল্যায়নের মাপকাঠি মনে করা হয় না।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে কুড়ি বছর বাদে বাদে আরো দুটি মিনোব্রুক্ কন্ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ, দ্বিতীয়টি ১৯৮৮-তে ও তৃতীয়টি ২০০৮-এ। দ্বিতীয় মিনোব্রুক কনফারেন্সের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের চাহিদা ও তা পূরণের রসদের মধ্যের ভারসাম্যের অভাব দূর করা। তৃতীয় সম্মেলনটি সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল গোটা বিশ্বের জনপ্রশাসন, জনব্যবস্থাপনা ও জনপরিষেবার ভবিষ্যতের উপর।

৩.৫ নয়া জনব্যবস্থাপনের বিবর্তন

১৯৮০-র দশকের মধ্যে জনপ্রশাসন গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান আর্থিক মন্দার মুখে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র ব্যয় সঙ্কোচন সহ জনপরিষেবা প্রদানের উপায় খোঁজার জন্য ক্রমেই চাপের সামনে পড়ছিল। মনে করা হচ্ছিল, যে বৃহৎ ও অনমনীয় আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামো বিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের সময়ে গড়ে ওঠে এবং সেই সময়ে যার উপযোগিতা থেকে থাকতে পারে, তা ক্রমেই তার উপযোগিতা হারাচ্ছিল।

এই পটভূমিতে ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে সরকারি ক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা মতবাদ উঠে আসে। এটির নাম দেওয়া হয় নয়া জনব্যবস্থাপন (New Public Management)। এটি জোর দেয় ব্যয় সংকোচ, দক্ষতা ও সরকারি সংস্থার কার্যকারীতার উপর, কর্মসূচি ও উন্নততর পরিসেবার উপর।

১৯৮০-র দশক থেকে জনপ্রশাসনকে সংস্কার করার লক্ষ্যে গৃহীত নানা ধরনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নয়া জন ব্যবস্থাপনের নামাঙ্কিত হয়। নয়া জনব্যবস্থাপন শব্দটি ১৯৯১-এ ক্রিস্টোফার হুড্ ব্যবহার করেন; অন্যরা কেউ সেটাকে ব্যবস্থাপনবাদ (managerialism) [Pollitt, ১৯৯০], জনপ্রশাসনের বাজারভিত্তিক মতবাদ (market based approach to public administration) [Lan and Rosenbloom, ১৯৯২], ব্যবসায়িক বা শিল্পোদ্যোগী সরকার (entrepreneurial or reinventing Government) [Osborne and Gaebler, ১৯৯২] হিসাবে অভিহিত করেন।

নয়া জনব্যবস্থাপন জন পছন্দতত্ত্ব (Public choice theory) ও ব্যবস্থাপনার (managerialism) উপর প্রতিষ্ঠিত হয়; বাজার ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার উপর সে তার ভরসা রাখে। উদারনীতিবাদের তত্ত্বকে, বর্তমানে নয়া উদারনীতিবাদ হিসাবে, সে প্রতিষ্ঠিত করে। তার গৃহীত নীতি হল, 'সেই সরকার শ্রেষ্ঠ যে ন্যূনতম শাসন করে'। রাষ্ট্রের উপর বাজারের প্রশ্নাতীত উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়। ১৯৯২-এ ডেভিড ওসবর্ন ও টেড্ গেবলার তাঁদের গ্রন্থ *Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*-এ শিল্পোদ্যোগী সরকারের ধারণা ব্যক্ত করেন। লেখকরা আমলাতান্ত্রিক সরকারের বদলে বাজারি কায়দায় নাগরিকদের চাহিদা পূরণ করবে এমন শিল্পোদ্যোগী সরকার গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করেন। তাঁরা আমলাতন্ত্রকে বর্তমান যুগে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন। তাঁরা বলেন, '১৯৯০-এর পরের অর্থনীতি ও তথ্য সমৃদ্ধ সমাজে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভালভাবে কাজ করতে পারে না।' তাঁর মতে শিল্পোদ্যোগী সরকারের কাজ হওয়া উচিত—

- জাহাজটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, তার অভিমুখ নিয়ন্ত্রণ করা;
- শুধু পরিসেবা প্রদান নয়, জনগোষ্ঠীদের ক্ষমতায়ন ঘটানো;
- একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ নয়, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত;
- নিয়মের দ্বারা চালিত হওয়া নয়, আদর্শের দ্বারা চালিত হওয়া প্রয়োজন;
- উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনুদান দেওয়া উচিত;
- ক্রেতাদের দাবী পূরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত; আমলাদের দাবী নয়;
- শুধু ব্যয় নয়, আয়ের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।
- সমস্যার সমাধানের বদলে সমস্যা নিবারণের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার;
- কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ;
- জন কর্মসূচী গ্রহণ না করে বাজারকে ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করা।

ভিন্‌সেন্ট অস্ট্রম মনে করেন আমলাতন্ত্র জনপরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদাই অক্ষম। মাঝে মাঝে নয়া জন-ব্যবস্থাপনকে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া জনপ্রশাসনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিছু সাদৃশ্য থেকে থাকলেও, দুটি আন্দোলনের মূল ধারাগুলি খুবই আলাদা। নয়া জনপ্রশাসন তাত্ত্বিক জনপ্রশাসনকে তৎকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চলা প্রগতিশীল, সাম্যভিত্তিক আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনার প্রচেষ্টা চালায়। অপরদিকে, প্রায় এক দশক পরে, নয়া জনব্যবস্থাপন উন্নত ও দক্ষ পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেয়।

৩.৬ নয়া জনব্যবস্থাপনের বৈশিষ্ট্য

নয়া জনব্যবস্থাপনের পদ্ধতিগুলো প্রধানত বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে নেওয়া হয়। এর পিছনে মূলতঃ অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণের সংযোগ লক্ষণীয়।

সনাতন জনপ্রশাসনের ভিত্তি ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান; নয়া জনব্যবস্থাপনের ভিত্তি অর্থনীতি। দুটির মধ্যে স্পষ্টতঃই মূল্যবোধের সংঘাত আছে। সনাতন জনপ্রশাসন মুলতঃ যে মূল্যবোধগুলির উপর আস্থাশীল ছিল সেগুলি হল—ন্যায়, নীতি, জনস্বার্থ, দায়বদ্ধতা। পক্ষান্তরে, নয়া জনব্যবস্থাপনে গুরুত্ব পায়—স্বাতন্ত্র্য, নমনীয়তা, কর্ম দক্ষতার জন্য পুরস্কার, দক্ষতা। নয়া জনব্যবস্থাপন বেসরকারি ক্ষেত্রের নীতিগুলি সরকারি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধন, নয়া প্রশাসনিক সংস্কৃতি ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে চায়।

নয়া জনব্যবস্থাপনের রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্রের পরিধিকে হ্রাস করে রাষ্ট্রকে একটি সাধারণ সংস্থাতে পরিণত করার কথা বলে। রাষ্ট্র বেসরকারি সংস্থার মত মক্কেলের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হবে ও ন্যূনতম সামাজিক সাহায্য প্রদান করবে। সফল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রাজনীতিকে বাধা হিসাবে গণ্য করে বর্জন করার কথা বলা হয়।

নয়া জনব্যবস্থাপন গুরুত্ব দেয়—

- সরকারের কার্যকলাপকে বাজারের নিয়মাবলীতে নিয়ে আসায়;
- সরকারের বিস্তার, ব্যয় ও কার্যকলাপের বৃদ্ধি বিপরীতমুখী করায়;
- কার্যনীতি ও প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য করায়;
- কর্মসিদ্ধির মূল্যায়ন ও মানগত উন্নতির উপর;
- মক্কেলদের ব্যয় করা অর্থের তুল্যমানের পরিসেবা দেওয়ার উপর।

নয়া জনব্যবস্থাপনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

(১) ব্যবস্থাপনা, কাজের মূল্যায়ন ও দক্ষতার উপর গুরুত্ব;

(২) আমলাতন্ত্রকে বিভিন্ন সংস্থায় খণ্ডিত করে পরস্পরের সম্পর্ককে ‘user pays’ ভিত্তিতে নিয়ে আসা; অর্থাৎ যে পরিসেবা ব্যবহার করে, সে তার ব্যয়ভার বহন করে।

(৩) জনপ্রশাসনকে কম খরচ সাপেক্ষ করতে ব্যয় সংকোচন।

(৪) এমন একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উৎসাহিত করা যেটিতে উৎপাদনের লক্ষ্যবস্তু সীমিত সময়ের চুক্তি, আর্থিক উদ্দীপক ও নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক চিন্তা ও মূল্যবোধের সংমিশ্রণে নয়া জনব্যবস্থাপন গড়ে ওঠে। সনাতন জনপ্রশাসনের ও নয়া জনব্যবস্থাপনের নানা দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) সনাতন জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারেরই জনপরিসেবা প্রদান করার কথা; কিন্তু নয়া জনব্যবস্থাপনে একাধিক সংস্থা তা করে, যার মধ্যে আছে সরকার, বাজার, সুশীল সমাজ প্রভৃতি।

(২) সাবেকি জনপ্রশাসনে নামহীনতা ও গোপনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়; নয়া জনব্যবস্থাপনা জনমুখী ও দায়বদ্ধ।

(৩) সনাতন জনপ্রশাসনে পরিকাঠামো, নিয়মকানুন ও প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া; নয়া জনব্যবস্থাপনে কাজ করা ও তার ফলের উপর গুরুত্ব থাকে।

(৪) সনাতন জনপ্রশাসন সরকারি - বেসরকারি পার্থক্যের উপর জোর দেয়; নয়া জনব্যবস্থাপন সরকারি বেসরকারি সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৫) নয়া জনব্যবস্থাপন সনাতন জনপ্রশাসনের ক্রমোচ্চ মডেলটি বাতিল করে নমনীয় মডেল গ্রহণ করে।

৩.৭ নয়া জনব্যবস্থাপনের পর্যালোচনা

মনে রাখা প্রয়োজন নয়া জনব্যবস্থাপনের বাজারমুখী সংস্কারের প্রতি আগ্রহের কারণ ছিল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। আমাদের বোঝা দরকার কেন একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে নয়া জনব্যবস্থাপনের মত সংস্কারের উদ্ভব ঘটে। সরকারি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা মতবাদের সমালোচকরা ওয়েবেরীয় আমলাতন্ত্রের জন দায়বদ্ধতার ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরেন, তাঁদের মতে ব্যবস্থাপনা মতবাদীরা কঠিন নীতিগত সিদ্ধান্ত থেকে সরকারের দৃষ্টি সরিয়ে দেয়। অনেকেই মনে করেন নয়া জনব্যবস্থাপন অতিরিক্ত মাত্রায় শিল্পমহল ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভর করে।

সমালোচকরা মনে করেন, শিল্প প্রশাসন ক্ষেত্রের নিয়মনীতি আনার ফলে জনপ্রশাসন নাগরিকের চাহিদা ও আশার বিষয়ে কম সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। এও বলা হয় যে, আধুনিক রাষ্ট্র যে স্থান দখল করে থাকে তা এতই বিস্তৃত, গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় যে বাজার তা পূরণ করতে পারে না। ফলে, রাষ্ট্রকে গুঁটিয়ে নেওয়া ও বেসরকারি সংস্থাদের সব ক্ষেত্রে বিচরণের অধিকার দেওয়া না বাঞ্ছনীয়, না নিরাপদ হবে।

নয়া জনব্যবস্থাপন বেসরকারি ব্যবস্থাপনার অন্ধ প্রশংসা করে। এমনকি তার দুর্বলতাগুলিকেও মেনে নেয়। আরো একটি সমালোচনার দিক হল যে, নয়া জনব্যবস্থাপনে রাজনৈতিক প্রশাসকদের জনপ্রশাসনের কর্মসূচী রূপায়ণ প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। এর ফলে তারা কর্মসূচী রূপায়ণ প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। নয়া জনব্যবস্থাপন জনপ্রশাসনের ইতিবাচক দিকগুলি অগ্রাহ্য করে। জনপ্রশাসনের নাগরিকের প্রতি সহানুভূতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংবিধানিক ব্যবস্থায় প্রোথিতশিকড় অগ্রাহ্য হয়।

এছাড়াও বলতে হয়, যা একটি দেশের ক্ষেত্রে উপযোগী তা অন্যদেশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত না-ও হতে পারে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের ক্ষেত্রে যা উপযোগী ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে তা না হতে পারে।

৩.৮ সারসংক্ষেপ

জনপ্রশাসনের ইতিহাসে নয়া জনপ্রশাসন থেকে নয়া জনব্যবস্থাপন পর্যন্ত ছিল দীর্ঘ যাত্রাপথ। এই সময় জনপ্রশাসন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছে। সরকারি ব্যবস্থাপনার নতুন মতবাদ—নয়া জনব্যবস্থাপন বা এন. পি. এম. ফলাফলমুখী, উৎপাদন ও মক্কেলের দিকে নজর দেয়, বাজার ও বাজার জাতীয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, লক্ষ্যবস্তুর দিকে চোখ রেখে ব্যবস্থা নেওয়া ও কর্মসিদ্ধির ব্যবস্থাপনের উপর জোর দেয়। এর প্রকৃতি ও এর বিরুদ্ধে উঠে আসা সমালোচনার কথা মাথায় রেখে বলা যায়, বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে অনেক কিছু শেখার থাকলেও সতর্কতার অবকাশ আছে। সরকারি মালিকানাধীন ক্ষেত্রের গুরুত্ব ও বিশেযত্ব হারিয়ে ফেলা উচিত নয়।

৩.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) কি পরিস্থিতির মধ্যে নয়া জনপ্রশাসনের উদ্ভব ঘটে তা আলোচনা করুন।

(২) নয়া জনব্যবস্থাপনের ধারণা প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

(৩) নয়া জনব্যবস্থাপনের মূল নীতিগুলি কী কী?

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) নয়া জনপ্রশাসন ও নয়া জনব্যবস্থাপনের মূল নীতিগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করুন।

(২) প্রথম মিনোব্রুক সম্মেলনের তাৎপর্য কী ছিল?

(৩) নয়া জনব্যবস্থাপনের সীমাবদ্ধতা কী?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) নয়া জনব্যবস্থাপনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

(২) সনাতন জনপ্রশাসন ও নয়া জনব্যবস্থাপনের পার্থক্যগুলি লিখুন।

৩.১০ নির্বাচিত গ্রন্থ

Otenyo, Eric Edwin, Nancy S. Lind সম্পাদিত (২০০৬) *Comparative Public Administration : The Essential Readings*.

Bhattacharya, Mohit (২০০৮) New Horizons in Public Administration, Jawahar Publishers and Distributors, দিল্লি।

Osborne, David and Ted Gaebler (১৯৯২), *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit in Transforming the Public Sector.*

World Bank, (১৯৯২) *Government and Development*, Washington DC.

Medury, Uma (২০১০) *Public Administration in the Globalisation Era : The New Public Management Perspective*, Orient Blackswan, নয়া দিল্লি।

বসু, রাজশ্রী (২০০৫), *জনপ্রশাসন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

একক-৪ ❐ জনপ্রশাসনের সাম্প্রতিক অগ্রগতি : পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীবাদ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ জনপ্রশাসনে পরিবেশগত মতবাদ
৪.৪ নারীবাদ ও জনপ্রশাসন
৪.৫ সারসংক্ষেপ
৪.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী
৪.৭ নির্বাচিত গ্রন্থ

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আমরা জানতে পারবো—

- পরিবেশগত মতবাদের মূল ভিত্তিগুলি সম্পর্কে।
- পরিবেশগত মতবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে জন্ গাউস ও ফ্রেড্ ডব্লিউ রিগ্‌স্-এর অবদান।
- সনাতন জনপ্রশাসনের নারীবাদী সমালোচনা।
- জনপ্রশাসনের নারীবাদী দৃষ্টিকোণ গড়ে তোলার ধারাগুলি।

৪.২ ভূমিকা

জনপ্রশাসন তার শুরু থেকেই পরিবর্তনশীল এক বৌদ্ধিক ক্ষেত্র যেখানে তার পরিচিতির তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। জনপ্রশাসন ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে যেখানে নতুন নতুন ভাবে বিষয়টির তত্ত্বগত বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়। জনপ্রশাসনের তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংযোগ উপলব্ধির প্রচেষ্টা থেকে পরিবেশগত মতবাদ উঠে এসেছে। আবার এই ক্ষেত্রটিতে লিঙ্গ বিষয়ে সংবেদনশীলতা থেকে নারীবাদী দৃষ্টিকোণের উদ্ভব। দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই জন প্রশাসনের পরিধি বিস্তৃত করে ও সনাতন সীমানা ভাঙ্গার দাবী জানায়।

৪.৩ জনপ্রশাসনে পরিবেশগত মতবাদ

পরিবেশগত মতবাদ প্রাণী ও তাদের পরিবেশের মধ্যের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। ইকোলজি

(ecology) শব্দটি ১৮৬৬-এ এক জার্মান জীব বিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল (Ernst Haeckel) দুটি গ্রীক শব্দ থেকে আহরণ করে গঠন করেন। শব্দ দুটি হল—'Oikos' ও 'Logos'; প্রথমটির অর্থ বাসস্থান, দ্বিতীয়টির বিজ্ঞান। আধুনিক জীব বিজ্ঞানে শব্দটি ব্যবহার করা হয় জীবিত প্রাণী, গাছপালা ও পশুদের সঙ্গে তাদের পরিবেশের সংযোগ চিহ্নিত করতে। আজ আরও বিস্তৃত অর্থে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক চিহ্নিত করতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ধারায় শব্দটি ব্যবহার হয়।

জন গাউস (John Gaus) ১৯৪৫-এ তাঁর *Reflections on Public Administration*-এ জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত মতবাদ প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি সরকারের কার্যকলাপকে তার পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেন। জনপ্রশাসনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করেন—জনগণ, স্থান, বস্তুগত প্রযুক্তি, সামাজিক প্রযুক্তি, ইচ্ছা ও ধারণা, বিপর্যয় ও ব্যক্তিত্ব।

- ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জনসাধারণের বিন্যাসগত পরিবর্তন নীতির উপর প্রভাব ফেলে (জনগণের শহরের দিকে যাওয়া)।
- পাকা রাস্তার দাবীতে বস্তুগত প্রযুক্তি নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- কর্পোরেশনের উদ্ভব সামাজিক প্রযুক্তির নিদর্শন।
- ইচ্ছা ও ধারণা—তথ্য ও মূল্যবোধ/চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশেষ কার্য সম্পাদিত হয়।
- বিপর্যয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের প্রভাব স্বল্প মেয়াদী, কারণ প্রথম ধাক্কার পর পুরাতন শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন করে তার প্রভাব নাকচ করে দেয় (যেমন নাইট ক্লাবে আগুন লেগে সামরিক ব্যক্তিদের মৃত্যু হওয়ায় আইন করে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার পরিদর্শন রীতি চালু করা হয়)।
- ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তির নিজের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে।

পরিবেশবাদী মতবাদের প্রবক্তাদের মতে জনপ্রশাসন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ওই একটি দেশের সার্বিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মূল কথা হল, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য সংস্থাকে সব থেকে ভাল করে বোঝা সম্ভব হয় যদি তাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও প্রভাব, যেগুলি তাদের রূপ দেয়, সেগুলিকে চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করা হয়। গাউস-এর ভাষায়, পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকৃত অর্থেই তৃণমূল স্তর থেকে গড়ে ওঠে, একটি স্থানের মৌলগুলি থেকে—তার মাটি, আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থান...." ধরে নেওয়া হয়, প্রশাসনিক আচরণকে প্রভাবিত করে প্রশাসনিক সংস্কৃতি, সেটি আবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার মিথক্রিয়ার ফল। অর্থাৎ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করে না। সে তার আসে পাশে থাকা অন্যান্য উপ-ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজ করে।

ফ্রেড্ ডব্লিউ রিগ্স্ (১৯১৭-২০০৮) পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। তিনি মনে করেন, একটি বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বুঝতে হলে যে পরিবেশে সেটি কাজ করে তাকে বুঝতে হয়। রিগ্স্ তাঁর পরিবেশগত মডেল গড়ে তোলার সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত-ক্রিয়াগত (structural-functional) মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তার উপর অনেকটাই নির্ভর করেন। রিগ্স্ একাধিক মডেল তৈরি করেন। তিনি agraria-transitia-industria-র মডেল থেকে সরে গিয়ে fused-prismatic-diffracted সমাজের মডেল গড়েন। তাঁর মডেলগুলিতে উন্মুক্ত ব্যবস্থা (open system) দৃষ্টিকোণ ছিল যেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থার আন্তঃক্রিয়া ছিল। একটি সামাজিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কতটা ক্রিয়া বিভাজন ঘটে তার উপর ভিত্তি করেই প্রধানতঃ রিগ্স্ তাঁর প্রিজম্যাটিক মডেল গড়ে তোলেন। তিন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করার উপযুক্ত হিসাবে মডেলটিকে বিবেচনা করা হয়—পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত সমাজ, সাবেকী কৃষিভিত্তিক সমাজ ও উন্নয়নশীল সমাজ।

১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত প্রায় তিন দশক ধরে জনপ্রশাসনের তাত্ত্বিক ও জননীতি বিশেষজ্ঞদের উন্নয়ন প্রশাসনের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কাঠামো, সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে বই-পত্র, পত্রিকা, প্রভৃতিতে বহু লেখা প্রকাশিত হয়। এগুলির অনেকগুলিই আদর্শ স্থাপনকারী ছিল এবং আদর্শ উন্নয়ন প্রশাসনের বিশ্বজনীন নীতি নির্ধারণে সচেষ্ট থাকে। এগুলি সম্পর্কে রিগ্‌স্-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমালোচনামূলক। এগুলির পরিবেশ নিরপেক্ষতার সম্পর্কে রিগ্‌স্-এর আপত্তি ছিল। তিনি এগুলিকে অনুপযুক্ত মনে করেন এবং এর ক্ষতিকারক ফলাফলের সম্ভাবনার বিষয়ে সাবধান করেন। রিগ্‌স্ তাঁর কাজের অনেকটাই উন্নয়নশীল দেশের প্রশাসন (উন্নয়ন প্রশাসন) কিভাবে তার নিজের আশেপাশের সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা বুঝতে পরিবেশগত ব্যাখ্যা ব্যবহার করেন। এইসব দেশের বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মডেল গড়ে তোলার সময়ে রিগ্‌স্ নতুন শব্দেরও ব্যবহার করেন।

জনপ্রশাসনের পরিবেশগত মতবাদ কেবলমাত্র গবেষণার ভিতই শক্তপোক্ত করে এমনটা নয়; জনপ্রশাসনিক আচরণ বিশ্লেষণ করা ও তার আগামীদিনের সম্ভাব্য গতিপথ নির্ণয় করা সম্ভবপর করে। জনপ্রশাসনিক ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এমনকি এই মতবাদ চিহ্নিত সমস্যাগুলির সমাধান করতেও সাহায্য করে।

সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ বাজার অর্থনীতির প্রভাবে ব্যাপক সংস্কারের পথে হেঁটেছে। এগুলি প্রধানত অ-পরিবেশবাদী মডেল। এগুলি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যের উপর গুরুত্ব দেয়, গুরুত্ব দেয় কর্মসিদ্ধির সাফল্য নির্ণায়কের উপর ও ফলাফলের উপর এবং সেগুলির সর্বক্ষেত্রে উপযোগিতা দাবী করে—পরিবেশ বা পরিস্থিতিগত বৈচিত্র্যের সেখানে কোনো স্থান নেই। সাম্প্রতিককালে অনেকগুলি দেশে সরকারি মালিকানাধীন ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এগুলিকে তাত্ত্বিক দিক থেকে অর্থবহ করতে হলে এগুলির মধ্যে তুলনা করা, বিশ্লেষণ করা ও সার্বজনীন তত্ত্ব দাঁড় করানো প্রয়োজন।

এছাড়াও মনে রাখা দরকার যে, অনেকাংশেই এই বাজার চালিত মতবাদগুলিকে উন্নয়নশীল দেশগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থাদের প্রভাবে সার্বজনীন হিসাবে মেনে নেয়, যদিও সে মডেলগুলি এসব দেশের উপযুক্ত নাও হতে পারে; কারণ, এসব দেশের দুর্বল বেসরকারি পুঁজি, তীব্র দারিদ্র্য ও কম উন্নত বাজারি শক্তির ফলে মৌলিক পরিসেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্য, তথা ভরতুকির প্রয়োজন হয়।

এছাড়াও, অতীতের অনুকরণের পথ ধরেই অনেক উন্নয়নশীল দেশের সরকারই উন্নত দেশে গড়ে ওঠা বাজার-অনুকূল মডেল গ্রহণ করে। রিগ্‌স্ এই ধরনের অনুকরণের বিরোধী ছিলেন; তিনি মনে করতেন এই রাষ্ট্রগুলির নিজেদের অনুকূল মডেল নিজেদের পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের গড়ে তোলা উচিত (রিগ্‌স্, ২০০১)। পরিশেষে বলতে হয়, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র অনেকখানি স্বাধীনভাবে কাজ করে (যথা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিল্প, ধর্ম, প্রশাসন) কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এগুলি পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ফলে সেখানে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ আবশ্যক।

রিগ্‌স্ বলেন, ‘এমন একটা সময়ে যখন ক্রমেই আলোড়ন বৃদ্ধি পাওয়া পৃথিবীর চাপ এবং সেই সঙ্গে আমাদের বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা,... জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, কৃষি জমি ও বনাঞ্চলের অবক্ষয়, সামুদ্রিক সম্পদের বিপন্নতা ও আরো অনেক সমস্যা, আমাদের আরো সতর্কভাবে পরিবেশগত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিবেচনা করতে হবে। কেবলমাত্র সনাতন ব্যবস্থাপন বা অভ্যন্তরীণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নীত করার কথা ভাবলে চলবে না। [Fred W. Riggs, “The Ecology and Context of Public Administration : A Comparative Perspective”, *Public Administration Review,* মার্চ-এপ্রিল ১৯৮০, পৃ. ১১৫]

'সাম্য ও অর্থনৈতিক, দুটি কারণেই আমাদের জনপ্রশাসনকে আরো টেঁকসই উন্নয়নের সচেতনতার পথে নিয়ে যাওয়ার কাজ করতে হবে। তার অংশ হিসেবে টেঁকসই উন্নয়নের বিষয়টিকে আরো বেশি করে জনবিতর্কের মধ্যে আনতে হবে। এছাড়াও দরকার হল প্রাকৃতিক সম্পদ ও জননীতির মধ্যের সম্পর্কের বিষয়ে সচেতনতার বিস্তার ঘটানো।'

৪.৪ নারীবাদ ও জনপ্রশাসন

বিভিন্ন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যত খণ্ডিতভাবেই হোক না কেন নারীবাদী চিন্তা তার স্থান করে নিয়েছে। তবে এখনও জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে কোনো স্পষ্ট নারীবাদী তত্ত্বের স্থান হয়নি। জনপ্রশাসনে কোন নারীবাদী তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ দেখানো হয়নি। বিশেষজ্ঞরা জনপ্রশাসনের ও নারীবাদের তত্ত্বগুলিকে সম্পর্কহীন হিসাবে দেখেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলির জনপ্রশাসনে কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। কিছু নারীবাদী গবেষক অবশ্য জনপ্রশাসনকে নিজেদের বিষয় হিসাবে দাবী করেন এবং নারী সংক্রান্ত গবেষণামূলক কাজ করেন। যেমন কর্মস্থলে নারীদের সমস্যা, মজুরির সমতার প্রশ্ন, নারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয় ইত্যাদি।

জনপ্রশাসন এখনও প্রধানতঃ পুরুষ দুর্গ। তবে সাম্প্রতিককালে বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে, নারীবাদী গবেষকরা সেই দুর্গের দরজায় করাঘাত করতে শুরু করেছেন। জনপ্রশাসনকে প্রভাবিত করতে চেয়ে লিঙ্গ গবেষণা অন্যতম ধারা হিসাবে উঠে আসছে। এ ক্ষেত্রে কেথি ফার্গুসন্‌ ও ক্যামিল্লা স্টিভার্স উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে কেথি ফার্গুসন্‌ *The Feminist Case Against Bureaucracy* রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন, 'নারীরা একটি ভিন্ন কণ্ঠ গড়ে তুলেছেন। একটি নিমজ্জিত থাকা ব্যাখ্যান' যেটি অ-আমলাতান্ত্রিক একটি যৌথ জীবন গড়ে তোলায় ব্যবহার করা সম্ভব; সেখানে আমলাতান্ত্রিক ব্যাখ্যায়নের বিকল্প হিসাবে আনা হবে একটি নারীবাদী ব্যাখ্যান যার কেন্দ্রে থাকবে মানব উন্নয়ন ও গোষ্ঠীগত চাহিদা।

জনপ্রশাসনে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাভাবনা বর্জিত হয়ে আসার কতকগুলি কারণ থাকতে পারে—

(১) জনপ্রশাসনের পুরুষ তাত্ত্বিক ও সে পেশায় নিযুক্ত পুরুষরা নারবাদী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আদৌ সচেতন না থাকতে পারেন।

(২) তাঁরা নারীবাদী দৃষ্টিকোণের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হলেও সেটার উল্লেখ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কারণ এখনও নারীবাদের সঙ্গে কিছু নেতিবাচক বক্তব্য জুড়ে আছে। (যথা, আমূল পরিবর্তনবাদ, অযৌক্তিকতা, আবেগপ্রবণতা)।

(৩) আজ পর্যন্ত নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত আছে কাঠিন্য, দৃঢ়তা আক্রমনাত্মক (বিশেষতঃ সংকটকালে) গুণের সাথে যেগুলি এক কথায় বলা যায় পুরুষালী গুণ।

সরকারি সংস্থায় কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করার ব্যাপারে মেয়েরা কখনই ছেলেদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠতে পারেনি। দেখা যায়, নিচের তলার অনেকাংশ সরকারি কর্মচারি মেয়ে হলেও উপরের দিকে তাঁদের সংখ্যা খুব কম। তাছাড়া যাঁরা জনপ্রশাসনের শীর্যস্থানে পৌঁছাতে পারেন তাঁরা পুরুষদের তুলনায় পৃথক কাজের পরিবেশ পান। তাঁরা মহিলা হওয়ার ফলে তাঁদের আচরণ, পোশাক, কথা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুঁটিয়ে লক্ষ করা হয়। তাঁরা পুরুষালী হলে সমালোচনার মুখে পড়ে (যথা, হিলারি ক্লিন্টন), আবার অতিরিক্ত মেয়েলি মনে হলেও তা হয় (সেটিকে দুর্বলতা মনে করা হয়)।

ক্যামিল্লা স্টিভার্স সম্ভবত জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য নারীবাদী অবদান রাখেন।

তিনি জনপ্রশাসনের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। তিনি তাঁর ১৯৯৩-এ প্রথম প্রকাশিত *Gender Images in Public Administration : Legitimacy and the Administrative State* নামক গ্রন্থে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রটিকে লিঙ্গ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং বিশ্লেষণ করেন সম্মান, নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও পরিবর্তনের মত বিষয়গুলি। লেখিকা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে মহিলা সরকারি কর্মচারীদের অগ্রগতি, জাতীয়, রাজ্য ও স্থানীয় সরকারে তাঁদের সম্মান, তাঁদের বিচিত্র সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা এবং সরকারি হস্তক্ষেপে বৃহত্তর সমাজে নারীর অবস্থান-এর বিষয়গুলির অনুসন্ধান করেন। তাঁর যুক্তি হল যে আধুনিক সরকারের সামাজিক পরিসেবা, গভীর সমস্যাদি মোকাবিলায় ইতিবাচক সরকারি হস্তক্ষেপ ও সরকার যে সংস্কারের হাতিয়ার হতে পারে এমন ধারণার শিকড় নারী সংগঠনগুলির মধ্যে প্রোথিত। তিনি দাবী করেন, অন্যান্য সরকারি ক্ষেত্রের কার্যকলাপের মত জনপ্রশাসনও কাঠামোগত ভাবে পুরুষকেন্দ্রীক, যদিও আপাতভাবে তা লিঙ্গ নিরপেক্ষ। স্টিভার্স বলেন, নারীবাদী তত্ত্ব ক্ষমতা, গুণাগুণ, সংগঠনের প্রকৃতি, নেতৃত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব প্রদান করেছে কিন্তু এগুলির মধ্যে প্রায় কোনটাই জনপ্রশাসনের আলোচনায় প্রবেশ করেনি।

হাচিন্‌সন্‌ ও মান্‌ [Hutchinson, Janet R. and Hollie S. Mann, ২০০৪, "Feminist Praxis : Administering for a Multicultural, Miltigendered Public, Administrative Theory and Praxis", ২৬(১) : ৭৯-৯৫] জনপ্রশাসনে বহু-সাংস্কৃতিক নারীবাদের ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেন। তাঁরা মনে করেন একটি বহু-সাংস্কৃতিক, বহু-লিঙ্গ লেন্‌স্‌ ব্যবহার করে জনপ্রশাসনকে নারীবাদী দিক থেকে পূর্ণ দর্শন করা প্রয়োজন। নারীবাদী জনপ্রশাসন গড়ে তোলার ভিন্ন ভিন্ন রণকৌশল গ্রহণ করা সম্ভব। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। সেটি দাবী করে, নারীদের কাজের জগতে, রাজনীতি ও জ্ঞানের উৎপাদনে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া ও উৎসাহিত করা। এটিকে "affirmative action" পদক্ষেপ বলা যেতে পারে, যেটি আমাদের অংশগ্রহণকারী সাম্যের উদারনৈতিক নারীবাদী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটি জনপ্রশাসনের পত্রিকাগুলিতে মহিলা বিশেষজ্ঞদের রচনার একটি বরাবরের বিষয়। গোড়ার দিকে উদারনৈতিক নারীবাদীরা মনে করতেন এই কৌশলটি এককভাবে পরিবর্তন আনার পক্ষে যথেষ্ট। তবে, ক্রমে বোঝা যায় যে অপরিবর্তিত কাঠামোয় কেবলমাত্র নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলে যথেষ্ট হয় না। আর একটি রণকৌশল আছে যেটি আরো বৈপ্লবিক ও জনপ্রশাসনে নারীবাদী তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপারে সম্ভবতঃ আরো প্রাসঙ্গিক। এটি সামগ্রিকভাবে যে মৌলিক তত্ত্ব, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও মূল্যবোধ জনপ্রশাসন সহ সার্বিক ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলিকে পূর্ণ বিবেচনা করার কথা বলে। এটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনার কথা বলে, যার ফলে নারীবাদী দিক থেকে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়। এই অবস্থান পরিবর্তনের জন্য মানতে হয় যে আমরা প্রকৃত অর্থেই এক "পুরুষের জগতে" বাস করি।

জনপ্রশাসনে নেতৃত্ব সংক্রান্ত নারীবাদী মতবাদে নয়া জনব্যবস্থাপন তত্ত্বের কিছু নীতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে জনপ্রিয়তা অর্জন করা নয়া জনব্যবস্থাপনও গুরুত্ব দেয় 'কর্মচারি ক্ষমতায়ন', 'সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিকেন্দ্রীকরণ' ও'সংযোগ স্থাপন ও অসহযোগিতার উপর'। তবে জনপ্রশাসনে নারীবাদী তত্ত্বকে নয়া জন ব্যবস্থাপনের পূর্বসূরী মনে করাটা অতিরঞ্জিত হবে। তবুও মনে হয়, নয়া জনব্যবস্থাপন নারীবাদী তত্ত্ব থেকে কিছু ভাবনা চিন্তা নিয়েছে, কিন্তু তার স্বীকৃতিদানে ব্যর্থ হয়েছে।

ক্যামিল্লা স্টিভার্স তাঁর ১৯৯০-এর নিবন্ধ "Towards a Feminist Perspective in Public Administration Theory"-তে বলেন যে কম ক্রমোচ্চ ও অধিক মিথক্রিয়া ভিত্তিক শাসনের তাৎপর্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে নারীবাদী চিন্তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ক্ষমতাকে আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া হিসাবে না দেখে নারীবাদী মতবাদ গুরুত্ব দেয় সক্ষমতা বৃদ্ধির সামর্থকে। স্টিভার্স মনে করেন বর্তমান বিশ্বের ক্রমবর্ধমান সমস্যাদির মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আদেশের কঠোর শিকলের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতা অনেক বেশি কার্যকর।

বার্নিয়ার, বার্নিয়ার ও ডি লাইসা-র মতে [২০০৫, "Bringing Gender into View", Administrative Theory and Praxis, ২৭(২), ৩৯৪-৪০০] উদারনৈতিক নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জনপ্রশাসনের গবেষণা সাম্য বিষয়ে নানা প্রশ্নের মোকাবিলা করতে পারে, যথা আমলা পর্যায়ে মহিলা কর্মীর সংখ্যা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্বের ঘাটতি, কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ, কর্মক্ষেত্রকে পরিবার অনুকূল করা ইত্যাদি।

জনপ্রশাসনে লিঙ্গগত সমস্যা বিশ্লেষণ করার অর্থ এই নয় যে অন্যান্য বিষয়, যথা বর্ণ ও শ্রেণীর গুরুত্ব কম। লিঙ্গ বর্ণ ও শ্রেণির সাথে যুক্ত; লিঙ্গের গুরুত্ব এককভাবে আধিপত্যের উৎস হিসাবে নয়, বরং এমন একটি পর্যবেক্ষণ যন্ত্র বা লেন্স্ যা অন্য পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে ধরা না পড়া বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়াও নারীবাদী মতামতকে জনপ্রশাসন থেকে আলাদা হিসাবে দেখা উচিত নয়। বরং একটি দৃষ্টিকোণ হিসাবে দেখা উচিত যেটি জনপ্রশাসনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে।

৪.৫ সারসংক্ষেপ

পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ বা Ecological approach সরকারি কাজকে তার পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলে। এ ক্ষেত্রে জন গাউস্ ও ফ্রেড রিগ্স্ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলির জনপ্রশাসন বাজার-চালিত নীতির বা মডেলের ভিত্তিতে (যথা, নয়া জনব্যবস্থাপন, 'গুড্ গভর্নেন্স' প্রভৃতি) আমূল সংস্কারের পথে হাঁটছে যে পথগুলি প্রধানতঃ অ-পরিবেশগত, সেখানে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম।

জনপ্রশাসনের পরিধি যেখানে বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তৃত হয়ে চলেছে সেখানে নারীবাদী দৃষ্টিকোণের পক্ষে সওয়াল করা হচ্ছে। সনাতন জনপ্রশাসন প্রধানতঃ পুরুষ দুর্গ হিসাবে থেকেছে। তবে সাম্প্রতিককালে নারীবাদী গবেষকরা সেই দরজায় আঘাত করতে শুরু করেছে; ফলে লিঙ্গ গবেষণার গুরুত্ব বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন ক্যথি ফাগুসান্ ও ক্যামিল্লা স্টিভর্স।

৪.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসনের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝেন?

(২) জনপ্রশাসনে পরিবেশগত চিন্তার গুরুত্ব বোঝার ক্ষেত্রে জন এম্ গাউস্-এর অবদান বিশ্লেষণ করুন।

(৩) আপনি কি ক্যামিল্লা স্টিভার্সের সঙ্গে একমত হবেন যে, প্রশাসনিক শাসনকার্য বোঝার ক্ষেত্রে নারীবাদী চিন্তার গুরুত্ব আছে?

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পিছনে ফ্রেড্ ডব্লিউ রিগ্স্-এর অবদান ব্যাখ্যা করুন।

(২) জনপ্রশাসনের নারীবাদী সমালোচনার রূপরেখা দিন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসনের থেকে নারীবাদী চিন্তা বাদ রাখার তিনটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করুন।

(২) জনপ্রশাসনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গাউস কতগুলি উৎপাদকের কথা বলেন? সেগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন।

৪.৭ নির্বাচিত গ্রন্থ

Basu, Rumki (২০১২), *Public Administration : Concepts and Theories*, Sterling Publishers, নয়া দিল্লি।

Riggs, Fred W. (১৯৬১), *The Ecology of Public Administraion*, Asia Publishing House, বোম্বাই।

Riggs, Fred W. (২০০১), Comments on V. Subramaniam, "Comparative Public Administration", *International Review of Administrative Sciences* ৬৭(২) : ৩২৩-৩২৮।

Hutchinson, Janet R., and Hollie S. Mann (২০০৪), "Feminist Praxis : Administraing for a Multicultural, Multigendered Public", *Administrative Theory and Praxis*, ২৬(১) : ৭৯-৯৫।

Haque, M. Shamsul (২০১০), Rethinking Development Administration and Remembering Fred W. Riggs, *International Review of Administrative Sciences*, ৭৬(৪)।

Stivers, Camilla (২০০২), *Gender Images in Public Administration : Legitimacy and the Administrative State*, Sage Publications, ক্যালিফর্নিয়া।

Stivers, Camilla (২০০৫), Dreaming the World : Feminism in Public Administration, *Administrative Theory and Praxis*, ২৭(২) : ৩৬৪-৬৯।

পর্যায়—২

প্রশাসনিক তত্ত্বসমূহ

একক-১	☐	মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি : এলটন মেয়ো, চেষ্টার বার্নার্ড ও মেরি পার্কার ফলেট
একক-২	☐	পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি—হারবার্ট সাইমন
একক-৩	☐	উন্নয়ন প্রশাসন—ফ্রেড রিগ্‌স
একক-৪ (ক, খ)	☐	জনপছন্দ তত্ত্ব ও জননীতি বিশ্লেষণ

একক-১ ❑ মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি : এলটন মেয়ো, চেষ্টার বার্নাড ও মেরি পার্কার ফলেট

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গি পরিচিতি

১.৩ মানবিক সম্পর্কের উৎস সম্পর্কে ধারণা

১.৪ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা

  ১.৪.১ এলটন মেয়ো

  ১.৪.২ চেষ্টার বার্নাড

  ১.৪.৩ মেরি পার্কার ফলেট

১.৫ উপসংহার

১.৬ সারাংশ

১.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.৮ তথ্যসূত্র

১.৯ নির্বাচিত পাঠ

১.১ উদ্দেশ্য

এই বিষয়ের উদ্দেশ্য একাধিক সংস্কৃতি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ এবং পরিচালনমূলক সংগঠনের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রদের অবহিত করানো। এই পাঠক্রমের লক্ষ্য হল একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের পরিচালনগত দিক সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদান করা।

এই ইউনিট পড়ার পর ছাত্ররা :

- মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণাটি ব্যক্ত করতে সমর্থ হবেন,
- মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি নির্ধারণ করতে পারবেন
- মানবিক সম্পর্ক পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিহাস বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন এবং
- মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন এবং মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

১.২ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচিতি

১৯২০-এর দশকে ঐতিহ্যগত পরিচালন বিষয়ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের প্রবণতা পরিলক্ষিত

হয়। ঐতিহ্যগত পরিচালন তত্ত্বের তাত্ত্বিক ফ্রেডরিক টেলর, হেনরি গান্ট, ফ্রাঙ্ক এবং লিলিয়ান গিলবার্থ একটি নির্দিষ্ট কাজ কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে, একজন কর্মচারী কার্য সম্পাদনে কী পদক্ষেপ নেবেন এবং একজন কর্মচারী বিভিন্ন পদ্ধতিতে কত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন করতে পারবেন তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। এরপর একটি কার্য সমাপ্তির সবচেয়ে কার্যকর উপায় নির্ধারণ করতে এই তথ্য ব্যবহার করে তারা একটি সাধারণ তত্ত্ব নির্মাণের প্রচেষ্টা করেছেন।

১৯০০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত টেলরের বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের আধিপত্য ছিল। তিনি কর্মচারীদের সর্বাধিক উৎপাদনের দিকে আলোকপাত করেছেন। ঐতিহ্যগত পরিচালন তত্ত্বে সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি এবং দক্ষতার সঙ্গে উৎপাদন কার্য সম্পাদনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই তত্ত্বে কর্মচারীদের দক্ষতা ও কার্যক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও তাদের মানসিক চাহিদার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালক কিংবা শ্রমিক কেউই খুশি ছিলেন না।

সমালোচকরা ঐতিহ্যবাহি পরিচালন তত্ত্ব আরও খুঁটিতে পড়তে শুরু করেন, এই তত্ত্বে কর্মীদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবগুলিকে আরও ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য। কর্ম ও কর্মচারীদের সামঞ্জস্যের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়াই মানসিক বিপ্লবের প্রধান কারণ হয়ে উঠেছিল বলে অনেক সমালোচকই মনে করতেন না, যা টেলর এবং তার সহকর্মীরা আশা করেছিলেন। পক্ষান্তরে এই সময় পরিচালকদের মধ্যে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল যে কর্মীরা যন্ত্রের অনুসঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। যন্ত্র এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে সমতা আনা সম্ভব হলেও তাত্ত্বিকরা মনে করতেন আবেগগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এই সমতা আনা সম্ভব নয়। ফলত যখন টেলর ও ঐতিহ্যবাহী পরিচালন তাত্ত্বিকরা সমতা আনার বিষয়ে তাদের গবেষণা চালাতে থাকেন, তখন অন্যান্যরা কর্মীদের আচরণ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন এবং এইভাবে নয়া ঐতিহ্যবাহী পরিচালন তত্ত্বের শুরু হয়, যার প্রতি মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ আজও দায়বদ্ধ।

ধ্রুপদী দৃষ্টিকোণ সাধারণভাবে কর্মসংস্থানের উপর দৃষ্টিপাত করেছিল। অপরদিকে মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠানের মানবিক দিকগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। একে নবঐতিহ্যবাহী ধারণা বলা হয় কারণ, প্রাথমিক পর্বের পরিচালন ব্যবস্থার ঐতিহ্যবাহী ধারণার সীমাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এর জন্ম।

এই মানবিক সম্পর্কের আন্দোলন ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ সালে, ইলিনয় শহরে ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হর্থন প্ল্যান্টে সংগঠিত বেশ কয়েকটি বিখ্যাত পরীক্ষা-নীরিক্ষার দ্বারা প্রেরণা পেয়েছে, যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি হর্থন অধ্যয়ন নামে পরিচিত। যন্ত্র, উপকরণ ও বিমূর্ত প্রক্রিয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে মানবিক দিকগুলিকে অবহেলা করার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এটি বিকশিত হয়। এলটন মেয়ো মানবিক মতবাদের জনক হিসেবে আজ সর্বজনবিদিত। কর্মীদের প্রতিক্রিয়া এবং পারস্পরিক সমন্বয় ক্রিয়াকে আরও ভালোভাবে বুঝে নেওয়াই এই মতবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানবিক সম্পর্ক মতবাদ নিম্নলিখিত ছ'টি প্রস্তাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

- এই মতবাদ শুধুমাত্র যন্ত্র ও অর্থনীতির উৎপাদনশীলতার পরিবর্তে মানুষের উপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে,
- এই মতবাদ মনে করে যে, মানুষ একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে, কেবলমাত্র সংগঠিত প্রেক্ষাপটে নয়,

- মানবিক সম্পর্কের একটি অন্যতম কার্য হল অন্যকে প্রেরণা যোগানো,
- এই প্রেরণা দলবদ্ধভাবে কাজ করাকে উৎসাহ যোগায়, যা একে অপরের সাথে বোঝাপড়া এবং সমন্বয়সাধনের প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে।
- মানবসম্পর্ক দলগতভাবে কাজের মাধ্যমে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যগুলিকে পরিপূর্ণ করে তোলে।
- এই মতবাদ মনে করে যে, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়েই দক্ষতাকে এমন ভাবে ব্যবহারের কথা বলে থাকে, যাতে সবথেকে স্বল্প শ্রম দিয়ে সর্বাধিক লাভ অর্জন করা যায়।

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বলে মনে করে মানবিক সম্পর্ক মতবাদ ব্যক্তিসম্পর্ক এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের বিষয়গুলিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ব্যক্তির চাহিদা এবং আচরণকে নিরীক্ষণ করাই এর উদ্দেশ্য। প্রেরণার উন্মেষ ঘটানো এবং কাজের সন্তুষ্টিবিধান করাই এই মতবাদের মূল লক্ষ্য।

১.৩ মানবিক সম্পর্কের উৎস সম্পর্কে ধারণা

নব্য ধ্রুপদি তত্ত্বের ধারণা একটি প্রতিষ্ঠানের মানবীয় দিক সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করে। এই তত্ত্ব চেষ্টা করে আচরণবাদকে পরিচালন তত্ত্বের মধ্যে অঙ্গীভূত করতে। এই নব্য ধ্রুপদি তত্ত্বের দুটি মূল উৎস রয়েছে—মানবীয় সম্পর্কের আন্দোলন ও আচরণবাদী আন্দোলন। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীগণ মানবিক সম্পর্কের আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। মানুষ কীভাবে গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কীভাবে গোষ্ঠীর সাপেক্ষে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় মানবিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকদের বক্তব্যে তা আলোচিত হয়। আচরণবাদী আন্দোলন এসেছিল মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে, যারা এর মধ্যে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল প্রত্যেক কর্মীর স্বতন্ত্র আচরণের উপর। ঐ আন্দোলনে সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হর্থন, সিসেরো, ইলিনয়-এর কর্মীদের কার্যক্রম ও উৎপাদন ক্ষমতার উপর গবেষণা চালিয়ে ছিলেন। সেই গবেষণাটি "Hawthorne effect" নামে পরিচিত। গবেষক দলটি ঐ কোম্পানির কুড়ি হাজারেরও বেশি কর্মীর ওপর, ১৯২৪ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়েছিল। এই মানবীয় সম্পর্কের আন্দোলন ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক হর্থন কোম্পানির উৎপাদন বৃদ্ধি করার উপায় বের করেছিল, যা এলটন মেয়ো, উইলিয়াম ডিক্‌সন, ফ্রিট্‌জ. জে. রোথলিসবার্জার প্রমুখের গবেষণাজাত ফল।

হাভার্ড গবেষকদের গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি কর্মীদের উৎপাদন ক্ষমতার চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। এখানে সামাজিক চাপ কর্মীদের কর্মক্ষমতা প্রকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হর্থন গবেষণা প্রকাশ করে যে, কর্মীদের সম্পর্কের মতো সামাজিক ঘটনাগুলি কর্মীদের উপর প্রভাব ফেলে; এই সম্পর্কে পরিচালককে গুরুত্ব দিতে হবে। পরিচালক কর্মীদের সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে কর্মীদের কর্মদক্ষতা নিম্নগামী হয়। কর্মীদের প্রয়োজন তাদের কাজ সম্পর্কে যথার্থ মূলবোধ অর্জন; যদি এটি অর্জন করতে না পারে তাহলে তাদের কাজটি যথার্থ বলে গ্রহণযোগ্য হয় না। কর্মচারী তাদের পূর্বতন সহকর্মীর কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট কাজ করলে কাজটি যথোপযুক্ত হয়। মানবীয় সম্পর্কের তাত্ত্বিকগণ বলেন যে কর্মীরা মাঝে মধ্যেই যদি তাদের কাজ সংক্রান্ত তথ্য ও জ্ঞান আদানপ্রদান করে তাহলে, তাদের সামাজিকীকরণের চাহিদা পূরণ হয় এবং তারা অধিক কর্মক্ষম হন।

গবেষকগণ এই গবেষণা প্রকল্পটি দাঁড় করিয়েছিলেন কর্মীদের কাজের সময়, অবসর সময় ও কাজের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে; গবেষকরা কর্মীদের অংশগ্রহণকে খুব নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই নিরীক্ষা চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১.৪ মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা

এলটন মেয়ো ও তার সঙ্গীগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হর্থন ইলেকট্রিক কোম্পানির উপর গবেষণা চালিয়েছেন ১৯২৪ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। এই গবেষণা ক্ষেত্রে তারা ২০০০০ এরও বেশী কর্মচারীর উপর পরীক্ষা চালান এবং তাঁরা মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির বহুবিধ প্রয়োগিক দিক আবিষ্কার করেন। গবেষকদের সাধারণ সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, অযৌক্তিক বা আবেগপূর্ণ আচরণ অর্থনীতির সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রেও কর্মীগোষ্ঠীর উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের মতের ভিত্তিগুলি নিম্নরূপ :

১। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মী শুধুমাত্র আর্থিক লাভের দ্বারা তৃপ্ত হবে না, সেই সঙ্গে সামাজিক ও জৈবিক চাহিদা, অনুভূতি, অভিপ্সা বা আরো একাধিক বিষয়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত হন।

২। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিজে একটি সামাজিক ব্যবস্থা বা উপব্যবস্থা।

৩। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু আদেশ নয়, সহযোগী মনোভাব খুবই জরুরী। শুধুমাত্র আদেশমূলক আচরণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

৪। পরিচালন গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হলো কারিগরি দক্ষতার সাথে সাথে সামাজিক এবং নেতৃত্বের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

৫। একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নৈতিক উৎকর্ষতার ফল দ্রুত পাওয়া যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের এবং তার কর্ম সংস্কৃতির পরিবেশ সম্পর্কে নতুন চিন্তার সুযোগ করে দিয়েছিল। একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সংগঠনকে দেখার অভিমুখ এই তত্ত্বের অবদান এবং মানুষ এখানে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ভূমিকা নেয়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, নেতৃত্বের দক্ষতা, মানবীয় প্রেরণা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিশ্লেষণ যেমন এই দৃষ্টিভঙ্গীর ধারকরা করে থাকেন, তেমনি এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

এই তত্ত্বে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণে মানবিক ও সামাজিক ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণ কম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে মানবিক মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতার ওপর আলোকপাত করা হয়। শারীরিক ভিন্নতা ও উৎপাদনের মধ্যে যে কোনো সম্পর্ক নেই তা এই তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে কোনো পরিবর্তনই তাৎপর্যহীন বলে মনে করা হয়। অন্য একটি নিরীক্ষা সংগঠিত হয়েছিল ব্যাঙ্ক ওয়্যারিং ঘরে, যেখানে থেকে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে ব্যক্তিগত বেতন প্রদান গোষ্ঠী সম্পর্ককে উৎসাহ প্রদান করে। এটিও দেখা যায় যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু নিয়ম ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। হথর্ন অধ্যয়ন গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের উপর বেশি জোর দেয়। হথর্ন অধ্যয়ন এটি দেখায় যে প্রতিষ্ঠান হল এমন একটি সমাজ কাঠামো, যা আসলে গোষ্ঠী অধ্যয়ন ও গোষ্ঠী আচরণের সম্মিলিত রূপ। প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করে সামাজিক গোষ্ঠীকে লৌকিকতা বর্জিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাভার্ড গবেষকরা সিদ্ধান্ত করেন যে সহায়ক

পরিচালক উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয়। মানবীয় সম্পর্কের তত্ত্ব এ কথা বলে যে গোষ্ঠীর নিয়ম ও একতার ফলে যদি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সত্য হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি অধিক উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে আশাবাদী হতে পারে। কিন্তু সমালোচকরা সহমত যে যদি সহায়ক পরিচালক না থাকে তাহলে কার্যক্রম সম্বন্ধে ভীতির ফলে হতাশা আসে এবং সেক্ষেত্রে পরিচালকীয় নীতিকেই দায়ী বলে মনে করা যেতে পারে।

১.৪.১ জর্জ এলটন মেয়ো (১৮৮০-১৯৪৯)

জর্জ এলটন মেয়ো ছিলেন একজন অস্ট্রেলীয়ান মনোবিজ্ঞানী, শিল্প গবেষক ও সাংগঠনিক তাত্ত্বিক। ১৯৩০ সালে তাত্ত্বিক এলটন মেয়ো এবং তার সহযোগীরা শিকাগো ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রনিক কোম্পানীর হথর্ন প্ল্যান্টে একটি গবেষণা চালায়। মেয়ো কর্মীদের উপর যে গবেষণা করেছিলেন তা ছিল অনুমানভিত্তিক। প্রাথমিক ভাবে দুটি দলকে গবেষণার জন্য নির্বাচিত করা হয় এবং এটি তার উৎপাদনশীলতার পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। এটিতে দেখা গিয়েছিল যে আলোর পরিবর্তন, এমন কি সেটি খারাপ করার পরেও তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ থেকে এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছিল যে কাজের শর্তের পরিবর্তন তাদের উন্নতির পথে চালিত করে। কাজের শর্তের মধ্যে অন্যান্য ঐচ্ছিক শর্ত পরিবর্তন করে এটা দেখানো হয়েছিল যে কি করে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

মেয়োর কাজ 'হথর্ন তত্ত্ব' নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কাজের একঘেঁয়েমি ও পুনরাবৃত্তি কাজের গতিতে মন্থর ভাবে পরিচালিত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই প্রেরণাকে বাড়ানো যায় যদি কর্মীদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তাদের চিন্তার স্বাধীনতা এবং তাদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা যায়। মেয়োর মতে কাজের ক্ষেত্রে প্রেরণাকে গুরুত্ব দিতে হলে কতগুলি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে—

- বৃহত্তর যোগাযোগ
- ভালো দায়বদ্ধতা
- অন্যদের প্রতি আগ্রহ দেখানো
- সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যদের যুক্ত করা
- অন্যের কল্যাণ নিশ্চিত করা
- কাজকে আকর্ষণীয় করা ও পুনরাবৃত্তি রোধ করা

মেয়োর কাজ মানবিক সম্পর্ক আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে সহায়তা করেছিল। তিনি উৎসাহ প্রদান করে বলেন কর্মক্ষেত্রে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ভালো একটি অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের অস্থিত্ব প্রয়োজন। মেয়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব কতখানি। তাঁর এই ধারণা নিয়ে ১৯৩৩ সালে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম *The Human Problem of an Industrialized Civilization* এই বইটি আসলে হর্থন গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল এই যে, ব্যক্তিকর্মী একক ভাবে সাফল্য পাবে না, যদি না তারা সমষ্টিবদ্ধ ভাবে কাজ করে। হথর্ন গবেষণার কয়েকটি মৌলিক ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

- গবেষণায় উপলব্ধ হয় যে, আর্থিক সাফল্য এবং ভালো কাজের পরিবেশ নির্ভর করে সমষ্টিবদ্ধ কাজের ওপরে।

- কর্মক্ষেত্রের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক বা বেসরকারি গোষ্ঠী থাকলে সকল কর্মীদের কাজ করার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

এটা দেখা যায় যে পরিচালক যদি শ্রমিকদের সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করবে, না হলে বিরুদ্ধাচরণ করবে।

এলটন মেয়ো প্রতিষ্ঠানে মানবিক উপাদানের ওপরে গুরুত্ব দেন। মেয়ো বলেন যে কর্মীদের সামাজিক চাহিদা ও আগ্রহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তারা যেন টেলরের তত্ত্বের দ্বারা আর্থিকভাবে বঞ্চিত না হয়। মেয়োর তত্ত্ব এটা প্রমাণ করে যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায় নিয়ন্ত্রিত কর্মী গোষ্ঠীর দ্বারা। কর্মীরা যদি ভাবে যে তারা এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ, তাহলে তারা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করবে বলে গবেষকরা উল্লেখ করেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমে যেভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার উপর জোর দেওয়া হয় তা সমাজবিজ্ঞানের জগতে হথর্ন প্রভাব নামে পরিচিত।

ব্যাঙ্কের তারের ঘরে অন্য একটি গবেষণার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে পুরুষ কর্মীদের একটি ছোট দল বৈদ্যুতিক উপাদান উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই গবেষণা প্রমাণ করে যে কর্মীরা শুধুমাত্র আর্থিক বিবেচনার দ্বারা চালিত হয় না, যেটি প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক দিক হিসেবে চিহ্নিত হলেও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যাকে অনানুষ্ঠানিক দিক বলা যায়।

এই গবেষণা আবিষ্কার করে মানবিক উপাদানের গুরুত্ব এবং আরো একটি নতুন ক্ষেত্রের সূচনা করে যেটি কর্মীদের জ্ঞানের প্রয়োজনে সহায়তা করে। এই তত্ত্ব শ্রমিকদের অবসর সময়যাপন এবং ভালো জীবনযাপনের সহায়ক একটি পরিবেশের নক্সা তৈরি করে। এটি সত্য যে এই তত্ত্ব মানুষের সম্পর্কে তত্ত্বের উত্থানে এটি নূতন বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব।

টেলর কর্মক্ষেত্রে সৈন্যদের মতো নিয়মানুবর্তীতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু মানবিক সম্পর্কের তত্ত্ব সংগঠনের কর্মরত ব্যক্তিদের মানবিক চাহিদার ওপরে আলোকপাত করেছিল। এর ফলে, মানবিক সম্পর্কের তত্ত্ব একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য ধারণ করেছিল। বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে ঠিক একইভাবে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরিচালন এবং মানবিক সম্পর্কের তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য মেয়োর তত্ত্বের দ্বারা পরিস্ফুষ্ট হয়। মেয়োর ধারণায় কর্মীদের মানসিক অসামঞ্জস্যতার থেকে যৌক্তিক প্রতিক্রিয়া কর্মীদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মেয়ো কর্মীদের শ্রমিকসংঘের সদস্য হওয়া বা যৌক্তিকতার ওপরে আলাকপাত করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেলরের মতবাদ মেয়োর তুলনায় শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক বেশি সংবেদনশীল। তারা এও বলেন যে, উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনাক্ষেত্রের কৌশল থেকে উদ্ভুত।

১.৪.২ চেষ্টার বার্নার্ড - (১৮৮৬-১৯৬২)

চেষ্টার আরভিং বার্নার্ড ছিলেন আমেরিকান ব্যবসায়িক নির্বাহী। পরিচালন এবং প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বের স্রষ্টা, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই হল *The Functions of the Executive*, যা আসলে প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচলনগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে লেখা। বার্নার্ডের মৌলিক নীতিতে কৌশলগত পরিচালন পরিসরে পরিবর্তন এনেছিল। এই বিশ্লেষণে

দুটি জিনিসের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল। একটি হল পরিসংখ্যান থেকে প্রগতিশীল কাঠামোয় উত্তরণ এবং দ্বিতীয়ত পরিবেশের ভূমিকার ওপর আলোকপাত।

চেষ্টার বার্নার্ড বিশ্বাস করতেন যে প্রথাগত প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় কতকগুলি অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠী দিয়ে; এই অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠীগুলি পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। এই গোষ্ঠীগুলির বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি ও দৃঢ় মনস্কতাকে প্রতিষ্ঠিত করে, যা প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি করে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতার তত্ত্ব : পরিচালনতাত্ত্বিক চেষ্টার বার্নার্ড বিশ্বাস করতেন যে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ও দক্ষতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কার্যকারিতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের সময়োপযোগী উপায়। তার মতে দক্ষতা হল কর্মীদের উদ্দেশ্য বুঝতে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা। বার্নার্ড বিশ্বাস করতেন যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হবে এবং কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, যখন কর্মচারীরা অনুভব করবে যে তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূর্ণ হচ্ছে; এটি কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতার তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত।

বার্নার্ডের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদার পূরণ ও সার্থক মনোভাব একটি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাকে বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তিনি আরো বলেছেন একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদস্যদের অন্তর্গত সহযোগিতার মান ঐ প্রতিষ্ঠান তার সদস্যদের কতটা তৃপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে।

যে প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে সেই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী হয়। বার্নার্ডের মতে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কেবলমাত্র তার উদ্দেশ্য পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বলতে বার্নার্ড যা বুঝিয়েছেন, তা গতানুগতিক অর্থ থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। বার্নার্ড ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্কের উপরই আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর ১৯৩৮ সালের প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ *The Function of the Executive*-এ দেখান কীভাবে কার্যকারিতা এবং দক্ষতা মূলগতভাবে ভিন্ন। যখন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ হয় তখন আমরা বলতে পারি যে সেটি কার্যকরী হয়েছে। যখন একটি কার্যের ফলাফল অসন্তোষজনক হয়, তখন সে কাজটি অকার্যকারী হয়েছে বলে মনে করা হয়। যদি কার্যটির ফলাফল গুরুত্বহীন অথবা নগণ্য হয় তাহলেও কার্যটি 'কার্যকরী' হয়েছে বলে বলা হয় (চেষ্টার বার্নার্ড, ১৯৩৮, পৃ. ১৯)।

কর্তৃপক্ষের গ্রহণ তত্ত্ব বলে যে একজন পরিচালকের কর্তৃত্ব নির্ভর করে, যে সেই কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে তার উপর। কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাস জাগানো হয় যে পরিচালক বৈধভাবে আদেশ দিতে পারেন এবং সেই আদেশগুলি যথার্থভাবে সম্পন্ন হবার প্রত্যাশাও কর্মীদের মধ্যে রয়েছে। এই প্রত্যাশার বেশ কয়েকটি কারণ আছে :

- কর্মচারীদের আদেশ মেনে চলার জন্য পুরস্কৃত করা হবে।
- আদেশ না মানার জন্য তাকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- পরিচালকের অভিজ্ঞতার জন্য শ্রমিকরা তাঁকে সম্মান করবে।

অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক সংগঠন : বিভিন্ন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকদের দল নিয়ে তৈরি করা হয়, এই কর্মচারীরা অনানুষ্ঠানিক সামাজিক দল তৈরি করে থাকে, যা অনানুষ্ঠানিক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই অনানুষ্ঠানিক সংগঠন বৃহত্তর আনুষ্ঠানিক সংগঠনের মধ্যে বিদ্যমান।

আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান কিছু নিয়মনীতির মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক এবং উৎপাদন লক্ষ্যের উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালক ও কর্মচারী সম্পর্ক ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যাসের দ্বারা পরিচালিত হয়। কর্ম সংক্রান্ত নির্দেশ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে কর্মচারীদের প্রতি প্রবাহিত হয় ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাসের মাধ্যমে।

বার্নার্ড প্রতিষ্ঠানকে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা হিসাবেই দেখেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন যে এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব দাবি করতে পারে না। বার্নার্ডের মতে প্রতিষ্ঠান যে দীর্ঘমেয়াদি হয়ে উঠতে পারে না, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কার্যকারিতা ও দক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব সহযোগে আলোকপাত করতে হবে।

বার্নার্ড প্রশাসকের দায়িত্বগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নির্দিষ্ট করেছেন :

- যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে যথার্থভাবে বজায় রাখা,
- অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা আদায় করে নেওয়া,
- প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা।

বার্নার্ড দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন—প্রথমটি কর্তৃত্বের তত্ত্ব এবং অপরটি উৎসাহ ভাতা (Incentives)। উভয়কেই যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরিখে দেখেছেন এবং সাতটি অপরিহার্য নীতি প্রণয়নও করেছেন :

- যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবাহপথ সুনির্দিষ্ট হতে হবে,
- সকলকে যোগাযোগের প্রবাহপথ সম্পর্কে অবগত হতে হবে,
- সকলেই যেন যোগাযোগের প্রবাহ পথে সহজেই পৌঁছতে পারেন,
- যোগাযোগ ব্যবস্থা পদ্ধতি হিসেবে যতটা সম্ভব সরাসরি বা বাধাহীন হবে,
- যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম দক্ষতা যথার্থ হতে হবে,
- যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন হবে, বিশেষত যখন প্রতিষ্ঠানের কাজ চলেছে,
- প্রতিটি যোগাযোগ যাচাই করে নেওয়া উচিত।

বার্নার্ডের মতে কর্তৃত্বমূলক যোগাযোগ সফল হতে পারে যদি—

(ক) যোগাযোগ সহজে বোধগম্য হয়ে ওঠে,

(খ) যদি তা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে না পড়ে,

(গ) যদি তা ব্যক্তিগত আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং

(ঘ) যদি সংগঠনের অভ্যন্তরের ব্যক্তিগণ তা মেনে চলার জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম হয়।

অতএব উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের উপর যোগাযোগ ব্যবস্থা কর্তৃত্বমূলক কিনা তা নির্ভর করে না, বরং তা অধস্তন কর্মচারীদের উপরই নির্ভর করে।

বার্নার্ড তাঁর *The Economics of Incentives* বই-এর ১১ নম্বর অধ্যায়ে বলেছেন, 'যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ ভাতা প্রদানের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দেখা যায় সেই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব

বজায় রাখার প্রশ্নে'। বস্তুগত প্রাপ্তি থেকে শুরু করে বিমূর্ত সহায়তা অবধি বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে সাধারণ উৎসাহ ভাতাও থাকে, যা সামাজিক সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দকে নিশ্চিত করে থাকে (বার্নাড চেষ্টার, ১৯৩৮, পৃ. ১৩৯-১৪৯)।

অনেকে (যেমন, Guy Callender) অভিযোগ করে থাকেন যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বার্নাডের দেওয়া দক্ষতার সংজ্ঞা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ বলা চলে। বার্নাডের কর্তৃত্ব বিষয়ক ধারণাগুলি এই বাস্তব সত্য স্বীকার করে নিতে অসমর্থ হয় যে নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যবসায়ীরা তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, দমন এবং নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বার্নাড একটি প্রতিষ্ঠান ও তার গ্রাহকদের সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেননি। বার্নাড একটি ব্যবসায়ী সংস্থার প্রশাসক কীভাবে আধিকারিক সভা (Board of Directors) ও লগ্নিকারীদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন সে দিকেও আলোকপাত করেননি। এমনকি, কর্মীদের নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রেও প্রশাসকের দায়িত্বগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই তাঁর লেখনীতে।

বার্নাডের দৃষ্টিকোণের সাথে মেরি পার্কার ফলেট এর তত্ত্বের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

১.৪.৩ মেরি পার্কার ফলেট (১৮৬৮-১৯৩৩)

মেরি পার্কার ফলেট (৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮—১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৩) ছিলেন একজন আমেরিকান সমাজকর্মী ও পরিচালন উপদেষ্টা। সাংগঠনিক তত্ত্ব ও সাংগঠনিক আচরণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তিনি ঐতিহ্যবাহী তত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনোযোগের অভাব এবং কর্মচারীর প্রাথমিক মানবিক চাহিদা তাঁর আলোচনা কেন্দ্রে উঠে এসেছে। তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত তৈরির মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন। সাংগঠনিক অধ্যয়নের উন্নতিতে বোঝাপড়া, ক্ষমতা এবং কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উপর তিনি আলোকপাত করেন এবং সেইসঙ্গে, বিকল্প সমাধানের পথ এবং মানবিক সম্পর্ক আন্দোলন নিয়েও বক্তব্য রাখেন। তিনি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

মেরি পার্কার ফলেট ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত সংগঠনের অনুভূমিক যোগাযোগের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন; একটি সংগঠনের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলির উপর গুরুত্ব দেয় এবং কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বা authority of executive সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ক্ষমতা সম্পর্কে ফলেটর ধারণা :

ফলেট জনসম্প্রদায়ের সার্বিক দিকটার কথা মাথায় রেখে “পারস্পরিক সম্পর্ক” এর ধারণা দিয়েছেন যা ব্যক্তি ও অন্যান্যদের সম্পর্কের টানাপোড়েনের দিকটা বুঝতে সহায়তা করে। ফলেট ‘সংহতি’-র ধারণার মাধ্যমে তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই “সংহতি” অথবা “শক্তি প্রয়োগ” ছাড়াই ক্ষমতার বিভাজনের ধারণাটি তাঁরটি মস্তিষ্ক প্রসুত। ‘ক্ষমতা প্রয়োগের’ পরিবর্তে (Power over) ‘ক্ষমতা সহ’ (Power with) চলার বার্তা তাঁর আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে।

ফলেট ক্ষমতা সঞ্চালন তত্ত্বের (Circular theory of power) উদ্ভাবকও ছিলেন। তিনি সম্প্রদায়ের সার্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে “পারস্পরিক সম্পর্ক” এর ধারণা দিয়েছিলেন, যা ব্যক্তিমানুষের সাথে অন্যান্যদের সম্পর্কের টানাপোড়েদের দিকটা বুঝতে সাহায্য করবে। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত তাঁর *Creative Experience*

বইটিতে তিনি লেখেন, ‘প্রতিক্রিয়ার আদানপ্রদানের মধ্যে ক্ষমতার জন্ম হয়ে থাকে, এবং এরপর এই প্রতিক্রিয়াগুলি একটি ব্যবস্থার আকার নেয়। ঐ ব্যবস্থার কাঠামো আরো ক্ষমতার দিকে নিয়ে যায়। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে আমি আমার নিজের উপর আরো বেশি করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, যখন আমার বিভিন্ন আগ্রহগুলিকে সংহত করতে পারবো। সামাজিক সম্পর্কে ক্ষমতা নিজেকে নির্মাণ করতে সক্ষম। ক্ষমতা জীবন শক্তির বৈধ এবং অনিবার্য ফলাফল হিসাবে প্রতিভাত হয় আমরা সবসময়ই ক্ষমতার বৈধতা সম্পর্কে পরীক্ষা করতে পারি, এই প্রশ্ন করে যে ক্ষমতার প্রক্রিয়ার সাথে অন্তরের যোগ রয়েছে, নাকি বাহ্যিকভাবে ক্ষমতার প্রযুক্তি হচ্ছে।

ফলেট দেখিয়েছেন যে ‘‘ক্ষমতা সহ চলা’’ এবং ‘‘ক্ষমতার প্রয়োগ’’-এর ধারণার মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে প্রতিষ্ঠান সাধারণভাবে ক্ষমতার প্রয়োগের পরিবর্তে ক্ষমতা সহ চলার বার্তা দিতে পারে, সেই প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ফলাফলের প্রত্যাশী হতে পারে। তাঁর মতে রাজনীতি অথবা শিল্পে গণতন্ত্র বলতে ‘‘ক্ষমতার সহ চলার’’ ধারণাকেই বোঝানো হয়ে থাকে (Follet, 1924, 187)। তিনি সংহতি এবং ‘‘ক্ষমতা বিভাজনের’’ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমঝোতা, সংঘাতের সমাধান, ক্ষমতা এবং কর্মচারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সাংগঠনিক অধ্যয়নকে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে প্রবাবিত করেছে। মেরি পার্কার ফলেট ‘‘সংহতির মাধ্যমে সংঘাতের সমাধান’’—এই ধারণার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সংহতির মাধ্যমে সমাধানের অর্থ হলো প্রতিটি পক্ষের যথার্থ চাহিদাগুলো নির্দিষ্ট করা, যা দুই পক্ষের তরফেই যেন উপকার হয় “Win Win”, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ চাহিদাগুলো পুরণের লক্ষ্যে কাজ করলে সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

নূতন গণতন্ত্র সম্পর্কে ফলেটর ধারণা :

ফলেট তাঁর গবেষণা চলাকালীন সকলের লাভ এই দর্শন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। সংঘাত সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল যে সংঘাতকে বহুত্বের কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করে সুসংহত সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়ার একটি সুযোগে পরিণত করা উচিত। তিনি সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফলেট সাধারণ মানুষদের সামাজিক ও দলগত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতেন, তিনি মনে করতেন এই ধরনের সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র সম্পর্কে অবগত হবে। তাঁর গ্রন্থে লিখে ছিলেন, ‘কেউই আমাদের গণতন্ত্র দিতে পারে না, আমাদের গণতন্ত্র শিখে নেওয়া উচিত’। তিনি আরো বলেছেন এই নতুন গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণ একেবারে মাতৃক্রোড় থেকেই শুরু হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে খেলাধূলা জাতীয় কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই এই শিক্ষার প্রসার ঘটানো উচিত। নাগরিকতার শিক্ষা কেবলমাত্র ভালো প্রশাসনিকতার শ্রেণি কক্ষ কিংবা সাধারণ জ্ঞানের অথবা সামাজিক শিক্ষার পাঠক্রমেই পাওয়া যাবে না, এটি কেবলমাত্র সেই বিশেষ ধরনের জীবনযাপনের মাধ্যমেই নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে লাভ করা যায়। ছাত্র জীবনের শিক্ষায়, আমাদের পারিবারিক জীবনে, ক্লাব জীবনে এবং আমাদের সমাজ জীবনে এটি অবশ্যই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তাঁর মতে গোষ্ঠী সংগঠন একটি সমাজকেই কেবল সাহায্য করে না, একই সঙ্গে ব্যক্তির জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটায়। গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির মতামতের ও গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন যাপনের মানোন্নয়নের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তিনি পরামর্শ দেন যে একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমেই তাদের যে সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে, তা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নও ঘটবে। মেরি পার্কার ফলেট তাঁর

নেতৃত্বদানের তত্ত্বে বলেন যে যথার্থ ক্ষমতা কখনোই শক্তি প্রয়োগ করে না, বরং তা সকলকে নিয়েই চলতে চায়। যথার্থ নেতা ফলেটের তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রকাশ করার পরিবর্তে দলগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

সমন্বয়ের নীতি সমূহ :

মেরি পার্কার ফলেট সমন্বয়ের চারটি মূলনীতি উত্থাপন করেছেন—

১. প্রাথমিক পর্যায়ের নীতি (Principle of Early Stage) : এই নীতি অনুযায়ী সমন্বয় পরিচালন ব্যবস্থায় একেবারে প্রাথমিক স্তরে শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়; একেবারে পরিকল্পনা স্তরে যদি তা শুরু হয়, তবে ঐ পরিকল্পনার দ্বারা পরিকল্পনাগুলি সহজেই প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় পরিচালন কার্য সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে। এই ভাবে যথার্থ সমন্বয় সাধন করে একটি প্রতিষ্ঠান সহজেই সকল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে পারে।

নিরবিচ্ছিন্ন নীতি : এই নীতি অনুযায়ী সমন্বয় প্রতিষ্ঠানের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সমগ্র সময় ধরে তা বজায় থাকবে। ফলে সমন্বয়টি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং সমন্বয় ক্রমাগত পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হতে থাকবে।

- **সরাসরি যোগাযোগের নীতি :** এই নীতি অনুযায়ী সকল পরিচালকদের উচিত অবশ্যই তার অধস্তনদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা। এর ফলে পরিচালক ও তার অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। সরাসরি যোগাযোগ ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা কমায় এবং পরিচালক ও অধস্তনদের মধ্যে বিরোধ মেটাতে সাহায্য করে। এর সাহায্যে পরিচলক তার অধস্তনদের বিভিন্ন কার্যগুলির মধ্যে সহজেই সমন্বয় সাধন করতে পারে।

- **পারস্পরিক সম্পর্কের নীতি :** একজন ব্যক্তি অথবা বিভাগের সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্য অপর সংগঠনের বিভাগ ও ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেলে। একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ অন্যান্য সকলের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত, ফলে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব পরিচালকের একবার চিন্তা করা উচিত, ঐ সিদ্ধান্তের প্রভাব অন্যান্য ব্যক্তি ও দপ্তরের উপর কীভাবে পড়বে; একেই বলা হয় পারস্পরিক সম্পর্কের নীতি। এই নীতি যথার্থভাবে পালন করলেই সমন্বয় সাধন সফল হবে।

মেরি পার্কার ফলেটের পরে আধুনিক পরিচালন বিশেষজ্ঞরা সমন্বয়ের আরো চারটি নীতি প্রণয়ন করেছেন। যা হল—

- **কার্যকরী যোগাযোগের নীতি :** সমন্বয় সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পিছনে কার্যকরী যোগাযোগের অবদান যথেষ্ট, ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিটি দপ্তরে সমস্ত কর্মীর মধ্যে, পরিচালকদের মধ্যে এবং তাদের অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার সকল প্রকার বাধা ও ফাঁক এড়িয়ে গিয়ে অথবা তার সমাধান করে কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তুলতে পারলেই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সম্ভব হয়ে উঠবে।

- **পারস্পরিক সম্মানের নীতি :** সমন্বয় তখনই সফল হতে পারে যদি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানের পরিস্থিতি বজায় থাকে। প্রত্যেক পরিচালক একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। একই ভাবে সব কর্মচারীরাও একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও সম্মান প্রদর্শন করে থাকবে। পরিচালক ও কর্মচারীদের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন ছাড়া সমন্বয়কে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব।

- **লক্ষ্যের স্বচ্ছতা নীতি :** সমন্বয় তখনই সফল হতে পারে যদি প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যগুলিকে স্পষ্টভাবে এবং স্বচ্ছভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং উদ্দেশ্যগুলিকে যথার্থ ভাবে বুঝে উঠতে পারে। স্বচ্ছ উদ্দেশ্য সহজে এবং শীঘ্রতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব।
- **স্কেলার (Scalar Chain) শৃঙ্খলের নীতি :** স্কেলার শৃঙ্খল কর্তৃত্ব বাচক রেখা। এই রেখা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সদস্যকে (পরিচালক থেকে কর্মচারী) উচ্চতর থেকে নিম্নস্তরে যুক্ত করে। রেখার নিচের দিকে থাকা প্রতিটি সদস্য নির্দিষ্ট থাকবে। আবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁর অধস্তন কর্মচারীকে তাঁর নিয়ন্ত্রণের পরিধির মধ্যে রাখবে। যথার্থ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য Scalar শৃঙ্খল অপরিহার্য। সাধারণ পরিস্থিতিতে Scalar শৃঙ্খলকে কখনোই বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়।

যদিও ফলেট তাঁর মতবাদ সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু হথর্ন অধ্যয়ন থেকে পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

১.৫ উপসংহার

মানব সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা টেলরের সাবেক বৈজ্ঞানিক ভাবধারার বিরুদ্ধাচরণ করে। বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্ব শ্রমকে বিজ্ঞান নির্ভর করে তুলেছিল, পক্ষান্তরে মানুষের সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করেছিল যে পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মীদের ব্যক্তি হিসেবে বিশেষ কিছু চাহিদা আছে। এই প্রক্রিয়ায় কর্মীরা তাদের কাজের মাধ্যমেই তাদের আত্ম পরিচিতি ও স্থায়িত্ব অর্জন করবে এবং এর ফলে তারা কার্যে যে পরিতৃপ্তি অনুভব করবে, তা তাদের প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধন করা ও উদ্দেশ্যপূরণে আরো উৎসাহ জাগাবে বলে মনে করা হয়েছিল। মানব সম্পর্ক আন্দোলন প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেয় এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ ও গোষ্ঠী ব্যবস্থা ও নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেয়। পরিচালন ব্যবস্থার মানব সম্পর্ক মতবাদ বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা থেকেই গড়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করা হলেও এই ধারণা অনেকেই মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

অনেকে তর্ক তুলেছেন যে মানব সম্পর্কের আন্দোলনে এলটন মেয়োর প্রভাব কতটা ছিল তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। অনেক তাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন যে হথর্ন পরীক্ষার অনেক আগেই মানব সম্পর্কের ধারণা গড়ে উঠেছিল, যা এই মানব সম্পর্ক আন্দোলনকে ইন্ধন দিয়েছিল। টেলরের গবেষণা মানুষের কর্মস্পৃহা জাগাতে কোন বিষয়গুলি কার্যকরী সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করলেও তার মূল গবেষণা কিন্তু মানবসম্পর্কে আন্দোলনের থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল।

এ প্রসঙ্গে টেলর সমাজের সভাপতি Henry & Dennison-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এরা টেলরের নীতিসমূহকে মানবিক সম্পর্কের ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত করে টেলরবাদ ও মানবিক সম্পর্কের ভাবনার মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মানবিক সম্পর্কের ধারণার মধ্যেও শ্রমিকদের কাজের যুক্তি ও পরিচালকের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সম্পৃক্ত করে টেলরবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য আনয়নের চেষ্টা করা হয়েছিল।

১.৬ সারাংশ

১৯২০-এর দশকের প্রাথমিক পর্বে সনাতন পরিচালন তত্ত্ব থেকে সরে এসে সংগঠনের মানবিক দিকের ওপর আলোকপাত করা শুরু হয় এবং কর্মীদের সামাজিক চাহিদার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রচেষ্টা হয়। মানবিক সম্পর্ক আন্দোলন এবং আচরণবাদী পরিচালন আন্দোলনের বিকাশ সম্বন্ধে একটি ধারণা এই পাঠের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

মানবিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বকে পরিচালনের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। এই বিশেষজ্ঞরা আন্তর্ব্যক্তি ও আন্তর্গোষ্ঠী সম্পর্কের সাপেক্ষে সংগঠনকে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করেন। গণপরিচালনকে গুরুত্ব দেওয়া এই তত্ত্বের বিশেষ অবস্থান। শ্রমিকদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে এই তত্ত্বের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। মানবিক সম্পর্কের তত্ত্বের অন্যতম অবদানের সাক্ষর রাখেন Elton Mayo তাঁর হথর্ন গবেষণার মাধ্যমে বা Chester Barnard তার সমবায়িক ব্যবস্থার ভাবনার মাধ্যমে।

নয়া সনাতন তত্ত্ব তার তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সংগঠনের মানবিক দিকের ওপর আলোকপাত করেন। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিকদের দ্বারা সমৃদ্ধ মানবিক সম্পর্কের তত্ত্ব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষিতে সংগঠনের উৎপাদনশীলতাকে পরিমাপ করতে সচেষ্ট হন।

১.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) মানবিক সম্পর্কের আন্দোলনের উদ্ভবের প্রেক্ষিতটি পর্যালোচনা করুন।

(২) মানবিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গীটির মূল্যায়ন করুন।

(৩) মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গীতে এলটন মেয়োর অবদান পর্যালোচনা করুন।

(৪) হর্থন প্রভাবের ওপর একটি সমালোচনামূলক টীকা লিখুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) চেষ্টার বার্নার্ডের 'Acceptance theory to authority' ব্যাখ্যা করুন।

(২) একটি সংগঠনের সাপেক্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চেষ্টার বার্নার্ড কিভাবে বর্ণনা করেন?

(৩) চেষ্টার বার্নার্ডের অভিমত অনুসারে আনুষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠান বহির্ভূত সংগঠন কিভাবে কাজ করে থাকে?

(৪) মেরি পার্কার ফলেটের ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনার ধারণাটি মূল্যায়ন করুন।

(৫) মেরি পার্কার ফলেটের সমন্বয় সংক্রান্ত ভাবনাটি ব্যাখ্যা করুন।

(৬) 'নয়া গণতন্ত্র' সম্বন্ধে মেরি পার্কার ফলেটের ধারণাটি বিস্তৃত করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) মানবিক সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তিগুলি উল্লেখ করুন।

(২) এলটন মেয়ো-র মতানুসারে কাজের ক্ষেত্রে প্রেরণাকে গুরুত্ব দিতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয়ে জোর দেওয়া উচিৎ?

(৩) টীকা লিখুন : আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিক সংগঠন।

১.৮ তথ্যসূত্র

Barnard, Chester I (1938), *The Functions of the Executive.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Callender, Guy (2009), *Efficiency and Management.* London and New York: Routledge.Follett, Mary P(1924) 2001, *Creative Experience*, Bristol, U.K.: Thoemmes

Follett, Mary P(1918) 1998, *The New State: Group Organization the Solution of Popular Government.* Pennsylvania State University Press.

১.৯ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

একক-২ ❑ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি—হারবার্ট সাইমন

গঠন

২.১ **উদ্দেশ্য**

২.২ **পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা**

২.৩ **পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব**

২.৪ **পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা**

  ২.৪.১ হারবার্ট সাইমন

২.৫ **উপসংহার**

২.৬ **সারাংশ**

২.৭ **নমুনা প্রশ্নাবলী**

২.৮ **তথ্যসূত্র**

২.৯ **নির্বাচিত পাঠ**

২.১ উদ্দেশ্য

একটি সংগঠনে কর্মীদের আচরণ এবং কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির তাগিদে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সংগঠন পরিচালনায় ব্যবহারের কথা ভাবা হয়। আচরণবাদী পরিচালনের তত্ত্ব সাবেক পরিচালনের উৎপাদনকেন্দ্রীকতা থেকে সরে এসে নেতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এমন কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে, যাতে কর্মীদের কাজের তৃপ্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মানবিক চাহিদা পূরণ হয় ও ভালো কাজের পরিবেশ পায়।

নিম্নের পাঠের উদ্দেশ্য হল : ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আচরণবাদী পরিচালন তত্ত্বের ধারণাটি উন্মুক্ত করা।

- সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যক্ত করা এবং কর্মস্পৃহা সম্বন্ধে ধারণাটি স্পষ্ট করা;
- এই পাঠ শেষে সাবেক সংগঠন তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনামুলক আলোচনা ও পার্থক্য নিরূপণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে;
- পাঠটির সমাপ্তি আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবন্ধতাগুলোকে স্পষ্ট করবে।

২.২ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পরে সনাতন পরিচালন তত্ত্ব আবির্ভুত হয়, যা সামগ্রিকভাবে সংগঠনের দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও কর্মীদের উৎপাদনের উপরে আলোকপাত করে। ফ্রেডারিক উইনস্লো টেলর তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিচালন তত্ত্বের মাধ্যমে উৎপাদনে দক্ষতা ও কর্মীদের উৎপাদনশীলতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সনাতন

পরিচালন তত্ত্বের অপর এক নক্ষত্র চিন্তাবিদ ম্যাক্স হেবেবার তাঁর আমলাতান্ত্রিক পরিচালন তত্ত্বের মাধ্যমে সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের দক্ষতা ও বিশেষ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেছিলেন; রাষ্ট্র পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা হেবেবারের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হেনরি ফেয়ল সনাতন পরিচালন তত্ত্বের উপস্থাপনা করতে গিয়ে ব্যবস্থাপনার আঙ্গিকে পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত স্তরে কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

সনাতন পরিচালন তত্ত্বের প্রবক্তা ও বাহকগণ মানবিক ও আচরণগত গুণাগুণের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা চাহিদাকে উপেক্ষা করার জন্য সনাতন পরিচালন তত্ত্বকে সমালোচিত হতে হয়েছে।

সনাতন পরিচালন তত্ত্বের ধ্যান-ধারণা থেকে সরে এসে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালনের দক্ষতা আনয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন; কর্মীর কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির তাগিদকে পরিচালনের মুখ্য দায়িত্ব হিসেবে ব্যক্ত করেন। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নকে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে আচরণবাদী পরিচালন তাত্ত্বিকগণ উল্লেখ করেন। সনাতন পরিচালন তাত্ত্বিকগণ সমসাময়িক পরিস্থিতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশাসনিক নীতির বিকাশ ঘটাতে পারেননি। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের ওপরে আলোকপাত করে পরিচালন তত্ত্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন।

আচরণবাদী পরিচালন তত্ত্বকে মানবিক সম্পর্ক তত্ত্বের সঙ্গে একাসনে বসানো হয়, কারণ এই তত্ত্বও কর্মক্ষেত্রে মানবিক বিষয়াদির ওপর আলোকপাত করে থাকে। আচরণবাদী পরিচালন তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে মানুষের কর্মস্পৃহা, সংঘাত, চাহিদা এবং গোষ্ঠী সম্পর্ক উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে। এই তত্ত্বের ধারক ও বাহকগণ কর্মীকে একজন ব্যক্তি, পুঁজি ও সম্পদ হিসেবে গণ্য করে সনাতন পরিচালন তত্ত্বের যান্ত্রিকতাকে বর্জন করেছিলেন। আচরণবাদী পরিচালন তাত্ত্বিকগণ উল্লেখ করেন যে, পরিচালকগণ যদি কর্মীদের সংগঠনের রত্ন হিসেবে বিবেচনা করেন, তাহলে সংগঠনের লক্ষ্য পূরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সহজসাধ্য হবে।

সনাতন পরিচালন তত্ত্বের বিরোধীতা করে মানবিক সম্পর্ক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ ব্যক্তিগত স্তরে কর্মীর আচরণ, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সংগঠনে কর্তৃত্বের প্রকৃতির ওপরে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠান বহির্ভূত ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক, গোষ্ঠীভিত্তিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগের ধরণ মানবিক সম্পর্ক তত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে।

উক্ত আঙ্গিককে নতুন মাত্রা দেয় আচরণবাদী তাত্ত্বিকগণ, যারা মানবিক কর্মস্পৃহা এবং সামাজিক পরিবেশের সাপেক্ষে একটি সংগঠনের উৎপাদনশীলতাকে পরিমাপ করে। সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিদের আচরণ বিশ্লেষণ পূর্বক সংগঠনের কাজে ঐ আচরণের প্রভাব আচরণবাদী তাত্ত্বিকদের আলোচনার বিশেষ স্থান পায়। মনস্তাত্ত্বিকগণ ও সমাজতাত্ত্বিকগণ আচরণবাদী পরিচালনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

মানব সম্পর্ক তত্ত্ব এবং আচরণবাদী তত্ত্ব কয়েকটি সাধারণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন—

(১) উভয় তত্ত্বই মানুষের কর্মস্পৃহার ওপর আলোকপাত করে।

(২) যোগাযোগের স্পষ্টতার ওপর উভয় তত্ত্বই গুরুত্ব দেয়।

(৩) ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব উভয় তত্ত্বের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর আচরণ উভয় তত্ত্বেরই আলোচ্য বিষয়।

উভয় তত্ত্বের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য ও লক্ষ্যণীয়। মানব সম্পর্ক তত্ত্বে গোষ্ঠীর আচরণ আচরণবাদী তত্ত্বের মত করে গুরুত্ব পায়নি। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে গণ্য করে এবং সেই কারণে মনে করে যে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের চিন্তা ও বিশ্বাসের দ্বারা যৎপরনাস্তি প্রভাবিত হয়। এর ফলে গোষ্ঠীগতভাবে মানুষের আচরণের ধারা নির্ধারিত হয়। আচরণবাদী তাত্ত্বিকদের মতে সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ এবং কর্ম সম্বন্ধে বিশ্লেষণ আবশ্যক, যাতে সমগ্র সংগঠনের আচরণ উপলব্ধি করা যায়। ভাবনার এই অভিনবত্ব আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো উন্নত ও আধুনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২.৩ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব

পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিকাশ ঘটেছে বহু বছর ধরে। পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা মনে করেন যে যেকোনো সংগঠিত কার্যকলাপের কেন্দ্রে ব্যক্তির অবস্থানকে যথাযথ গুরুত্ব সহযোগে বিবেচনা করা উচিত। যেকোনো সংগঠনে যে সকল ব্যক্তিগণ কাজ করেন তারা বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ থেকে আসেন, তাদের স্বার্থ, চাহিদা, ভাবনা ও উচ্চাশাগুলোও ভিন্ন ধরনের। মানবিক সম্পর্কের তত্ত্বের থেকে রসদ নিয়ে ব্যক্তির বিভিন্নতার ওপর সবিশেষ আলোকপাত করে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালন তত্ত্বে একটি নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটায়।

সংগঠনের কর্মরত কর্মীদের চাহিদার প্রতি পরিচালককে সংবেদনশীল করে তোলার সুসংহত প্রয়াস করেছিল মানব সম্পর্ক তত্ত্ব, যার বিকাশ ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। ১৮০০ এর শেষভাগ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত সময়কালে ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য আমেরিকাতে শিল্পের বিকাশ সীমাহীন হয়ে ওঠে। এইসময়ে সস্তায় শ্রম যেমন সুলভ্য ছিল, তেমনি গড়ে উঠেছিল তৈরী সামগ্রী বিক্রয়ের বাজার। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের এই প্রাবল্য ধাক্কা খায় ১৯৩০ এর মন্দাকালে। বিশেযজ্ঞরা এই অভূতপূর্ব মন্দার জন্য দায়ী করেন পরিচালকদের এবং সমস্ত সহানুভুতি গিয়ে পড়ে শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে। ১৯৩৫ সালে মার্কিন সংসদ তথা কংগ্রেস Wagner Act প্রণয়ন করে, যা শ্রমিক সংগঠন ও পরিচালকের মধ্যে দরকষাকষিকে আইনি বৈধতা দেয়। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকগণও শ্রমিক সংগঠনের চাপ এবং মোকাবিলার উপায় খুঁজতে থাকেন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্বে মানব সম্পর্ক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তা হল, কর্মী যদি তার কাজ থেকে তৃপ্তি লাভ করেন, তাহলে তিনি সংগঠনে যোগদান করবেন না। ব্যবসায়িক পরিচালকগণ, অতএব, মানবসম্পর্কের পদ্ধতি গ্রহণ করে শ্রমিক সংগঠনের হুমকি ও চাপ মোকাবিলা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। আচরণবাদী বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের কথা ভাবা শুরু করেন, যেখানে বৈজ্ঞানিক পরিচালনের নানা কৌশল শিক্ষার পরিবর্তে কর্মীদের ওপরে আলোকপাত করা হবে। হথর্ন পরীক্ষার মত গবেষণাগুলো কর্মক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক বিষয়াদির দিকে পরিচালকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৩২ সাল নাগাদ হথর্ণ পরীক্ষা সমাপ্ত হয়। যেখানে প্রায় ২০০০০ কর্মী কোনো না কোনো ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই গবেষণা যে বিষয়টি স্পষ্ট করে তা হল কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তিত পরিবেশ নয়, কর্মীদের মনোভাব তাদের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে। কর্মীগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক এবং কর্মীদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক এবং তত্ত্বাবধায়কদের সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে বলে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। হথর্ণ পরীক্ষা পরিচালন তত্ত্বকে সরলীকৃত ‘অর্থনৈতিক ব্যক্তি’র মডেলের পরিবর্তে মানবিক ও বাস্তবগ্রাহ্য ‘সামাজিক ব্যক্তি’র মডেলের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিবেচনা করা শুরু করে। এলটন মেয়ো উল্লেখ করেন যে পরিচালকগণ যদি ব্যক্তিগত ও বিষয়গত কর্মকৌশল গ্রহণ করে, তাহলে একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হবে, যেখানে ব্যক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

মেরি পার্কার ফলেট তাঁর পরিচালনসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা এবং আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং দর্শনের জ্ঞান ব্যবহার করে এই সত্যে উপনীত হন যে প্রত্যেক কর্মী তার আবেগ, বিশ্বাস, মনোবৃত্তি ও অভ্যাসের একটি জটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান, যা পরিচালকের নজরে থাকা উচিত। ফলেটের মতে, যদি পরিচালক প্রত্যেক কর্মীর কর্মস্পৃহার পেছনে সুপ্ত ইচ্ছাগুলিকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেন, তবে কর্মীকে অতিরিক্ত শ্রম দান করতে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। ১৯৬০-এর দশকে রচিত *The Human Side of Enterprise* নামক রচনায় মার্কিন বিশেষজ্ঞ ডগলাস ম্যাকগ্রেগর মানব প্রকৃতির কয়েকটি আশাব্যঞ্জক ভাবনার ওপরে আলোকপাত করেন। ম্যাকগ্রেগর প্রত্যেক কর্মীকে একজন উৎসাহী ও সৃজনশীল ব্যক্তি হিসেবে অবলোকন করেন, যিনি, তাঁর মতে, সুযোগ পেলে মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। Theory Y হিসেবে ম্যাকগ্রেগর তাঁর এই ভাবনাকে চিহ্নিত করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিচালন কেন্দ্রিক গবেষণায় পরিবর্তন আনে; গবেষণার আয়তন ও যৌক্তিকতায় যে ব্যাপ্তি আসে তা অনবদ্য। সংগঠন সম্বন্ধে পঠনপাঠনে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা ও গবেষণা বিশেষ জায়গা করে নেয়। হারবার্ট সাইমন, জেমস্ জি মার্চ এবং তথাকথিত কার্নেগি ধারার গবেষকরা সাংগঠনিক আচরণবিধির ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা শুরু করেন।

অন্যতম আচরণবাদী তাত্ত্বিক চেষ্টার বার্নার্ড সংগঠনের কার্যকারিতার মাপকাঠি হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপাদানসমূহের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বলেন যে সংগঠনের বাইরে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে ব্যক্তির আচরণ পৃথক হয়। বার্নার্ডের এই ভাবনাসূত্রকে আরো বিকশিত করেন হারবার্ট সাইমন তাঁর *Administrative Behavior* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে।

২.৪ পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা

পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সংগঠনকে একটি সামাজিক অবয়ব হিসেবে অবলোকন করে। মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি আচরণবাদী বিজ্ঞান থেকে রসদ সংগ্রহ করে কর্মীর আচরণ সম্বন্ধে একটি বহুমুখী ও আন্তঃশাস্ত্রীয় গবেষণা এই দৃষ্টিভঙ্গি আচরণবাদী বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কর্মীর ভবিষ্যৎ তথা সম্ভাব্য আচরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তকদের উদ্দেশ্য ছিল। কর্মস্পৃহা, নেতৃত্ব,

যোগাযোগ, গোষ্ঠী আচরণ এবং অংশগ্রহণমূলক পরিচালন সম্বন্ধে আলোচনা এই দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহকদের বিশেষ অবদান এবং কর্মীর কাজের মান বৃদ্ধি ও সংগঠনের লক্ষ্যপূরণের তাগিদে এই সকল নীতিগুলোর ওপর বিশেষভাবে এঁরা আলোকপাত করেন। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিকগণ, যেমন, অ্যাব্রাহাম এইচ ম্যাসলো, ডগলাস ম্যাকগ্রেগর, ফ্রেডরিক হার্জবার্গ, ক্রিস আরগিরিস প্রমুখগণ এই দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বিশেষ অবদানের সাক্ষর রাখেন।

আচরণবাদী বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিম্নরূপে সংক্ষিপ্তসারে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

- প্রত্যেক সংগঠন একটি সামাজিক ও কৌশলগত ব্যবস্থা;
- বহুবিধ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সংগঠনের কর্মীদের নিজেদের ও গোষ্ঠীগত আচরণবিধি গড়ে ওঠে;
- মানবিক চাহিদার সাপেক্ষে সংগঠনের লক্ষ্যগুলো স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক;
- বহুবিধ মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও মুল্যবোধের সমাহারে কর্মীদের আচরণ নির্ধারিত হয়, যা তাদের কাজকে প্রভাবিত করে থাকে;
- সংগঠনের মধ্যে কিছু মাত্রায় সংঘাত অনিবার্য এবং তা মাথায় রেখেই কর্মীর কাজের মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

আচরণবাদী বিজ্ঞান মনে করে যে নেতৃত্বের গুণগত মানের ওপরে পরিচালনের সাফল্য নির্ভর করে। এই বিজ্ঞান গোষ্ঠী সক্রিয়তার ওপর আলোকপাত করে এবং সংগঠনের কার্যকারিতার ওপর ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান ও আচরণের প্রভাবকে স্বীকার করে; ফলে একে মানব সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় উন্নততর বলে মনে করা হয়।

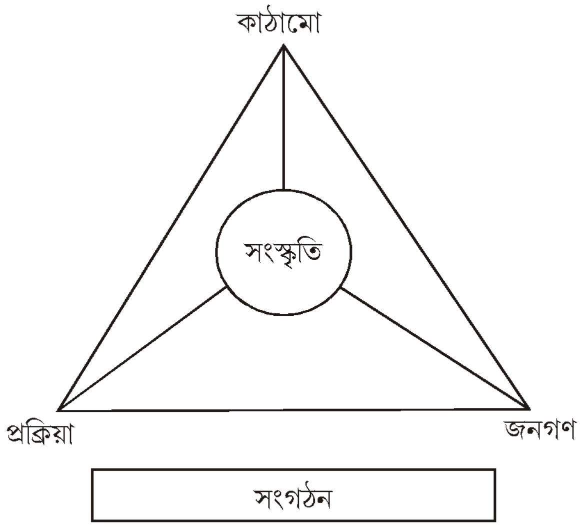

উপরিউক্ত চিত্রটির মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে যে কিভাবে প্রক্রিয়া ও কাঠামোর সাপেক্ষে ব্যক্তির সংস্কৃতি ও আচরণ প্রভাবিত হয়।

২.৪.১ হারবার্ট সাইমন

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং বৈজ্ঞানিক ভাবনার অন্যতম পথিকৃত হারবার্ট সাইমন আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেযভাবে সমৃদ্ধ করেন। বিজ্ঞানের জগতে একটি বিশিষ্ট নাম হারবার্ট সাইমন অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে পরিচালন সাহিত্য, অর্থনীতি, যৌক্তিক মনস্তত্ত্ব এবং কৃত্রিম বৌদ্ধিক রচনায় যথেষ্ট অবদানের সাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি কার্ণেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫২ বছর ব্যাপী অধ্যাপনা করেন। মেরি পার্কার ফলেটের গোষ্ঠী সক্রিয়তা সংক্রান্ত ভাবনা, এলটন মেয়োর মানব সম্পর্ক দৃষ্টিভঙ্গি, চেষ্টার বার্নার্ডের প্রশাসনের কাজ সম্বন্ধে ভাবনা প্রভৃতি তাঁকে বিশেযভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। হারবার্ট সাইমন তাঁর অনবদ্য ধারণা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি গতিশীল পরিবেশে মানব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণাকে ব্যক্ত করেন। এই পণ্ডিত নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত চিন্তাবিদ সংগঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নতুন ধারণা পেশ করেন এবং অর্থনীতিতে এই গবেষণাই তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়।

হারবার্ট সাইমন কর্তৃক রচিত বই *Administrative Behavior* যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে, বিশেষত প্রশাসনিক আচরণবিধির পাশ্চাত্তের মনস্তত্ত্ব, কর্তৃপক্ষের ভূমিকা, দক্ষতার মাপকাঠি, আনুগত্য এবং সংগঠনের পরিচয় ও সংগঠন পুণর্গঠন সম্বন্ধীয় ধারণাগুলো যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সাইমনের 'সীমিত যৌক্তিকতা'র ধারণা, যোগাযোগ এবং কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ধারণা সবিশেষ প্রশংসিত।

বার্নার্ডকে অনুসরণ করে সাইমন প্রশাসন বিজ্ঞানের পাঠ ও আলোচনা করেন। বার্নার্ডের প্রারম্ভিক রচনাগুলোকে কাঠামো হিসেবে ধরে নিয়ে সাইমন আরো প্রাসঙ্গিক ধারণার জন্ম দেন এবং নতুন নামে প্রশাসন বিজ্ঞানে নব নব সংযোজন করেন। সাইমন উপলব্ধি করেন যে মানুষের আচরণ সম্বন্ধে কোনো যথাযথ তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়, যদি না সঠিক বিশ্লেষণ একক গড়ে তোলা যায়। সাইমন তাঁর বইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিকে বিশ্লেষণের একক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তকে নয়। সাইমন তাঁর রচনায় দেখিয়েছেন যে কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সংগঠনকে বোঝা যায়; তিনি আরো উল্লেখ করেন যে সিদ্ধান্তের ভিত্তি বা পূর্বানুমানের ওপর নির্ভর করে প্রশাসনিক আচরণ নির্ধারিত হয়; অতঃপর কিভাবে প্রশাসনিক আচরণ প্রভাবিত হয় সিদ্ধান্তের পূর্বানুমানের দ্বারা বা সিদ্ধান্তের পূর্বানুমান প্রভাবিত হয় প্রশাসনিক আচরণের দ্বারা অথবা কিভাবে সাংগঠনিক কাঠামো সংগঠনের অভ্যন্তরে ব্যক্তির পূর্বানুমানকে প্রভাবিত করে, যাতে ব্যক্তির লক্ষ্য সংগঠনের লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় ইত্যাদির ওপরে প্রশাসনিক আচরণবিধি নির্ভর করে।

সাইমন তাঁর বই *Administrative Behavior : A Study of Decision Making Proceses in Administrative Organisations*-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রশাসনের হৃদয় বলে উল্লেখ করেন। সাইমনের মতে, একটি সংগঠন হল একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামো; অতএব যেকোনো প্রশাসনিক তত্ত্বেরই প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কর্মপ্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করা উচিত। সাইমন আরো উল্লেখ করেন যে বিকল্প কর্মপরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। সাইমন বলেন যে মানুষের পছন্দের পশ্চাতে অবস্থিত যুক্তি ও মনস্তত্ত্ব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। সাইমন মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে—প্রথমে প্রশাসক সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ও সার্বিক পরিবেশের ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; দ্বিতীয় ধাপে প্রশাসক প্রচলিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং বিকল্প কর্মপ্রক্রিয়াগুলো বিবেচনা করতে শুরু করেন এবং তৃতীয় ধাপে সমস্ত যৌক্তিক চিন্তাকে ব্যবহার করে একটি সর্বোত্তম বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাইমন কর্তৃক বর্ণিত সমগ্র সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সরল বলে মনে হলেও

প্রকৃত অর্থে বিষয়টি যথেষ্ট জটিল এবং যুক্তিসিদ্ধ কর্মপ্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে বিকশিত। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সাইমন কর্তৃক প্রস্তাবিত যৌক্তিকতার প্রশ্নটি অনুধাবন করতে হবে।

সাইমন ঘটনা ও মূল্যমানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বলেন যে প্রশাসককে নিজস্ব মুল্যমানকে যথা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন যে প্রত্যেক সিদ্ধান্ত লক্ষ্য নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক আচরণের ভিত্তিতে গৃহীত হয়; প্রশাসক তার যুক্তিবোধকে ব্যবহার করে লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করেন। সাইমনের প্রশাসনিক আচরণ তত্ত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য যখন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন বলা যেতে পারে যে মুল্যমান নির্ভর বিচার বাস্তব ঘটনা নির্ভর বিবেচনা বোধে রূপান্তরিত হয়েছে।

সাইমন যুক্তিবোধের প্রসঙ্গটি পরিবর্তনশীল হিসেবে গণ্য করেছেন এবং মানুষের যৌক্তিক বিচারের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে মানুষের যুক্তিবোধ সংগঠনের পরিবেশের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল, যে পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। সাইমনের মতে, প্রশাসনের কাজ হল সংগঠনের পরিবেশকে এমনভাবে বিকশিত করা, যাতে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি যথাসম্ভব বাস্তবসম্মত হয়ে উঠতে পারে।

সাইমনের ধারণাটিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে :

- অর্থনৈতিক মানুষ
- প্রশাসনিক মানুষ
- সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি

একটি সংগঠনে অভিজ্ঞতাবাদী ও নীতিমানবাচক উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এই উপাদানগুলোকে বাস্তব ঘটনা নির্ভর উপাদান বা মূল্যমান নির্ভর উপাদানও বলা যেতে পারে। বাস্তব ঘটনা নির্ভর উপাদানগুলো উদ্ভুত হয় সংগঠন ও তার পরিবেশ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি ও জ্ঞান থেকে; পক্ষান্তরে মুল্যমান নির্ভর উপাদানগুলো নৈতিক ও আইনী সীমারেখার ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে গড়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আদর্শ ভিত্তিক মডেল ও যুক্তিসিদ্ধ মডেলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা উপযোগী সিদ্ধান্তটিকে বেছে নেওয়াকে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়।

প্রশাসনিক মানুষ মৌলিক যৌক্তিকতার আধারে পরিচালিত হয়ে বিকল্প কর্মধারাটি যথেষ্ট ভাল কিনা বিবেচনা করে। তিনি যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তিগণ সমস্যা সংজ্ঞায়িত করে, বিকল্প সমাধান খুঁজে বার করে ও তার মূল্যায়ন করে এবং শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ঐ সমাধান সূত্রটি প্রয়োগ করে। অর্থনৈতিক মানুষ যখন সমস্ত রকম বিকল্পগুলো বিবেচনা করে সেগুলোর পরিণাম বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায়। প্রশাসনিক মানুষ তখন পক্ষান্তরে কয়েকটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সমালোচনামূলক উপাদানের ওপর নির্ভর করে সরলীকৃত প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। প্রশাসনিক মানুষ প্রচলিত প্রশাসনিক নীতির প্রতি সমালোচনামূলক নজর রেখে বিশেষীকরণ, ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাস, নিয়ন্ত্রণের পরিধি সহ বিভিন্ন নীতিগুলোকে পূর্ণ ভাবনার অবস্থানে নিয়ে আসে।

এ প্রসঙ্গে সাইমন বলেন যে উপরিউক্ত প্রশাসনিক নীতিগুলোর প্রয়োগ যোগ্যতা ও সিদ্ধতা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অনুধাবনপূর্বক পরীক্ষণীয়। সাইমনের মতে, এই প্রবাদস্বরূপ নীতিগুলো পরস্পরের সঙ্গে স্ববিরোধপূর্ণ ও

সঙ্গতিহীন। সাইমন পাঁচটি যান্ত্রিক উপায়কে চিহ্নিত করেন, যা সংগঠনের কার্যশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে, এগুলো হল—

(১) **কর্তৃত্ব :** কর্তৃত্ব হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেই ক্ষমতা, যা কালক্রমে অন্যান্যদের কাজের নির্দেশিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনে উর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মধ্যে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা করা যায়।

(২) **যোগাযোগ :** সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠান বহির্ভূত যোগাযোগ নিয়ে সামগ্রিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

(৩) **প্রশিক্ষণ :** ব্যক্তিরা যাতে প্রতিনিয়ত কর্তৃত্ব ও নির্দেশ ছাড়াই যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রয়োজন। যা শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকুরীকালীন শিক্ষা উভয়কে নিয়ে সংগঠিত হয়।

(৪) **দক্ষতার মাপকাঠি :** একই ব্যয় সম্পন্ন দুটি বিকল্পের মধ্যে যেটি সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে অধিকতর কার্যকরী হবে, সেটিকে বেছে নেওয়া দরকার এবং যদি দু'টি বিকল্পই একইভাবে সংগঠনের লক্ষ্য পূরণ করে, তাহলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে যেটি প্রয়োগযোগ্য সেটিকেই বেছে নেওয়া উচিৎ।

(৫) **সাংগঠনিক পরিচয় ও আনুগত্য :** একটি সংগঠনে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তি থাকে, যারা নিজেদের একটি গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে মনে করে বিকল্পগুলোর মূল্যায়ন করে এবং এই মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর ওপর নির্বাচিত বিকল্পের সম্ভাব্য পরিণাম বিবেচনা করে।

সাইমন সংগঠনকে মানবগোষ্ঠীর যোগাযোগ ও সম্পর্কের একটি জটিল ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সংগঠন তার প্রত্যেক সদস্যের কাছে যথাসম্ভব তথ্য ও অনুমান, লক্ষ্য, মনোভাব ইত্যাদি তুলে ধরে যার ভিত্তিতে প্রতিটি সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামিল হয়। যোগাযোগের সূত্র পরিবর্তনের ফলে যদি বিশ্বাস ও মনোভাব পরিবর্তিত হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরনে পরিবর্তন আসতে পারে। সংগঠন, সাইমনের মতে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, যোগাযোগকে কাঠামোকৃত করে তথ্য সঞ্চালনার পরিবেশকে তা নির্ধারণ করে, যা ক্রমান্বয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে থাকে। সংগঠনে সমন্বয়কে গুরুত্ব দিলেও সাইমন অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন যোগাযোগকে, যা তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহের অন্যতম আধার হিসেবে কাজ করে। সাইমনের মতে, যোগাযোগ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত পূর্বানুমানকে পরিবর্তনে সাহায্য করে, যার ফলে ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও সাংগঠনিক লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাংগঠনিক লক্ষ্যের অভিমুখে যাওয়ার জন্য অনেকগুলো বিকল্পের মধ্যে থেকে একটি সিদ্ধান্ত বেছে নেওয়া হয়। সাংগঠনিক পরিবেশের সাপেক্ষে যে ঘটনা ও মূল্যমান নির্ধারিত হয়, তার ভিত্তিতে বাস্তব পরিণামের কথা বিবেচনা করে বাস্তবগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা ঠিক করে ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করা বা না করা। বাস্তবে কিছু বিকল্প সচেতনভাবে নির্বাচিত হয়, কিছু অসচেতনভাবে নির্বাচিত হয়; কিছু পরিণাম কাঙ্খিত হয়, কিছু আকাঙ্খিত এবং কখনও কখনও উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানাও যায় না। এইসকল সীমাবদ্ধতাগুলো অপরিহার্য হলেও যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যখন বিকল্প নির্বাচিত হয়, তখন সকলপ্রকার সম্ভাব্য পরিণামের কথা বিবেচনা করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে—

(১) সমস্ত বিকল্পগুলোকে চিহ্নিত করা ও তালিকাবদ্ধ করা;

(২) প্রতিটি বিকল্প থেকে উদ্ভুত সম্ভাব্য পরিণামগুলোকে বিবেচনা করা;

(৩) প্রতিটি সম্ভাব্য পরিণামের যথার্থতা ও দক্ষতার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা।

উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষেই উপরিউক্ত তিনটি পর্যায়কে যথাযথভাবে বা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কারণ কোনো অবস্থাতেই সমস্ত বিকল্প বা বিকল্পগুলোর সকল সম্ভাব্য পরিণাম পরিমাপযোগ্য হতে পারে না।

মানুষ যতই যুক্তিবোধসম্পন্ন হোক, সে তার জ্ঞান অনুযায়ী যুক্তি ব্যবহার করে; অতঃপর কাজ চালানোর জন্য কার্যকরী প্রক্রিয়া তাকে গ্রহণ করতে হয়, যাতে উক্ত সমস্যা কাটিয়ে উঠে সে বাস্তবগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। একটি বদ্ধ ব্যবস্থার সাপেক্ষে কয়েকটি সীমিত উপাদানকে বিবেচনা করে সীমিত বিকল্প ও তার সীমিত পরিণামের কথা মাথায় রেখে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সর্বশ্রেষ্ঠ ফলাফল প্রত্যাশা করা যেতে পারে বলে সাইমন মনে করেন, যাকে সাইমন 'সীমিত যৌক্তিকতা' বলে উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞান ও যৌক্তিকতার সীমিত বোধশক্তি ব্যবহার করে যুক্তিসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় যে বিকল্প নির্বাচন করা হয়, সেই প্রক্রিয়াকে সাইমন **'Bounded rationality'** বলে উল্লেখ করেছেন। আচরণবাদী অর্থনৈতিক চিন্তায় **'Bounded rationality'** বা সীমিত যৌক্তিকতার ভাবনা কেন্দ্রীয় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত, যা বাস্তব সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

সাইমনের মতে, সংগঠনের অভ্যন্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রশাসনিক সংগঠন এবং অর্থনীতির প্রেক্ষিতে সীমিত সংখ্যক পরিস্থিতির বিবেচনা সাপেক্ষে যুক্তিবোধকে যথাসম্ভব ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যপক ও জটিল কার্যটি সমাপন করতে হয় বলে সাইমন উল্লেখ করেছেন। সিদ্ধান্ত গ্রহীতা পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যা সরলীকৃত বলে মনে হতে পারে। যুক্তিবোধকে সাইমন সীমিত বলে উল্লেখ করেছেন; উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে সীমিত পরিমাণে প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির ওপরে নির্ভর করে সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তৃপ্তিদায়ক, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে। সাইমন মানুষের যুক্তিবোধের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি কারণ দর্শান—

- অপর্যাপ্ত বা ত্রুটিপূর্ণ বা বিপথদর্শী তথ্য;
- জটিল সমস্যাদি;
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মানবিক সীমাবদ্ধতা;
- সিদ্ধান্তগ্রহণে ব্যয়িত সময়ের অপর্যাপ্ততা;
- কিছু সাংগঠনিক লক্ষ্য প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের মধ্যে বিরোধ।

সংগঠন নিজেই সীমানা হিসেবে কাজ করে, যা তার সদস্যদের বাধ্য করে প্রত্যেক কাজের জন্য পুনর্ভাবনার অবকাশ না দিয়ে কাজ করতে। ব্যক্তির কাছে তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য অনিশ্চয়তা তৈরী হয়, যা তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসে। সাইমন, এই কারণে বলেন যে, সমস্যার জটিলতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার দ্বিবিধ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের সংখ্যা বিবেচনা করে আচরণবাদী সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপরেই নির্ভর করতে হয়, যা নিছক যুক্তি সিদ্ধতা নির্ভর নয়। সাইমনের প্রশাসনিক তত্ত্বের কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তুই হল মানুষের যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সামাজিক আচরণের মধ্যে সীমারেখা অঙ্কনের প্রয়াস। সাইমনের সীমিত যৌক্তিকতার ধারণা অনুযায়ী জটিল সমস্যা সৃষ্টি ও তার সমাধানে মানুষের ক্ষমতার সীমা স্পষ্ট; অতঃপর সর্বাধিক তৃপ্তিদায়ক (satisficing) বা যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক সমাধানসূত্রের কথা ভেবেই বিকল্প নির্ধারণ করতে হয়। সীমিত যৌক্তিকতার এই নীতিটি গড়ে তুলতে সাইমন মনস্তত্ত্ব; অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন এবং সমাজতত্ত্বের দ্বারস্থ হয়েছেন, যা সাইমনের তত্ত্বকে আন্তঃশাস্ত্রীয় করে তুলেছে।

২.৫ উপসংহার

আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একটি সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদান বা যৌক্তিক সত্তাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক, মিথস্ক্রিয়া, যোগাযোগ, সংযোগ এবং সম্পর্কযুক্ত কৌশল বা সক্রিয়তাকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যাদি এবং গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করলে এবং সামাজিক সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করলে কর্মীর কর্মস্পৃহা ও উৎপাদনশীলতা নির্ধারণকারী উপাদানগুলোকে সহজে বোধগম্য করা যাবে।

সাংগঠনিক উন্নয়নের কাজে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করে কার্যকরী পরিবর্তনের সোপান প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। আচরণবাদ বিজ্ঞানসম্মত পঠনপাঠন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাংগঠনিক উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং কর্মস্পৃহার তত্ত্ব ইত্যাদি থেকে রসদ সংগ্রহ করে সংগঠনের কার্যকরী উন্নয়নকেও যেমন আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ত্বরান্বিত করে। তেমনি কর্মীর উন্নয়নকেও বাস্তবায়িত করে।

সাইমনের গ্রন্থ প্রশাসন বিজ্ঞানের এমন একটি সহায়িকা যা আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাংগঠনিক সমস্যাদি বিশ্লেষণ করতে উদ্যত হয়। যুক্তিসিদ্ধ মানবিক পছন্দ তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আচরণবাদীও বোধশক্তিসম্পন্ন প্রক্রিয়া নির্ণয় এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। *Administrative Behavior* নামক গ্রন্থটি মানুষের আচরণ, বোধশক্তি, পরিচালন কৌশল, কর্মীব্যবস্থাপনার নীতি, প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও পদ্ধতি, বিশেষজ্ঞ ভূমিকা, যথার্থতা ও দক্ষতা নির্ণয়ের মাপকাঠি ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ওপরে আলোকপাত করে। সাইমন তাঁর বইতে যে আলোচনা করেছেন তা হল, উক্ত বিষয়গুলো কিভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণকে প্রভাবিত করে।

২.৬ সারাংশ

বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে রসদ গ্রহণ করে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তার মুখ্য লক্ষ্য ছিল কর্মক্ষেত্রের আচরণ অনুধাবন। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা হলেন হারবার্ট সাইমন। যিনি প্রত্যেক কর্মীর আচরণকে সংগঠনের লক্ষ্য ও মূল্যমানের সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। ল্যাসওয়েলকে অনুসরণ করে সাইমন বলেন যে একজন ব্যক্তি নিজেকে অনেক প্রকার সামাজিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, জাতিগত, ধর্মীয়, পারিবারিক, শিক্ষাগত, লিঙ্গগত, রাজনৈতিক এবং ক্রীড়া গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করে। মৌলিক সমস্যা হল ব্যক্তি কিভাবে সংগঠনের সাপেক্ষে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয়কে স্বতন্ত্র করবে। এই কারণে প্রত্যেক সংগঠনকে তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উপায়, পরিণাম এবং মূল্যমানকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাইমনের অবদান অনস্বীকার্য এবং তাঁর গবেষণালব্ধ ফল ব্যবসায়িক গোষ্ঠীতে অপরিহার্য।

২.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যালোচনা করুন।

(২) পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করুন।

(৩) পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে হারবার্ট সাইমনের অবদান পর্যালোচনা করুন।

(৪) হারবার্ট সাইমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেল সম্বন্ধে একটি সমালোচনামূলক টীকা রচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) 'সীমিত যৌক্তিকতা' বলতে সাইমন কী বুঝিয়েছেন?

(২) 'সাইমনের মতে, সংগঠনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি জটিল প্রক্রিয়া'—ব্যাখ্যা করুন।

(৩) সংগঠনে যোগাযোগের ভূমিকা সম্বন্ধে সাইমনের মতামত কী?

(৪) সংগঠনের কার্যশীলতাকে কি কি বিষয় প্রভাবিত করতে পারে বলে সাইমন মনে করেছেন?

(৫) আধুনিক পরিচালনের ধারণার আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাসঙ্গিকতা সমালোচনা সহযোগে মূল্যায়ণ করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) পরিচালনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রস্তাবনাগুলো বিশ্লেষণ করুন।

(২) মানবিক সম্পর্ক ও আচরণবাদী তত্ত্ব যে সাধারণ বিষয়ে আলোকপাত করে তেমন চারটি বিষয় উল্লেখ করুন।

(৩) টীকা লিখুন : "প্রশাসনিক মানুষ", "অর্থনৈতিক মানুষ"।

(৪) সাইমনের মতানুসারে সংগঠনের কার্যশীলতাকে প্রভাবিত করে এমন যান্ত্রিক উপায়গুলি লিখুন।

২.৮ তথ্যসূত্র

Bennis, Warren G., *Changing Organizations*, New York, McGraw-Hill, 1966.

Filley, Alan C., and Robert J. House, *Managerial Process and Organizational Behavior*, Scott, Foresman and Company, 1969.

March, James G., and Herbert A Simon .. *Organizations.* New York: Wiley. 1958

Simon, H. A, *Administrative Behavior: A Study of Decision Making Processes in Administrative Organisation*, 2nd ed., New York: Collier/Macmillan, 1957.

Simon, Herbert, *Administrative Behavior* (3rd ed.), New York: The Free Press,1976.

Simon, Herbert A. "A Behavioral Model of Rational Choice." *Quarterly Journal of Economics* 69: 1955,99-118.

২.৯ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

চক্রবর্তী, দেবাশীষ, *গণপরিচালন*।

একক-৩ ❑ উন্নয়ন প্রশাসন—এফ. রিগ্‌স

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ উন্নয়ন প্রশাসনের ভূমিকা
৩.৩ উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ
৩.৪ উন্নয়ন প্রশাসনের উৎস
৩.৫ উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা
  ৩.৫.১ এফ. রিগ্‌স
৩.৬ শেষ টীকা
৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী
৩.৮ নির্বাচিত পাঠ

৩.১ উদ্দেশ্য

এই পাঠের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ ব্যাখ্যা করা।
- ঐতিহ্যবাহী এবং উন্নয়ন প্রশাসনের পার্থক্য নিরূপণ করা।
- উন্নয়ন প্রশাসনের বিবর্তন অনুসন্ধান করে বার করা।
- এর বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আলোকপাত করা।

৩.২ উন্নয়ন প্রশাসনের ভূমিকা

কার্যকারিতা ও মূল বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক তত্ত্বের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি নিয়ম ও ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাসের প্রতি কঠোর আনুগত্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ। উন্নয়ন প্রশাসন নীতি এবং কর্মসূচিগত ধারণা, প্রশাসনিক মূল্য এবং পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে, যেগুলি একটি জাতির উন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজের আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক উন্নয়নের দিকেও দৃষ্টি নিবন্ধ করে এবং খুঁজে বের করে দক্ষ আমলাদের। উন্নয়ন প্রশাসনের এই পরিকল্পনায় আমলাতন্ত্র সরকারের একটি হাতিয়ার, যেটি তৃণমূল স্তরে সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকে। এই কাজ করতে গিয়ে তারা ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত থাকে এবং এই কাজের ক্ষেত্রে তারা উদ্ভাবনমূলক দৃষ্টি নিয়ে এগোতে থাকেন। বিশেষত একটি জাতি যখন উন্নতির দিকে যায় তখন আমলাতন্ত্রকে এই দায়বদ্ধতা নিতে দেখা যায়। উন্নয়ন প্রশাসন বর্তমান অবস্থা বাতিল করে দেয় এবং পরিবর্তনের নতুন দিক

নির্দেশ করে যা আরও বেশি ফল ও লক্ষ্য অভিমুখি হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সচলতা রয়েছে এবং নতুনকে অনুপ্রেরণা দিতে থাকে। এটি লক্ষ্য পূরণের উপযুক্ত পন্থা খুঁজে পেতে চায়। পাশাপাশি এটি মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের জন্য পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করে থাকে। এটি মানুষকেন্দ্রিক, সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষমতায়ন কেন্দ্রিক, উৎপাদন বা লাভকেন্দ্রিক নয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের নির্যাস হল সুসংহতভাবে পরিবর্তন আনা এবং সুনির্দিষ্টভাবে সরকারি কাজ সম্পন্ন করা। সাম্প্রতিক অতীতে অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে এবং গুরুত্ব দিয়েছে উন্নয়নের ওপর যেখানে জন অংশগ্রহণ এবং পরিকল্পিত পরিবর্তন প্রাধান্য পাচ্ছে। সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের বৃদ্ধির ফলে ঐতিহ্যবাদী প্রশাসনিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলিকে সামনে এনেছে। সরকার তার ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গঠন ও আচরণের পরিবর্তন আনতে তৎপর, কেননা প্রতিষ্ঠানের এবং সরকারের বিভিন্ন অংশের এই পরিবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। এইভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ, বৈশিষ্ট্য এবং উৎসের অধ্যায়নের মাধ্যমে বিষয়টির ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়।

৩.৩ উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ

Riggs-এর মতে উন্নয়ন প্রশাসন হল, প্রশাসনিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পদ্ধতিগুলির ব্যবহার—যা ব্যাপকভাবে সংগঠনের দ্বারা করা হয়ে থাকে। সরকার নীতিগুলিকে কার্যকরী করে এবং পরিকল্পনা রচনা করে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। এ সম্পর্কে বলা যায়, এটি কার্য, লক্ষ্য, পরিবর্তন অভিমুখী প্রচেষ্টা যা পরিকল্পনা নীতি ও কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব দেয়। জাতি গঠন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আমলাদের বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছানোই এর মুল উদ্দেশ্য। উন্নয়ন প্রশাসনে মানুষের জন্য পরিকল্পনা বা Planning for people-র চেয়ে মানুষের সঙ্গে পরিকল্পনা বা Planning with people-কে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। এটি অবশ্যই উৎপাদন কেন্দ্রিকতার থেকে অনেক বেশি মানুষকেন্দ্রিক। এটি সর্বোচ্চ উৎপাদন এবং পরিসেবার কথা বলে না কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তথাপিও উন্নয়ন প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের ওপর আলোকপাত করে এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করা হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকারের অবিচ্ছেদ্য কাজ ও লক্ষ্য হল উন্নয়ন। এই সকল রাষ্ট্রে মানব ও বস্তু সম্পদের প্রবল অভাব রয়েছে। এখনে ধরে নেওয়া হয় যে উন্নয়নের সবচেয়ে উপযোগী উপায় বা নতুন কোন উপায় challenge-এর সম্মুখীন হবে। তাহলেও উন্নয়ন প্রশাসন উন্নয়নের উপায়ের কথা বলে যা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সরকারের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন করতে পারে। Weidner প্রথম উন্নয়ন প্রশাসনের বর্ণনা করেন। Riggs, Heady, Montgomary, Gant, Pai Panandikar প্রমুখ নিজস্ব পদ্ধতিতে এর ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন। যাইহোক উন্নয়ন প্রশাসনের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এবং অর্থ হল এই যে, এটি হল একটি প্রচেষ্টা যা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি কেবল প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই নয়, নীতি তৈরির সঙ্গেও সম্পর্কিত। যেটি উন্নয়ন—অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-সাংস্কৃতিক সমরুপ পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। রাষ্ট্র তার প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে। এইভাবে উন্নয়ন প্রশাসন কার্য অভিমুখী হয়ে থাকে এবং প্রশাসন কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়ে উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সহজ উপায়ে কার্যকরী করে।

৩.৪ উন্নয়ন প্রশাসনের উৎস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি, যারা উপনিবেশিক শোষণ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল, সেই দেশগুলি দ্রুত রাষ্ট্র ও সমাজ পুনর্গঠনে জটিলতার সম্মুখীন হয়। এই সমস্ত নতুন রাষ্ট্রগুলির সামনে উন্নয়নের প্রশ্নে একাধিক চ্যালেঞ্জ আসে। এগুলি হল—দারিদ্র, অশিক্ষা, রোগ, কৃষির ক্ষেত্রে কম উৎপাদন এবং শিল্পজাত উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা প্রচলিত ছিল। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা রাষ্ট্র প্রণীত উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল তা ঔপনিবেশিতাবাদের পরবর্তী কালে সূচিত হয়।

ঔপনিবেশিক বৈদেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্ত হবার পর এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির দেশীয় জনগণ বিভিন্ন সমস্যা যেমন কর্মহীনতা, দারিদ্র, অব্যবস্থা, অনাহার এবং রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এই সমস্ত রাষ্ট্রে সম্পদ ও মানব সম্পদের অভাব ছিল এবং কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতি ছিল যৎসামান্য। এছাড়াও এ সকল রাষ্ট্রগুলির ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলিও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না। এই কারণে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির সরকার সর্বাত্মক ও সমজাতীয় পরিকল্পনার দ্বারা সুসংহত উন্নয়নের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। রাষ্ট্রীয় রূপকারদের লক্ষ্য ছিল শিল্পায়ন, স্বনির্ভরতা, সামাজিক ন্যায় এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে উপলব্ধি করা হয়েছিল যে উন্নয়নের পাশ্চাত্য পদ্ধতি ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যে উন্নয়নের একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কারণ তাদের শক্তিশালী আমলাতন্ত্র, তাদের সমস্যা ও পৃথক প্রকৃতি এবং তাদের সম্পদও প্রচুর। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান এক না হওয়ায় পশ্চিমী উন্নয়নের মডেল এক্ষেত্রে সহায়ক নয়। এই কারণে এ কথা ভাবা হয়েছিল যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিকল্প প্রশাসনিক ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই মডেল দেখা দিয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠা করেছিল পরিবেশ ও প্রশাসনের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক। উন্নয়নকে দেখা হয় সামগ্রিকভাবে। যেমন শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি, সামাজিক সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন। এই ভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের একটি নতুন ধারণার আবির্ভাব হয় যেখানে জনগণের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। এবং পরিকল্পিত পরিবর্তনকে সমর্থন করা হয়। রুজভেল্টের সময় মার্শাল পরিকল্পনার এবং নিউ ডিল কর্মসূচির মধ্যে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রশাসনের উপর প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পরিবর্তনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও প্রয়োগ করে। এই উপলব্ধি উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণার জন্ম দেয়। সমতা ও ন্যায় বিচারের দাবি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে নতুন করে উৎসাহ যোগিয়েছে। সেজন্য উন্নয়ন বলতে একটি সার্বিক শব্দ বোঝাতে যা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অর্থকে ইঙ্গিত করত। এইভাবে এটি ছিল এমন একটি প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নই ছিল না বরং সার্বিক জনকল্যাণের পথও উন্মুক্ত করেছিল। এর ফলে উন্নয়নের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং উন্নয়ন আনার জন্য প্রক্রিয়াগুলির পিছনের চিন্তা ধারাও

পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের জন্য তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া উচিত। এইভাবে উন্নত দেশগুলির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে সকল মানুষের সহযোগিতায় উন্নয়ন প্রক্রিয়া সাধিত হওয়া উচিত। সুতরাং পরিকাঠামো শিল্পোন্নয়ন শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের অভাবকে এই পরিস্থিতিতে কেবল মাত্র আংশিক ভাবে দায়ী করা যায়। সে জন্য রাজনীতিবিদ্‌, প্রশাসক, গবেষকরা ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন যে জনপ্রশাসনের সমস্যাগুলিকে ভিন্ন ভাবে আলোকপাত করতে হবে। তারা জনপ্রশাসন বিষয়ক একটি নতুন ধারণা, উন্নয়ন প্রশাসনের জন্ম দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে কঠোরনীতি থেকে উদরনীতি বা আইনী কঠোর প্রশাসনিক নীতি জারি রাখার বদলে সাধারণ সুবিধাগুলি, সার্বিক জনকল্যাণকর নীতিগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক উৎসাহের উপর গুরুত্ব দেওয়া, যার ফলে সরাসরি উন্নয়ন ও পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা যাবে। এইভাবে জনপ্রশাসনের বিশ্লেষণে উন্নয়ন একটি অন্যতম বিষয় হয়ে উঠল। এডওয়ার্ড ওডেনারের মতে (যিনি ছিলেন এই তত্ত্বের জন্মদাতা), ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ভূমিকা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে এক সাথে সম্পৃক্ত করে, উন্নয়নের সর্বোচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়াই এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য। রমেশ কে. অরোরা সহমত পোষণ করে বলেছেন যে এই তত্ত্ব তৈরি হয়েছে এটি বুঝতে যে, কীভাবে জনপ্রশাসন বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে পরিবর্তন করে সামাজিক উদ্দেশ্যগুলিকে সাধিত করতে পারে।

এইভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের মূল গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আধুনিকতাকে উন্নীত করার প্রতি। সরকারী কাজের উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র, সুরক্ষা ও শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে সনাতন প্রান্তিক অঞ্চলগুলিকে সরকারী আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে আনা। উন্নয়ন প্রশাসনের তত্ত্বটি প্রচলিত হয়ে উঠেছিল কেননা এটি শান্তি প্রক্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে, উন্নয়নের বিভিন্ন দায়িত্বগুলোর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল, বিশেষ করে মানব উন্নয়ন ও বৃদ্ধির উপরে। এই পরিবর্তন স্থির করে দেয় যে প্রশাসন মূলত পরিবর্তনশীল এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের স্বার্থে সাহায্য করে। ক্যাডিন শব্দটিতে নিহিত আছে উন্নয়ন হল কাঙ্ক্ষিত, যে পরিকল্পিতভাবে প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারণাকে গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে অসাম্য এবং সামাজিক উৎপাদনের পরিমাণের ক্ষেত্রে যে বাধা তা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল বড় বাধা তা সমাধান করা যাবে। কারণ মানুষের কাছে অবশ্যম্ভাবী এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রশাসন এই ধরনের বাস্তবতার সাথে যুক্ত মানুষের সমস্যার বাস্তব সমাধানের সাথে যুক্ত আছে। মানুষের বাস্তব জগতের বিকশিত উদ্দেশ্য নিহিত আছে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণায়। যেটি গুণগত ও পরিমাণগত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণের সাথে পরিচয় ঘটায়।

একচেটিয়া ভাবে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির জন্য। ঔপনিবেশিকতাবাদের পরে উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের পদ্ধতি রূপান্তরের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়েছে। ব্যাপকভাবে বলা যায় যে উন্নয়ন প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে দুধরনের মতবাদ আছে। এক ধরনের মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন লুসিয়ান পাই, ফ্রেড রিগস্‌ এবং ওয়াইডনার। এরা উন্নয়ন প্রশাসন শব্দটিকে ব্যপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই মতানুসারে কোনো সংগঠন কীভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে সে বিষয়ে উন্নয়ন প্রশাসন সহায়তা করে। এই ধারণা অনুসারে মনে করা

হয় যে রাষ্ট্র গঠনের সমগ্র পদ্ধতি উন্নয়ন প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত। এই মতবাদ অনুসারে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির জনপ্রশাসনের অধ্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি একটি সুসঙ্গবদ্ধ রূপ পেয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে উন্নয়ন প্রশাসন একটি অতি প্রয়োজনীয় ধারণা। প্রশাসনের ক্ষেত্রে এটি যতটা না কাঠামো মূলক, তার থেকে অনেক বেশি ক্রিয়ামূলক। যখন এটি সনাতন এবং নিয়ম মাফিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন প্রশাসনের গতিশীলতার উপর জোর দেয়। যেখানে পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ক্ষমতার একটি হাতিয়ার হিসেবে এই দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করে। উন্নয়ন প্রশাসন নতুন সংস্থাগুলির সংগঠন অথবা প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করে। অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বমূলক কাঠামো এবং ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে—একথাও পৃথকভাবে বলা যায়।

উন্নয়ন প্রশাসনের কর্মসূচি বা উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে জড়িত এমন সব চিন্তা বা প্রকল্পকে বোঝায় যা সংগঠিত প্রচেষ্টার ফল। এটি এমন একটি পর্যায় যেটি নিজ নিজ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সংগঠিত প্রচেষ্টা। উন্নয়ন প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি হল কৃষি, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণ যা প্রশাসনের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে শব্দার্থিক অর্থে উন্নয়ন পরিচিত কর্মসূচি প্রকাশে বিশেষ অধরা অর্থ বহন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়ন বলতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এখানে উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, মূলধন ও ভোক্তাদের পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি—এই অর্থে বোঝানো হয়। উন্নয়নের অপরিহার্য ধারণা হল মানুষের এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের রূপদানকারী মানব সমাজের উপর গুরুত্ব দান। অন্যভাবে বলা যায় উন্নয়নের জন্য সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত, যা সামাজিক কর্মের জন্য প্রস্তাব প্রণয়ন এবং সহমতের ভিত্তিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে শেখায়।

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে বলা যায় উন্নয়ন প্রশাসনের সংজ্ঞা ও সুযোগ সংক্রান্ত আলোচনার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। লুসিয়ান পাই (Lucian Pye) ফ্রেড রিগস্ (Fred Riggs) এবং অয়েডনার (Weidner) দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টিভঙ্গী বোঝায়, যেখানে একটি বৃহত্তর অর্থে উন্নয়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রশাসন বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের পথ নির্দেশ প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা কর্তৃত্বমূলক ভাবে একটি পদ্ধতির সাহায্যে বা অন্য নির্ধারিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে মহৎ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। এই অর্থে বলা যায় উন্নয়ন প্রশাসনকে বিশেষ করে বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জাতি গঠনমূলক সমগ্র প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা। এই সংজ্ঞা উন্নয়ন প্রশাসন, জনপ্রশাসনের অধ্যায়নের জন্য একটি সমন্বিত ধারণা হয়ে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটি উন্নয়ন প্রশাসন যা ভিত্তির কাঠামোর চেয়ে ভিত্তির কর্মের উপর গুরুত্ব দেয়। এটি প্রশাসনের একটি ঐতিহ্যগত এবং নিয়মমাফিক চর্চা, যা পরিকল্পনার কার্যকর করার একটি দলিল হিসেবে তার ক্ষমতা বিচার করে। উন্নয়ন প্রশাসনের আলোচনায় উন্নয়ন প্রশাসন ও প্রশাসনের ধারণার মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেওয়া দরকার। পাশাপাশি উভয়রূপ ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টাও জানা দরকার।

উন্নয়ন প্রশাসনের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য হল

১। পরিকল্পনার সকল স্তরে নতুনত্ব।

২। তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের উপর গুরুত্বদান।

৩। একটি সম্পদ হিসেবে মানব সম্পদের উন্নয়ন।

সমাজে দ্রুত পরিবর্তন স্থাপন এবং ন্যায় ও স্বতন্ত্র সামাজিক শৃঙ্খলা আনার জন্য রাজনীতি ও প্রশাসনকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষতাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রশাসকদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতে হবে। কার্যকর উন্নয়ন প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রশাসনের উপর দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে চাপ বজায় রাখা। এখানে ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি প্রশাসনিক সংগঠন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন করতে সক্ষম, যা ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতির চেয়ে অনেকটাই পৃথক। এটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। যার মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে।

গণ-প্রশাসনিক উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত সার

১। ক্ষমতা তৈরির জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত

২। দক্ষতা এবং বিশেষায়িত উন্নয়ন প্রশাসনিক কর্মীদের জটিল সমস্যার মোকাবিলা করা।

৩। গুরুত্ব সহাকারে প্রশিক্ষণ নেওয়া।

৪। প্রযুক্তির কার্যকরী ব্যবহার এবং প্রশাসনিক পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনা।

৫। ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

৬। দুর্নীতির অপসারণ এবং আরো স্বচ্ছতা আনয়ন।

৭। উন্নয়ন উদ্যোগে প্রচারের জন্য আমলাদের উপর গুরুত্ব দান।

উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একটি সঠিক পরিকল্পনার রূপায়ণ জরুরী। এক্ষেত্রে সম্পদ, দক্ষ কর্মীদের সর্বোত্তম ব্যবহার প্রযুক্তির উপর গুরুত্বদান এবং কর্মচারীদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন। এই সময় আমলাতন্ত্রের হাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন, যা অবশ্যই বিকেন্দ্রীভূত হবে। প্রশাসনিক উন্নয়ন এবং উন্নয়ন প্রশাসন উভয়ই সমাজে কাজ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নয়নের জন্য একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বলে মনে করা হয়। উন্নয়ন প্রশাসনকে অবশ্যই ঐতিহ্যগত প্রশাসনিক ধারণা থেকে পৃথক করা প্রয়োজন।

১। ঐতিহ্যগত প্রশাসনে দৃশ্যত হয়েছে সরকারি ক্রিয়ার আইনি প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার, যেগুলি নিয়ম ও শৃঙ্খলতার দ্বারা পরিচালিত। ঐতিহ্যগত প্রশাসন আইন ও নির্দেশের রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। রাজস্ব সংগ্রহ ও জাতীর জীবনের বিধিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেগুলি বিধিবদ্ধ রয়েছে। নতুন উদ্ভুত রাষ্ট্রগুলির জন্য প্রশাসনের পরিবর্তনের প্রয়োজন সেগুলি আইন ও মূল্যের নির্দেশে থেকে উন্নয়নের মূল্যে রূপান্তরিত হবে। উন্নয়ন প্রশাসনের গুণগত লক্ষ্য হল মানুষের সমর্থিত, মানুষের জন্য পরিকল্পনা যেটি ঐতিহ্যগত প্রশাসনের সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে পৃথক করে। ঐতিহগ্যগত প্রশাসন গুণগত লক্ষ্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এবং নিয়মের কার্যকারীর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।

২। উন্নয়ন প্রশাসন সম্পর্কে আরো বলা যায় এটি কোন আবদ্ধ ব্যবস্থা নয়, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এটি একটি মুক্ত ব্যবস্থা। উন্নয়ন প্রশাসনের অধীনে থাকা স্থানীয় প্রশাসনের এককগুলি কেন্দ্রীয় কাঠামো থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩। যদিও সেখানে সব ধরনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কারিগরী ও আচরণগত প্রণালী একই ধরনের উন্নয়ন প্রশাসনের ক্ষেত্রেও বাহ্যিক সম্পর্ক অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।

৪। ঐতিহ্যগত প্রশাসনের বিপরীত উন্নয়ন প্রশাসন, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতির পরিবর্তে প্রণালী এবং গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।

উভয় ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আইনশৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণ হল প্রাথমিক কাজ। কিন্তু উন্নয়ন প্রশাসন সামাজিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য নিজেকে একটি লক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না।

৩.৫ উন্নয়ন প্রশাসনের ধারণা

উন্নয়ন প্রশাসনে নির্দিষ্ট রয়েছে—

১। **পরিবর্তন অভিমুখী :** উন্নয়ন প্রশাসনের প্রথম ও প্রধান উপাদান হল তার পরিবর্তনশীলতা। উন্নয়ন প্রশাসনের দার্শনিক মূল্যের অংশ হিসাবে পরিবর্তনের স্থান রয়েছে। এখানে শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে বৃদ্ধি এবং বণ্টনমূলক ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে। পাই পানান্দিকর উল্লেখ করেছেন যে উন্নয়ন প্রশাসনের কেন্দ্রীয় বিষয় হল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন। উন্নয়ন প্রশাসনবদ্ধ হতে পারে না। এটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির ইতিবাচক পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসনের গঠনগত পরিবর্তন এমনভাবে হয় যার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য দুর করা যায়। এই নতুন পরিকল্পনায় কর্মী ও নিয়োগকর্তার মধ্যে সম্পর্কের উচিত ঘটে না উন্নয়ন প্রশাসনের আবশ্যিক অংশ।

২। **লক্ষ্যাভিমুখী :** উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি দরিদ্র, সম্পদের অসম বণ্টন, কৃষির অনুন্নতি, প্রযুক্তিগত অভাবের মতো সমস্যার সম্মুখীন। সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যের মাধ্যমে এই সকল বহু বিবিধ বিষয়গুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সমাধান করা উচিত। উন্নয়ন প্রশাসনে উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল সামাজিক ন্যায়বিচার, আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত করা।

৩। **উদ্ভাবনী প্রশাসন :** উন্নয়ন প্রশাসন বিদ্যমান শাসন কাঠামোর আকৃতির ওপর দৃষ্টিনিবন্ধ করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে নিয়মের পরিবর্তন করে। অন্য অর্থে উন্নয়ন প্রশাসন হল চলমান ও প্রগতিশীল ভাবনা ও ক্রিয়া। এটি নয়া কাঠামো, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, কৌশল, নীতি, পরিকল্পিত প্রকল্প এবং কর্মসূচি নির্ধারণে উৎসাহী। উন্নয়ন প্রশাসন পূর্ব নির্ধারিত উন্নয়ন উদ্ভাবনী ক্ষমতায় বিশ্বাসী। IRDP, TRYSEM, NREP, DWACRA, উপজাতি উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি হল ভারতের সাবেকি উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ। এই উদ্ভাবনী কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য দুর করা এবং কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা। কয়েকটি উন্নয়ন সংস্থা যেমন—জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, জেলা পরিকল্পনা শাখা, রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড, সমবায় প্রভৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় প্রশাসনকে মানুষের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দায়বদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছে যার মাধ্যমে একটি ভাল প্রশাসনের ধারণা তৈরি করা যায়।

৪। **উপভোক্তা কেন্দ্রিক প্রশাসন :** উন্নয়ন প্রশাসনের নির্দিষ্ট অভিমুখটি হল—যারা প্রান্তিক কৃষক, ভুমিহীন

শ্রমিক এবং গ্রামীণ ভারতীয়, তাদের চাহিদা পূরণ করা। উন্নয়ন প্রশাসকদের দ্বারা এই শ্রেণির মানুষদের আর্থ-সামাজিক এবং আর্থ-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটাবে যা তাদের কাছে আবশ্যিক। একাধিক নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা লাভবান গোষ্ঠীকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে যারা এই প্রান্তিক মানুষদের বিভিন্ন সহায়তা করে থাকে। এটি পরামর্শ দেয় যে উন্নয়ন প্রশাসন হল মানবকেন্দ্রিক যা তাদের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। প্রয়োজনে কর্মসূচীর পরিবর্তন আনে, নীতির পরিবর্তন ঘটায় যা এই শ্রেণির মানুষের জন্য আবশ্যক। এই ধরণের প্রশাসন অবশ্যই দুর্বল ও অবহেলিত মানুষের উন্নতির সাথে যুক্ত থাকবে।

৫। **অংশগ্রহণ কেন্দ্রিক প্রশাসন :** উন্নয়ন প্রশাসন সহযোগিতার নীতি এবং অংশগ্রহণমুলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে থাকে। এখানে সাধারণ মানুষকে পার্শ্বগ্রাহক হিসাবে বিবেচনা করলে চলবে না। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সক্রিয় ভুমিকা থাকা জরুরী। এটি স্বীকৃতি দেয় যে কেন্দ্রীভূত প্রশাসন, বাস্তবে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে না, যদি না স্থানীয় সম্পদ, শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। অর্থাৎ, কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ স্থানীয় মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় করা সম্ভব হয়। এটি সরকারের উন্নয়ন বিষয়ক শাসন এবং ব্যবস্থাপনায় মানুষের অংশগ্রহণ করার সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতে এই ধরনের উন্নয়ন কৌশল হিসাবে পঞ্চায়েতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬। **কার্যকর সমন্বয় :** উন্নয়ন প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলি গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা নিয়ে থাকে, যাদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এরা অনেক বেশি বিশেষজ্ঞতার সহিত তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এই ধরনের ব্যবস্থায় সর্বাধিক লাভের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন এককগুলির সঙ্গে সমন্বয় থাকা বিশেষ জরুরি। সর্বাধিক ফল পাওয়ার জন্য সময় এবং সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে হবে। উন্নয়ন প্রশাসন বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাগুলিকে একত্রিত করে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা করে। এই কাজের মাধ্যমে প্রশাসনকে সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে, তাছাড়া অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এটা অবশ্যই প্রশাসনিক দুর্বলতাকে সঙ্কুচিত করে।

৭। **পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ :** উন্নয়ন প্রশাসন পরিবেশ, রাজনীতি, সমাজ এবং অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয় বা প্রভাবিত করে। এটি কোন আবদ্ধ ব্যবস্থা নয়। যেটি সমাজ ব্যবস্থা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে এবং দাবির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেয়। উন্নয়ন প্রশাসন পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং প্রশাসন এবং পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে বোঝাপড়া রয়েছে। পরিবেশ উন্নয়ন প্রশাসনের সূচকের ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এটি বেশ সংবেদনশীল এবং নমনীয়। প্রশাসনিক পরিবর্তন পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে আবার পরিবেশের পরিবর্তন প্রশাসনকে প্রভাবিত করে।

উন্নয়ন প্রশাসন সরকারের মাধ্যমে কেবল শারীরিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিগত পরিবেশের পুনঃ কাঠামো রচনা করে না, সরকারের লড়াই করার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। উন্নয়নের দৃষ্টি কোন থেকে বলা যায় সরকারের ক্ষমতা তৈরি করতে পরিবেশের কাঠামো সিদ্ধান্তকারির ভূমিকা নিয়ে থাকে। প্রত্যেক সরকারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমান

ক্ষমতা থাকে না। একটি সরকারের কাছে যেটি সহজ ব্যাপার অপর সরকারের কাছে তা সহজ নাও হতে পারে। উন্নয়ন প্রশাসনের সাফল্যের ক্ষেত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং প্রতিষ্ঠান নির্ধারকের ভূমিকা নিয়ে থাকে।

৩.৬ শেষ টীকা

➢ **রাজনৈতিক প্রেক্ষিত :**

আইনি সংস্থা, আদালত, রাজনৈতিক দল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষ সরকারের সাফল্য এবং ব্যর্থতার পিছনে ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে জন আমলাতন্ত্র হল প্রধান উপাদান যে সরকারি কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করে। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমোচ্চস্তর বিন্যস্ত হয়ে থাকে যেগুলি সাধারণ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি সরকার তখনি ফলপ্রসূ হয় যখন তার কর্মচারীদের পারফরম্যান্স ভালো হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র এমন অনেক রাজনৈতিক কাজকর্ম করে থাকে যেগুলি তার করার কথা নয়। যার অর্থ আমলাতন্ত্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে যার ফলে তারা নিজেদের মূল দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যায়। রিগ্‌স দেখিয়েছেন প্রশাসনিক এবং পরিচালন মতবাদ আমেরিকাতে কতখানি প্রয়োজন। এবং অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে সীমিত পরিমাণে প্রয়োজন। একাধিক অ-পশ্চিমী রাষ্ট্রে ক্ষমতা ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব লক্ষ করা যায় এবং এই সকল জায়গাগুলিতে ক্ষমতাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। অন্য অর্থে প্রশাসনিক নীতি, ভারসাম্যের রাজনীতিতে প্রশাসনের পারফরমেন্স বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। রিগসের মতে কোনো রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা জরুরি। ঐতিহ্যবাদী প্রশাসনিক ধারণা সাহায্যকারীর এবং প্রাসঙ্গিকতার কারণে প্রয়োজন। রিগ্‌সের মতে ভারসাম্যযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা কখনোই গণতন্ত্রের সঙ্গে সমার্থক নয়। এই ব্যবস্থা যেখানে উপস্থিত সেখানে একদলীয় ব্যবস্থা রয়েছে অর্থাৎ কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় এটা সম্ভব অথবা যে ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করার অনীহা থাকে সেখানে এটি সম্ভব। একটি দল প্রাধান্যকারী ব্যবস্থায় অফিসিয়াল আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতা বণ্টন করে নিতে পারে। রিগ্‌সের মতে গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বক্তব্য প্রাসঙ্গিক।

➢ **অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত :**

বেতন ব্যবস্থা কর্মচারীদের কেবলমাত্র উৎসাহ প্রদানে সাহায্য করে না, কোন রকম চাপ দেওয়া থেকে বিরত থেকে অফিসিয়াল কাজ করতে সাহায্য করে। বেতন ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা মেটায়। যার অর্থ হল কর্মচারীদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান এই বেতন থেকে পূরণ করা সম্ভব হয়। দায়িত্বশীল Pay-roll ব্যবস্থার মাধ্যমে মজুরী বণ্টন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে 'কর' থেকে যে আয় হবে সেখান থেকেই এই অর্থ প্রদান করা হবে। অর্থাৎ বেতন ব্যবস্থা রাজার জন্য অর্থনৈতিক ভীত মজবুত থাকতে হবে এবং উৎপাদনের স্তর যথেষ্ট উঁচু মানের হতে হবে। প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের প্রয়োজন মেটানো ছাড়া কর্মচারী গোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অর্থনৈতিক উৎপাদনের স্তর আরো উঁচু হতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং যারা প্রাথমিক ও সাধারণ কর্মচারী বলে বিবেচিত হয় তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এটা আবশ্যিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা জাতীয় আয় বাড়াতে সাহায্য করলেও একটি সমাজ তাদের সমস্ত

চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে না যদি না প্রাথমিক পর্যায়ে উপযুক্ত ভীত প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ। বৃহৎ আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ সরকারি শাখাগুলির জন্য প্রচুর খরচ করা হয়। এক্ষেত্রে বেতন ফালাফাল তৈরিতে বিশেষ ভুমিকা ন্যায়। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলিতে কাজের সুযোগ অনেক কম, এখানে কৃষি মানুষকে ভরসা যোগায়। সরকারি কাজের জন্য চাপ ক্রমশ বেড়েছে, কারণ অর্থদক্ষ শ্রমিক পচুর পরিমাণে White colour কাজের চেষ্টা করছে। যারা official clarck হতে চায়। যে সমস্ত দেশে বিদেশি ব্যবস্থা রয়েছে, সেই দেশগুলিতে দেশীয় ও বিদেশি জনগণের জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক রয়েছে, যা বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে। উপযুক্ত বেতন কাঠামো যুক্ত আর্থনৈতিক উন্নত রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র আইনি ব্যবস্থাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে যা অর্থনৈতিক উপাদান বাড়ানোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের উন্নয়নের সাহায্য করে। কিন্তু দরিদ্র দেশগুলিতে অনেক বেশি জটিলতা সৃষ্টি হয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের আদর্শ রূপ : উন্নয়ন প্রশাসন প্রাথমিক অবস্থায় আর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আলোচনা করত। যদিও এর উদ্দেশ্য হল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সকলের স্বাধীনতার ও সকলের সমান সুযোগের কথা বলা। ঘটনা হল এই যে বণ্টন, বিনিয়োগ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সম্পদের সমরূপ বণ্টন সহায়তা করে। উন্নয়ন প্রশাসনের মূল দর্শন হল পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

Chicago : 1961 American Society for Public Administration, রিগ্‌সের সভাপতিত্বে Comparative Administration Group (CAG) প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন প্রশাসনের বিশেষ সমস্যার ওপর আলোকপাত করার জন্য এটি গঠন করা হয়েছিল, যাকে Ford Foundation অর্থনৈতিক সাহায্য করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি আর্থ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্পর্কের বিষয়ে আগ্রহী ছিল। এই গোষ্ঠী অনুভব করেছিল যে, তৃতীয় বিশ্বে ঐতিহ্যবাদী প্রশাসন জটিল, সংকীর্ণ যেটি মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার অনুপযুক্ত। এটি প্রশাসনের আবে গগত আচরণ অযৌক্তিকতা ইত্যাদির বর্ণনা দিতে অক্ষম। Technological-managerial School পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করার কথা বলে। কিন্তু Ecological School তাকে চ্যালেঞ্জ করে। এদের যুক্তি হল উন্নয়ন বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সম্পর্কীকরণের ওপর উৎসাহ দেয়। এই ধারণা অনুসারে প্রশাসনের সামাজিক ভিত্তি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের থেকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। CAG-এর গবেষকরা তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এই গোষ্ঠী উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জননীতির ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন বিভিন্ন সেমিনার, সম্মেলন বা কমিটি গঠনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানটি তার কাজকর্মে রূপদান করেছিল। এই বিষয়ে যাদের প্রায় ৬১টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৬০-এর দশকে ফলাফলের মূল্যায়ন, সন্দেহ এবং পুরানো কৌশলগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসময় পুরানো কৌশলগুলিকে নিয়ে পথ চলতে চলতে নতুন ধারণা খোঁজা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করে নতুন পথ বের করার চেষ্টা হয়েছে, যেটি মিশ্র সংস্কৃতির বৈধতা দেবে। জনপ্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নয়নের বিকল্প পথের কথা বলে। তারা জনপ্রশাসন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কগত পরিবেশের কথা বলে। অন্যভাবে বললে জনপ্রশাসনে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব ঘটে। এই ধরনের মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা লেন ফ্রেড রিগ্‌স।

ফ্রেড রিগ্‌স উন্নয়ন প্রশাসনের তথাকথিত ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণে দেখেছেন মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে GNP-র বৃদ্ধির কোনো আবশ্যকতা নেই। তথাপিও মাথাপিছু আয় উন্নয়নের কোনো সূচক হতে পারে না। তিনি সূচক হিসাবে মানুষের দৈহিক গুণকে পছন্দ করতেন। তাঁর মতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক গুণ সূচকের ভূমিতে নিতে পারে। রিগ্‌স উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সামাজিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার, কাঠানো-কার্যবাদী বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে Industria-transitia-agraria formulation-কে তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিকে Prismatic Society-র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেটি Traditional Fused Society থেকে Modernity Defracted Society-কে কিভাবে রূপান্তরিত হয় তা নিয়ে আলোচনা করে। Ecological Approach প্রশাসনের সঙ্গে অপ্রশাসনিক বিষয়ের কী সম্পর্ক সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে প্রতিক্রিয়া দেয়, যেটি এই দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য। একটি ধারণা আছে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি তার বিমূর্ত রূপের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে পারে না যেখানে কার্যকারী আচরণ সাধারণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করে। এখন পর্যন্ত আধুনিক একাধিক সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় ঐতিহ্যবাদী কাঠামো, পরিবার, ধর্ম, জাতপাতের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে এটি আর্থ-সামাজিক অনুশীলনকে ধরে রাখে। সুতরাং সমাজ-সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক উপাদান কৌশলগত ও সাহায্যকারী পরিকল্পনার প্রয়োগের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত তা বুঝতে সচেষ্ট হয়। একটি প্রাথমিক শক্তিশালীগোষ্ঠী রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী তখনই হয় যখন সুনির্দিষ্টতা, সময়, সতর্কতার মত উপাদানগুলি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উন্নয়ন প্রশাসনের অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি : ১৯৬০-এর দশকে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপান্তর ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি নিয়মানুক অধ্যায়নের রূপদান করে যার মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির কৌশলগত বিষয়ে সাহায্য করে প্রতিষ্ঠান গঠনে ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন ব্যবস্থার সমান্তরাল চরিত্র আছে, যার কাঠামো এবং কাজ বিশ্লেষণে ছিল এর মৌলিক একক। এতে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এর মুল লক্ষ্য হল আদর্শ অথবা কমপক্ষে একটি ভালো প্রশাসনিক কাঠামোর কথা বলে। উড্রো উইলসন, এল ডি হোয়াইট, ফেয়ল, গালিক, টেলর এবং আরো অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছেন। এর মধ্যে আমেরিকার অনুশাসনের প্রতিরূপের প্রতিফলন হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মানুষের জন্য। এই তালিকায় একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যার মধ্যে প্রতিবেদন কিংবা অধ্যায়ন রয়েছে যেগুলি বিশেষজ্ঞ, কৌশল সহায়ক কিংবা পশ্চিমী রাষ্ট্রের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশাসকদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় একটি আদর্শ কাঠামো রচনা এবং সমস্যাগুলিকে খুঁজে বের করে তার সমাধান করা। যার মাধ্যমে একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতিকে চিহ্নিত করা যায়।

কিভাবে CAG উন্নয়ন প্রশাসনে অবদান রেখেছে তা বুঝে নেওয়া? :

১৯৬০-এর দশকের উন্নয়ন পদ্ধতির মূল্যায়ণ ৭০-এর দশককে প্রভাবিত করেছিল। ৭০-এর দশকে কেবল উন্নয়নের ধারণারই পরিবর্তন ঘটেনি, উন্নয়নের লক্ষেরও পরিবর্তন ঘটেছিল যেটি অনেক বেশি মানব প্রয়োজন কেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু উন্নয়ন প্রশাসনের প্রতিরূপটি এই বিষয়গুলির পরিচিত হয়েছিল এবং নিয়মানুবর্তিক কার্যাবলীর মধ্যে এর বাস্তব পরিবর্তনের কৌশলগুলি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়েছিল উন্নয়ন প্রশাসনের অধ্যায়নের ক্ষেত্রে। জন প্রশাসনের এক মুখিনতার জন্যে একে পছন্দ করে। UNA দ্বিতীয় দশক ছিল উন্নয়নের সময়। এর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল ১৯৬৯-এর Technical Assistance Programme-এর অন্তর্গত

International Development Commission-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী। এই প্রতিবেদনটি সুস্পষ্টভাবে তৈরি করা হয়েছিল। যেটি দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিল ১৯৬০ সালের প্রশাসনের আধুনিকীকরণের ওপরে, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছিল কৌশলগত পদ্ধতিকে, যা যুক্ত ছিল পশ্চিমি প্রশাসনিক সঙ্গে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির কাছে এর ব্যাবহারের মূল্যায়ন ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছিল সাধারণ মানুষ, যারা গরিব, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নয়। উন্নয়ন প্রশাসনের সমস্যাগুলি আবর্তিত হত সেইসব দেশের ওপর যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা নিত এবং জোর দিত সামাজিক বর্ণনার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ তত্ত্বের ওপর।

- **রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি :**

একাধিক গবেষক বর্ণনা করেছেন যে সামাজিক পরিবর্তনের গতিশীলতা পরিবর্তিত হয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা যেটি খোঁজে রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনের একতাকে। নিশ্চিত করে বলা হয়েছিল যে প্রশাসনিক প্রশ্ন হল রাজনৈতিক। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক যে ধাঁচ তা প্রশাসনকে পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়। এই ধাঁচ যেটা সম্পদের বণ্টন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিসীমার সঙ্গে যুক্ত এবং এটি 'প্রাতিষ্ঠানিক সংবিধান' ও অন্তর্বর্তী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মোহিত ভট্টাচার্যের মতে "রাজনৈতিক অর্থনীতির সনাতন পাঠের ধারার সঙ্গে তাত্ত্বিক গঠনগুলি সমাজের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককে আবিষ্কার করে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি "Good paradigm" এবং "Rational Model"-কে উল্লিখিত করে। এই নতুন ধারণাগুলি শক্তি এবং কাজের তত্ত্বকেই উল্লেখ করে। এই ধাঁচের গতি প্রকৃতি গঠিত হয় উন্নয়ন প্রশাসনের পরীক্ষা, দ্বন্দ্বগুলির প্রকৃতিগত পদ্ধতি এবং তাঁদের সংশ্লিষ্ট সংকল্পের মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধাঁচটি প্রশাসনিক প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি :

একাধিক গবেষক উন্নয়নমূলক প্রশাসনকে বুঝতে চেয়েছেন একটি পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। পরিবেশগত এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করা হয়েছে দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য। যুক্তির বিষয় হল এই যে, উন্নতি হল একটি সার্বিক প্রক্রিয়া। একটি ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি হল এই যে, জাতীয় উন্নতি এবং প্রশাসনের জন্য রাজনৈতিক উন্নতি আবশ্যিক। জাতীয় উন্নতিতে ভূমিকা নিতে জনপ্রশাসনের ক্ষমতাটিও এই রাজনৈতিক প্রশাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটা জানা কথা যে প্রশাসন চূড়ান্ত ভূমিকা নেয় নীতি গঠনে এবং এটি কার্যকর করার ব্যবস্থাপনার ওপর। রাজনৈতিক পরিবেশ প্রশাসনিক পরিবেশের ওপর একটি শর্তমূলক প্রভাব স্থাপন করে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন প্রশাসন

জনপ্রশাসনের বেশিরভাগ তাত্ত্বিকগণ সংগঠনের একটি ধারাকে স্বীকৃতি দেয় যেটি সর্বজন স্বীকৃত নয়। কিন্তু ওইসব দেশে এটি ছড়িয়ে পড়ে যেসব দেশগুলিকে তুলনামূলকভাবে উন্নয়নশীল বলা হয়। তারা এটা ভাবে না যে তাঁদের এই ধারণাগুলির প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করে প্রথাগত সংগঠনগুলির প্রাক্ অস্তিত্বের ওপর। সংগঠন এবং উন্নয়নের মধ্যে যে সম্পর্ক তা সহ-সম্পর্কযুক্ত নয়। একমাত্র অধিক উন্নত দেশগুলি সংগঠনকে তৈরি করে এই অর্থে

যে, এই শব্দটি সমাজবিজ্ঞানের সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। কার্যকরী প্রথাগত সংগঠনগুলি উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

অনুন্নত দেশগুলি এই ধরনের সংগঠনগুলিকে তৈরি করতে পারে না যেগুলি উন্নত প্রকল্পগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা গতিশীল করার জন্য বিশেষ কার্যকরী। এর দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, সমাজ ব্যবস্থা যত অনুন্নত তাঁদের ক্ষেত্রে ওই সংগঠনগুলি তৈরি করা ভীষণ জটিল। আর যে সমাজতন্ত্রে এই ধরণের সংগঠনগুলি যত কম আছে তাঁদের ক্ষেত্রে উন্নতির পথ তত বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বেসরকারি সংগঠনগুলি প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল একটি ব্যাপক প্রসারিত বিষয় হিসাবে। এই সংগঠনগুলি বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যেমন—মঠ, সংঘ, ব্যবসায়িক কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি হিসাবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান সংগ্রহ ও রূপান্তরিত করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই প্রারম্ভিক পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগে একাধিক জটিল সংগঠন গঠিত হয় যেমন—কর্পোরেশন, পাবলিক বডি ইত্যাদি।

অন্যথায় অপশ্চিমি দেশগুলিতে এক নতুন চিত্র দেখা যায়। এখানে কেবলমাত্র আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বেতন ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা হয়। একজন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় অতিমাত্রায় ও অভূতপূর্ব উন্নতি দেখে অবাক হয়ে যায়। তবে এই ধরণের বিকাশ পাশ্চাত্য রূপরেখার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়। তবে অতিমাত্রায় পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোর অকৃতকার্য চরিত্রকে প্রকাশিত করে যদিও সেগুলি সংগঠনের মতোই দেখতে কিন্তু সেগুলি সংগঠনের মত কাজ করে না। তথাপি সবচেয়ে লক্ষণীয় পার্থক্য হল এই যে, প্রতিনিধিদের স্বার্থের ঘোষণা করার পরিবর্তে সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কের কথা বলা হয়। যে সকল গোষ্ঠী প্রায়শই তাঁদের নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যারা রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের অধীনে কর্মরত। কিংবা কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। এইভাবেই বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে তাঁদের নেতৃত্বের স্বার্থকে সিদ্ধ করার প্রবণতা অধিক প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে তারা তাঁদের সদস্যদের যারা প্রথম সারিতে থাকে তাঁদের স্বার্থ বড় একটা দেখে না। এই সংগঠনগুলি বিভিন্ন ভাবে নিজেদের অগ্রগতি বা প্রগতির পথ তৈরি করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং সদস্যদের সাংগঠনিক উদ্যম সামাজিক পরিবেশের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতেও সহায়ক হয়। এইভাবে এই সংগঠনগুলিকে প্রগতর ফল এবং কারণ রূপে গণ্য করা যেতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক যে সকল নীতি প্রণয়ন করা হয় সেগুলি মূলত সমাজের প্রয়োজনে তৈরি হয়—সেই পরিকাঠামোর মধ্যে এই সংগঠনগুলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম। বিশেষত যে সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

রিগসের মতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক বিষয়গুলির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বেতন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সংগঠনের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যিক। অনরূপভাবে অনস্বীকার্য সুসম রাজনৈতিক পরিকাঠামো, উপযুক্ত বেতন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত না হলে সংগঠনগুলি সঠিকভাবে তৈরি হতে পারে না। আবার সুষম বেতন ব্যবস্থার প্রচলন করতে গেলেও প্রয়োজন সুষম রাজনীতি এবং সংগঠন।

একথা যথোপযুক্তভাবে বলা যায় যে, কোনো সামাজিক ব্যবস্থায় প্রগতির পর্যায়গুলিকে বিচারের ক্ষেত্রে

ভারসাম্য যুক্ত রাজনীতি পরিণত সাংগঠনিক ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রে সঠিক বেতন ব্যবস্থার প্রয়োগ বা প্রচলন অত্যন্ত জরুরী। একমাত্র এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা যায় আধুনিক শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধান। শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেগুলির প্রয়োজন হয় তার মধ্যে পরিবেশগত কারণও একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। পরিবেশের ভারসাম্যের অভাব ঘটলে তা সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং এর ফলে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষকেন্দ্রিক পরিবেশের উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে যে বিভিন্ন সমস্যাগুলি লক্ষ্য করা যায় তার পেছনে ভৌগোলিক, জলবায়ু এবং অবস্থানগত ভারসাম্যের অভাব নীহিত থাকে—এই প্রাকৃতিক শর্তগুলি কিন্তু উন্নয়নকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষা প্রগতির পথে অনুকুল। উন্নত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে সকল রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সরকার অনায়াসেই বিবিধ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। অপর দিকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এর বিপরীত মুখী অবস্থাই লক্ষ্য করা যায়। অনুন্নত দেশগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত ঘটনা বা পরিবেশগত ভারসাম্যের অভাব সমাজ ব্যবস্থাকে অধিক প্রভাবিত করে থাকে এবং যাকে অতিক্রম করা প্রশাসনের ক্ষেত্রে জটিল হয়ে ওঠে, কিন্তু এই ঘটনা উন্নত দেশগুলিতে লক্ষ্য করা যায় যাতে তারা তাদের পরিকাঠামোর সাহায্যে এই বিঘ্নগুলিকে সহজেই অতিক্রম করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখে। এইভাবেই উন্নত দেশগুলিতে প্রশাসনিক দক্ষতা এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের উন্নতির পথে অন্তরায় না হয়ে আর সহযোগী মিত্রতে পরিণত হয়।

মানুষের চারপাশের পরিবেশের ক্ষেত্রেও এরকমই নানা সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব সেই কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান চলতেই থাকে। যদিও একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গত তারতম্য অবশ্যই বিদ্যমান দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণেই একটি মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার জোরে যে কাজটি অনায়াসেই করতে পারে, অপর ব্যক্তি হয়ত সেই কাজটির ক্ষেত্রে অসফল হলেও অন্য কোনো কাজে তার বিশেষ উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবেই মানুষের ব্যক্তিগত তারতম্য এবং বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যের ফলে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবেই কাজের পার্থক্যের কারণে সমাজে তৈরি হয় শ্রেণিভেদ।

আপাত দৃষ্টিতে মানষের এই জাতীয় পরিবেশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) জনসংখ্যাগত (২) মানবিক ভেদাভেদগত (৩) দেহগত বৈশিষ্ট্য এবং (৪) কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য।

মানুষের **Demographic** যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে একটি সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বহু সংখ্যক মানুষ একই স্থানে এবং কখনও কখনও বিবিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে থাকে, যাদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কখনও বৃদ্ধি পায় কখনও হ্রাস পায়। একথা অনস্বীকার্য রাজনীতিতে কত সংখ্যক বিচক্ষণ মানুষ যুক্ত হয়েছেন তার দ্বারা সে রাজনৈতিক পরিকাঠামোর গুণমান নির্ণয় করা যায়। তবে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থকতার পিছনে সংখ্যাগত বিষয়টিরও একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। দেখতে হবে তার সদস্য সংখ্যা যেন কখনই স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক বা ক্ষুদ্র না হয়। বস্তুত কোন একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যার পরিমাণ এবং জন ঘনত্বের তারতম্যের উপর সেই রাষ্ট্রের উন্নতি এবং অগ্রগতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

অধুনা প্রগতির ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় উপাদানেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **Everett Hagen** বলেছেন যে, প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষ যেহেতু রক্ষণশীল ছিলেন, সেই কারণে বেশকিছু রক্ষণশীল মানুষ যারা সমাজ পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন, তারা সমাজ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করার অজুহাতে যে কোনো পরিবর্তনের পরিপন্থী ছিলেন। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্র উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে, সেখানে সমাজের মাধ্যমেই এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রগতি আনার ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। উপরন্তু সমসাময়িক অপশ্চিমীয় সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, তৃণমূল স্তর থেকেও বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে যারা এই সমাজের পরিবর্তন ধারক এবং বাহকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রিগসের মতে কর্তৃত্ববাদ একটি জটিল সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে যেটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া জীবনের অন্যান্য রাস্তাগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই চ্যালঞ্জগুলি জীবনের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিপরীত দিকে গতানগতিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা কিছু মানুষকে দেখি যারা একটি মাত্র জীবন পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে রাখে কারণ তাদেরকে কোন বিকল্প রাস্তা দেখানো হয়নি এবং তারা নিজেরাও কোন ভিন্ন রাস্তা অনুসরণ করতে চায় না। এইভাবে সেই সমাজ ব্যবস্থায় অভিনবত্ব দেখা যায় না কারণ সেখানে সহজ লভ্য বিকল্পের আস্থার অভাব, পক্ষান্তরে কর্তৃত্ববাদকে দেখা যেতে পারে উন্নতি সাধনের একটি রাস্তা হিসাবে। ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষামুলক ও পারিবারিক পরিচালন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টাগুলি উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হতে পারে।

জনগণের ভিত্তিমূলক গুণাবলীর দিকে তাকিয়ে এটা বলা যায় যে উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় ব্যক্তিবর্গের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, জ্ঞান ও ক্ষমতার অভাবে, যেগুলি একটি শিল্প চালিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। এটা বিবেচনা করা হয় যে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য উপযুক্ত শিক্ষামূলক সুযোগ সুবিধাগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের উপযুক্ত দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের প্রশিক্ষণ হিসাবে।

উন্নত সামাজিক সংগঠনগুলি সদ্যদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে তাদের সামাজীকিকরণ করতে পারে কিন্তু সমস্যা হল এই যে অনুন্নত আধা সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যে কার্যকরী করে তোলা কেবলমাত্র জটিল হবে না বরং তারা প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত মানুষদের যে উন্নত দক্ষতা দিয়ে পুনঃ সামাজিকীকরণ করে তোলে। উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিষয়গুলি হল সঠিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। সেই জন্য সরকারি চাকুরিজীবীদের আধুনিক ও উজ্জীবিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ভাতা ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে যে সমস্ত রীতি, প্রথা থাকে সেগুলি অগ্রগতির পিছনে বাধার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতি নামক শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বহুকাল ধরে চলে আসা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট মুলধন, রীতি, প্রথা ইত্যাদিকে বোঝায়। এই ব্যবস্থাটি অবশ্যই পরিবর্তিত হতে পারে রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলির আপেক্ষিক গতিশীলতা হল সংস্কৃতির একটি স্মারক।

যে কোন রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় ভাষা হল একটি বিশেষ পরিচিত উপাদান, যা সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। কেউ কেউ আছেন যারা মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ভাষা অনেক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। তাই যারা ঐ সব কথাবার্তা বলে তারা নিজেদেরকে আধুনিকীকরণ করতে প্রস্তুত

নয়। একটি উন্নতশীল শাসন ব্যবস্থার দ্বারা যে কোন ভাষাকে ব্যবহারে উপযোগী করে তুলতে পারে। অবশ্যই উন্নতির প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

ধর্ম সম্পর্কে একই ধরনের বক্তব্য বলা যায়। কিছু চিন্তাবিদের মতে প্রটেস্ট্যানিয়জম কেবল একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তি নয় যা পুঁজীবাদের বিকাশে সাহায্য করে কিন্তু অখ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলি ক্ষেত্রে আসা করা যায় বড়ো জোর এরা সুসভ্য হতে পারে। সভ্য রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। বর্তমানে এই দৃষ্টিভঙ্গির আর কোন জনপ্রিয়তা নেই যা জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বক্তব্যে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং একমাত্র পথ যার দ্বারা নিরাপদে উন্নয়নমূলক পরিবর্তন করা যায় যা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উন্নয়নের সঙ্গে পরিচিতি ঘটায়। প্রত্যেক সংস্কৃতির সামগ্রীকভাবে অধ্যায়ন করার আবশ্যক। তারাই এই কাজটি করবে যারা ভাষা, ইতিহাস এবং ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী বা পারদর্শী।

৭০ এবং ৮০ দশকে উন্নয়নের সমস্যাগুলির পুনঃভাবনা করা হয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। বুদ্ধির মাত্রাই হল উন্নয়নের মাপকাঠি। মানবিক প্রয়োজন, আর্থ সামাজিক লাভের সমানুপাতিক বণ্টন এবং উন্নতির দিকে তাকিয়ে মানুষের ক্ষমতায়ন করা হল। উন্নয়নের গবেষকরা আর সেইভাবে দেখে না যে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি সমরূপ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দেয়।

উন্নয়নের কোনো একটি তত্ত্ব নেই। উন্নয়নের সমসাময়িক তত্ত্বগুলি হল—

১। বহুত্ববাদ, উন্নয়নের একাধিক পথের কথা বলে।

২। তাদের সাংস্কৃতিক অনুমানের ক্ষেত্রে পশ্চিমী অনুকরণ কিছুটা কমেছে।

সমসাময়িক উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল উপাদানগুলির প্রতিফলন ঘটেছে Rogers, korten, klaus, Biur Bryant এবং White-এর চিন্তায় যার মধ্যে রয়েছে—

১। উন্নয়নের সুফল বণ্টনের ব্যাপক সাম্য।

২। জনপ্রিয় জনঅংশগ্রহণ, জ্ঞানের বণ্টন এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের নিজস্ব উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন।

৩। নিজস্ব বিশ্বাস এবং উন্নয়নের স্বাধীনতা, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের বিশ্লেষণ।

৪। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট্য কৌশলগুলিকে একত্রিত করা।

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ কী? উন্নয়ন প্রশাসনের উৎস ও উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(২) গণপ্রশাসনে উন্নয়ন প্রশাসনের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) উন্নয়ন প্রশাসন ও সাবেকী প্রশাসনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

(২) তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রশাসনের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) উন্নয়ন প্রশাসনের অর্থ কী।

(২) উন্নয়ন প্রশাসনের চারটি উপাদান উল্লেখ করুন।

(৩) টীকা লিখুন :

(ক) উন্নয়ন প্রশাসনের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি,

(খ) উন্নয়ন প্রশাসনের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত।

৩.৮ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

চক্রবর্তী, দেবাশীষ, *গণপরিচালন*।

একক-৪ (ক) ❑ জনপছন্দ তত্ত্ব ও নীতি বিশ্লেষণ

গঠন

৪.১ **উদ্দেশ্য**

৪.২ **জনপছন্দ তত্ত্বের ভূমিকা**

৪.৩ **জনপছন্দ সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ**

৪.৪ **জনপছন্দ তত্ত্ব একটি ধারণাগত কাঠামো**

৪.৫ **উপসংহার**

৪.৬ **সারাংশ**

৪.৭ **পাঠ সমাপ্তি প্রশ্নাবলী**

৪.৮ **নির্বাচিত পাঠ**

৪.৯ **গ্রন্থপঞ্জী**

৪.১ উদ্দেশ্য

এই পাঠ্য বিষয়টির উদ্দেশ্য হল জনপছন্দ তত্ত্বের ভূমিকা উপস্থাপনা করা এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে প্রচলিত জননীতি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা। এই আলোচনা মূলত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রীক ও সংগঠনকেন্দ্রীক।

পাঠশেষে শিক্ষার্থীগণ—

- জনপছন্দ তত্ত্বের ধারণাটি কী ও তা কিভাবে বিকশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করবেন।
- জনপছন্দ তত্ত্বের মূল্যায়ন ও প্রয়োগ বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- নীতি প্রক্রিয়া ও নীতি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ধারণা ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে সক্ষম হবেন।

৪.২ জনপছন্দ তত্ত্বের ভূমিকা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক আলোচনাক্ষেত্র ছিল সাংবিধানিক গণতন্ত্রের সমস্যাবলি—জনপছন্দ তত্ত্ব আধুনিক অর্থনৈতিক উপাদান ব্যবহার করে এই আলোচনা ক্ষেত্রের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছে। জনপছন্দ তত্ত্ব সরকারকে তার পরিচালক, তথা আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের আঙ্গিকে অবলোকন করেছে। জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের মতে, আমলা বা রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নিজেদের অর্থনৈতিক লাভের স্বার্থে কাজ করে। জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের আলোচ্য বিষয়াদি সংঘবদ্ধ করার জন্য সরকারের গঠন বৃত্তান্ত সম্যকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন, যার প্রারম্ভিক পর্বে সরকারের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। আইনসভার সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে

সাংবিধানিক প্রতিবন্ধকতাগুলোর আলোচনা জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের আলোচনার অন্যতম ক্ষেত্র। 'Rent seeking' যা বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সরকারি কাজের সম্পর্ক নির্ণয় করে, তা জনপছন্দ তত্ত্বের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। এই কারণে জনপছন্দ তত্ত্বকে অনেকেই নয়া রাজনৈতিক অর্থনীতি বলে চিহ্নিত করে থাকেন। জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা উল্লেখ করেছেন যে বাজার অর্থনীতিতে সরকারের প্রধান কাজ হল, বিভিন্ন ধরনের বাজার সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাগুলোর ব্যবস্থা করা। Rent-seekers বা ভাড়া-সন্ধানীরা ভোক্তাদের কাছে কাঙ্খিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে কিভাবে সঞ্চালনা করে, তা জনপছন্দের তাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। জনপছন্দ তত্ত্ব অবশ্য গণতন্ত্রের সাপেক্ষে উপস্থাপিত, পক্ষান্তরে স্বৈরতন্ত্রেও 'rent-seeking' এর প্রয়োগ থাকতে পারে, অর্থাৎ শোযোক্ত ধারণাটি কেবলমাত্র যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ্যভাবে যুক্ত নয়। কিন্তু ভাড়া-সন্ধানের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম প্রয়োগপ্রক্রিয়া যেভাবে আইন প্রণয়নকারী, শাসনবিভাগের কর্ম কর্তা, আমলা, এমনকী, বিচারকদের ওপরেও চাপ সৃষ্টি করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিধি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রক্রিয়া উপলব্ধি এবং মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা করে।

৪.৩ জনপছন্দ সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ

১৯৪৮ সালে ডানকাণ ব্ল্যাকের লেখনীর সূত্রে জনপছন্দের নতুন তাত্ত্বিক ধারার সুত্রপাত হয়। নির্বাচক তত্ত্বের ধারণা ব্ল্যাকের রচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। ১৯৫৮ সালে ডানকান ব্ল্যাক The Theory of Committees and Election রচনা করেন, যা জনপছন্দের তাত্ত্বিক ধারায় নতুন দিগন্ত আনে। গর্ডন তুলক (১৯৮৭, পৃঃ ১০৪০) ডানকাল ব্ল্যাককে জনপছন্দ তত্ত্বের জনক হিসেবে অভিহিত করেছেন। George Mason University-এর জেমস এম. বুচানন এবং গর্ডন তুলক যুগ্মভাবে ১৯৬২ সালে *The Calculus of Consent : Logical Foundations of Constitutional Democracy* রচনা করেন, যা জনপছন্দ তত্ত্বকে একটি শাস্ত্রীয় শাখায় উন্নীত করে। এছাড়া আরো যে সকল রচনা জনপছন্দ তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছিল তা হল, কেনেথ অ্যারোর Social Choice and Individual Values (১৯৫১), অ্যান্থনি ডাউনের *An Economic Theory of Democracy* (১৯৫৭), ম্যানকার অলসনের *The Logic of Collective Action* (১৯৬৫)। ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Public Choice Society গঠিত হয় এবং তার ফলে জনপছন্দ তত্ত্বের বিকাশ তরান্বিত হয়। ১৯৫০-এর দশকে এই তত্ত্বের উদ্ভব হলেও ১৯৬৮ সালে জেমস বুকানন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে জনপছন্দ তত্ত্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

সরকারি নীতির অদক্ষতার ধারাবাহিক প্রবণতা নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে ব্যবহার করেন জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা। অস্ট্রিয়ার জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ, যথা, মাইসেস, হায়েক, কারজনার এবং বোয়েট্‌কে মনে করেন যে আমলা ও রাজনীতিকরা উপকার বিতরণকারী, কিন্তু তাদের কাছে তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। দৃষ্টবাদী জনপছন্দ তত্ত্ব একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকাঠামোর সাপেক্ষে কী ধরনের সরকারি নীতি প্রযুক্ত হবে, তার ওপরে আলোকপাত করে থাকে; অন্যদিকে কোন্ নীতির প্রয়োগ কাঙ্খিত পরিণাম এনে দেবে, তা বিবেচনা করে নীতিমানজ্ঞাপক জনপছন্দ তত্ত্ব।

উল্লেখ্য যে আধুনিক জনপছন্দ তত্ত্বের পূর্বসূরী ছিলেন লার্ট উইকসেল (১৮৯৬)। যিনি কর ও ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করে উপকারিতার নীতির সাপেক্ষে সরকারকে রাজনৈতিক বিনিময় মাধ্যম হিসেবে অবলোকন করেন।

আধুনিক জনপছন্দ তত্ত্ব 'জনপছন্দের জনক' ডানকান ব্ল্যাকের রচনার সূত্রে যাত্রা শুরু করে। ১৯৪৮ সাল থেকে লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন জায়গায় জনপছন্দ তত্ত্বের আলোচনা তার জায়গা করে নেয়; এই প্রবন্ধগুলো পরবর্তীকালে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়, *The Theory of Committees and Elections* (১৯৫৮)। সাধারণ আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্ল্যাক এই তত্ত্বের সাধারণীকরণ করে প্রকাশনা করেন 'Theory of Economic and Political Choices'।

জনপছন্দ তত্ত্বের বিকাশে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো, তথা কেনেথ জে. অ্যারোর *Social Choice and Individual Values* (১৯৫১), অ্যান্থনি ডাউনসের *An Economic Theory of Democracy* (১৯৫৭), ম্যানকার অলসনের The Logic of Collective Action (১৯৬৫) প্রভৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেমস এম. বুকানন ও গর্ডন তুলকের যুগ্ম রচনা *The Calculus of Consent : Logical Foundations of Constitutional Democracy* (১৯৬২) জনপছন্দ তত্ত্বের বিকাশে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই রচনার মাধ্যমে দৃষ্টবাদী অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের বিকাশের ওপর আলোকপাত করেন উক্ত লেখকদ্বয়, যদিও তারা সম্মতির নৈতিক ভিত্তিকে অস্বীকার করেনি।

নোবেল পুরস্কার জয়ী জেমস বুকানন (১৯৮৬ সালে নোবেল জয়) এবং গর্ডন তুলককে আধুনিক জনপছন্দ তত্ত্বের প্রাথমিক তাত্ত্বিক বলে মনে করা যেতে পারে; তাঁদের রচনা, *Calculus of Consent* (১৯৬২) অদ্যাবধি এ বিষয়ে অনবদ্য রচনা হিসেবে দাবি করতে পারে। একটি বিশেষ উদ্ধৃতির সারমর্ম অনুযায়ী অর্থনীতিকে হাতিয়ার করে তুলক এবং বুকানন জেমস ম্যাডিসনের দেখা মার্কিন রাজনীতির কাঠামোকেই তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গঠিত গণতন্ত্রের আলোচনা, তথা, সংসদীয় গণতন্ত্রের বেড়াজাল অতিক্রম করে সাংবিধানিক কাঠামোর ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অর্থনীতির দৃষ্টিতে সংবিধান বিশ্লেষণ তাঁদের অনবদ্য অবদান। নির্বাচন বিধি, যথা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটদানের প্রশ্নকে সাংবিধানিক কাঠামোর নিরিখে বিশ্লেষণের চেষ্টা করে এই লেখক দ্বয় নির্বাচনী বিধি পছন্দের ওপরে জোর দেন এবং সমস্ত বিষয়টিকে আধুনিক অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে উপস্থাপিত করেন।

৪.৪ জনপছন্দ তত্ত্ব একটি ধারণাগত কাঠামো

জনপছন্দ অর্থনীতি থেকে উদ্ভুত একটি ধারণা, যা করব্যবস্থা এবং সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত পাঠ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা বর্তমানে জনপছন্দের দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছে, কারণ রাজনীতি ও সরকার কিভাবে অর্থনীতির প্রক্রিয়া ও হাতিয়ার ব্যবহার করে চলেছে তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। অর্থনীতিবিদগণ যখন ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হিসেবে বাজারে ব্যক্তির আচরণ ব্যাখ্যা করতে উদ্যত, জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা তখন অর্থনীতির আলোচনার একক ব্যবহার করে বাজারে জনগণের আচরণবিধির পরিপ্রেক্ষিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়।

জনপছন্দ অর্থনীতির প্রক্রিয়া ব্যবহার করে রাজনীতি ও সরকারের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদি উপলব্ধি করতে সচেষ্ট, যা গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপুর্ণ অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তোলে। অর্থনীতির সাধারণ নীতিগুলো বা ধারণাগুলো যৌথ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধিতে কিভাবে সহায়তা করে তা জনপছন্দের

দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ, সংবিধান, সংসদ, কমিটি, নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, আমলা এবং সরকারের অন্য অংশ ও ব্যবস্থাগুলো কিভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা অর্থনীতির নীতি ও হাতিয়ারগুলোকে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, নতুন রাস্তা তৈরীর জন্য সম্পত্তি কর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত একাধারে অর্থনৈতিক ও অন্যধারে রাজনৈতিক। ব্যয় ও উপকারিতার নিরিখে উভয়ক্ষেত্রেই পছন্দ নির্ণিত হয়। উল্লেখ্য যে ব্যয় ও উপকারিতার এই খতিয়ান নিছক অর্থনৈতিক ব্যয় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উপকারিতা সরলীকৃত হিসাব নয়।

আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা ও স্বার্থপরতা বাজারকেন্দ্রীক অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠায় সরকারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যা ক্রামগত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জনপছন্দ তত্ত্ব এই নতুন ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম, যাকে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা দেন ভিনসেন্ট অস্ট্রোম তাঁর *The Intellectual Crisis in American Administration* বইটির মাধ্যমে। জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত সুখ অর্জন যেকোনো যুক্তিবাদী ও অর্থনৈতিক মানুষের লক্ষ্য; ব্যক্তিগত সুখ বলতে তারা ব্যক্তিগত কার্যকরী সমৃদ্ধিকে বুঝিয়েছেন। জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের মতে, জনকল্যাণমুখী কর্মসুচী কখনওই সফল হয় না, যতক্ষণ না ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ঘটে। জনপছন্দ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে আমলাতন্ত্রও যেহেতু কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, যারা দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিজেদের পদ সুনিশ্চিত করেন। সেহেতু আমলারূপে ব্যক্তিরাও নিজেদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ, জনকল্যাণকামী কাজে তারা তখনই মনোযোগ দেয়, যখন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হয় বা যখন ঐ কর্মসুচী তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ না হয়। অস্ট্রোম ও নিস্‌কানেন অভিমত প্রকাশ করেন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার্থে আমলাতন্ত্র স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

জনপছন্দ তত্ত্বে আমলাতন্ত্রের সংকীর্ণায়নের ওপরে যেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তেমনি জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানের কথা বলা হয়। জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা রাষ্ট্রকে গণমুখী করে গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যা নিছক বাজার বনাম রাষ্ট্র বিতর্ক নয়; বরং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও বেসরকারি বাজারকেন্দ্রীক অর্থনীতির মধ্যে সহাবস্থান ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলাকেই জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের আগ্রহ।

জনপছন্দ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে অর্থনীতিবিদরা তাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তারা আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ও কাজকেও তাদের পর্যালোচনার মধ্যে রাখেন। যদিও আইনপ্রণেতারা জনগণের তথা করদাতাদের অর্থ, অর্থাৎ জনগণের সম্পদ 'জনস্বার্থে'ই ব্যবহার করবেন বলে প্রত্যাশিত। রাজনীতিবিদগণ করদাতাদের অর্থ বাঁচাতে সচেষ্ট হতে পারেন; কিন্তু তারা যে সুদক্ষ সিদ্ধান্ত এই লক্ষ্যে গ্রহণ করে থাকেন, তা তাদের নিজের অর্থ সঞ্চয় করার কোনো পথ দেখায় না বা নাগরিকের সঞ্চিত অর্থের কোনো অংশ প্রদান করে না; শক্তিশালী স্বার্থগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে জনগণের উপকার করার এই চেষ্টা জনগণের ওপর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে না, অর্থাৎ জনগণ এই উপকার সম্বন্ধে বা উপকারকারী সম্বন্ধে কতটা অবগত হয়ে ওঠে তাও বিতর্কের বিষয়। অতঃপর জনস্বার্থে সুপরিচালনের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট দুরূহ। পক্ষান্তরে, জনগণের দ্বারা গঠিত স্বার্থগোষ্ঠীগুলো সরকারের কাজের দ্বারা উপকৃত হলে রাজনীতিবিদগণ রাজনৈতিক কর্মসম্পাদনে আর্থিক আনুকূল্যও লোকবল লাভ করতে পারে এবং লক্ষ্যপূরণে অধিকতর সমর্থ হয়ে উঠতে পারে। যে লক্ষ্য জনস্বার্থ কিনা তা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে।

জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ স্থানীয় সরকারের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করে। তাদের মতে, স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কর্ম নির্বাহ বাজেটের ওপর সুপ্রভাব ফেলে, অর্থাৎ ব্যয় হ্রাস করে। জনপছন্দ অর্থনীতিবিদরাও নীতি পরিবর্তন করে আইনের দায়ভার কমাতে আগ্রহী যা বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় এবং পরিণামে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করে। ১৯৮০-এর দশকের শেষভাগে তদানীন্তন রেগন প্রশাসনের Office of Management and Budget এর প্রধান James C. Miller, যিনি একজন জনপছন্দ তাত্ত্বিকও ছিলেন, 'German-Rudman Law' প্রণয়নে সহায়তা করেন; এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল বার্ষিক ব্যয়ে সীমা নির্ধারণ করা এবং যদি সেই সীমা লঙ্ঘিত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই উর্ধ্বসীমা যাতে আরো হ্রাস পায়, তার ব্যবস্থা করা। ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে এই আইন সাময়িকভাবে প্রভাব ফেলেছিল।

বর্তমানে কিভাবে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করতে গিয়ে জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাকে যে রীতি-নীতিগুলো প্রভাবিত ও পরিচালিত করে, তা বিশ্লেষণ করার ওপর জোর দিয়েছেন। রাজনৈতিক কার্যাবলি যে সাংবিধানিক রীতি-নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, তার বিশ্লেষণের ওপর জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ গুরুত্ব আরোপ করেন; এই প্রচেষ্টা থেকেই সৃষ্ট হয় জেমস বুচানন ও গর্ডন তুলকের *The Calculus of Consent*।

ক্রমে micro-economic, তথা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি জনপছন্দ তত্ত্বে বহু অবদানের সাক্ষর রাখে, যা দেখায় যে, কিভাবে ব্যক্তিস্বার্থের সমীকরণ বাজার এবং জননীতি, উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ নিস্কানেনকে (১৯৭১) অনুসরণ করে বলা যায়, যে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলাগণও আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাজেট বাড়াতে পারে, আবার পক্ষান্তরে নাগরিকরাও সংগঠিত হয়ে জনগণের মঙ্গালের জন্য যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। যেমন বুকানন (১৯৬৫) ভেবেছিলেন। অ্যারো (১৯৫১) সামাজিক কল্যাণকর কাজের সম্ভাবনা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে, যুক্তিসংগত কারণেই দেখা যায় যে, যেকোনো গণতান্ত্রিক সমষ্টিকরণ প্রক্রিয়া অসংগতিপূর্ণ ও অস্থায়ী পরিণাম নিয়ে আসে। যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাটিই অপর্যাপ্ত এবং ত্রুটিপূর্ণ বলে মন্তব্য করা হয়; বাজার বা রাজনীতি কেউই নিজের থেকে পর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারে না। বাজারের ত্রুটিযুক্ত অবস্থান ও কার্য সম্পাদনের জন্য একচেটিয়া ক্ষমতার আস্ফালন দেখা যায়, জনমঙ্গালের ওপর প্রভাব পড়ে, বাহ্যিক সমস্যা দেখা যায় এবং সর্বোপরি তথ্যগত সমস্যা সবথেকে বড় দুর্বলতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সরকারের ব্যর্থতাও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। আমলারা নিজেদের স্বার্থপূরণের তাগিদে একদিকে যেমন বাজেটে বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেয়, অন্যদিকে তেমনি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলির ওপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থার 'যুক্তি নির্ভরতা' সেচ্ছাচারী ও অস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে, যেভাবে অ্যারোও (১৯৫১) আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। অ্যারো সামাজিক কল্যাণকর কাজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বলেন যে যৌথ যুক্তিবোধের নিরিখে গৃহীত, বিকল্প সম্বন্ধে ভাবনারহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক কল্যাণ সাধন হয় না। সমাজের পছন্দ যৌথ যৌক্তিকতার পরিচায়ক নয় এবং ব্যক্তিগত পছন্দেরও সমষ্টিকৃত সত্তা নয় বলে অ্যারো অভিমত প্রকাশ করেন। আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিপূরক প্রয়োজন বলে মনে করা হয়।

আধুনিক ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের স্বাধীনতা ও পারস্পরিক নির্ভরতাকে স্বীকৃতি দেয়। এই তত্ত্ব রীতি-নীতির গুরুত্ব স্বীকার করে এবং স্থায়ী, সুদক্ষ এবং কখনও কখনও সুযম পরিণামের অনুকূল

পরিস্থিতির সপক্ষে তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকে। দৃষ্টান্ত সহযোগে এই আলোচনা আচরণবাদী বিজ্ঞানকে অনেক বাস্তবভিত্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। জনপছন্দ তত্ত্বের অনুগামীদের আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষণীয় হলেও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রশাসনিক নীতি সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল আইনের গন্ডীর সীমা অতিক্রম করে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দকে গুরুত্ব দিতে তাদের অধিক আগ্রহ দেখা যায়। ব্যক্তির পছন্দকে জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা ব্যক্তিগত কার্যকরী সমৃদ্ধির আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। Claus Offe উল্লেখ করেন যে, 'efficiency is no longer defined as "following the rules" but as "causing of effects."

জনপছন্দ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল সরকারের অতি ক্রীয়শীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং সেই কারণে সাংবিধানিক সংস্কারও আবশ্যক। জনপছন্দ তত্ত্ব সরকারের ওপর থেকে স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব হ্রাস করার সুপারিশ করেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে সওয়াল করেছে। নিসকানেন এ প্রসঙ্গে চারটি পদক্ষেপের ওপর জোর দিয়েছেন—

(১) শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের মাধ্যমে আমলাদের ওপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা;

(২) জনপরিষেবা প্রদানকে অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা;

(৩) অপব্যয় হ্রাসের জন্য বেসরকারিকরণ অথবা চুক্তিনির্ভর পরিষেবা;

(৪) জনপরিষেবা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্প সম্বন্ধে জনস্বার্থে আরো বেশি তথ্য প্রদান, যাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে জনপরিষেবা প্রদান করা যায়।

জনপরিষেবা প্রদানে বাজারকেই কেন্দ্রীয় অবস্থানে রেখেছেন জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ। নাগরিক বান্ধব অ-আমলাতান্ত্রিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার ওপর জনপছন্দ তত্ত্ব জোর দেয়। জনপছন্দ তত্ত্বে রাষ্ট্র বনাম বাজার বিতর্ক গুরুত্ব পায়নি; বরং এই তত্ত্বের প্রধান বক্তব্য বিষয় হল। কিভাবে রাষ্ট্রকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক করে তোলা যায় এবং বাজারকে সামনে রেখে রাষ্ট্রকে আরো নাগরিক বান্ধব করে তোলা যায়।

৪.৫ উপসংহার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর জনপছন্দ অর্থনীতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। নির্বাচন, আইনসভা, আমলাতন্ত্র প্রভৃতির কাজ, ভূমিকা ও প্রকৃতি নিয়ে একটি নতুন ভাবনার সূত্রপাত হয় জনপছন্দ তত্ত্বের হাত ধরে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ না বাজারী প্রক্রিয়ার, তা জনপছন্দ তাত্তিকদের আলোচনায় উঠে এসেছে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলোর জোটের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠের উন্নতির বিভিন্ন ধারা জনপছন্দ তত্ত্বের প্রবক্তাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। কয়েকজন জনপছন্দ তাত্ত্বিক সরকার ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির ওপরেও জোর দিয়েছেন।

জনপছন্দ তত্ত্বের আলোকে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হল অনন্য 'জনস্বার্থ' বলে কিছু হয় না। জন সমাজে বহু মুল্যবোধ ও চিন্তার সমাবেশ ঘটে থাকে; বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মূল্যবোধ ও বিভিন্ন স্বার্থের দ্বারা দ্রবীভূত। পরস্পরের প্রতিযোগী এই স্বার্থগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কিভাবে এই বিচিত্র বহুমুখী স্বার্থ ও চাহিদাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম হয় তাই বিবেচ্য বিষয়।

জনপছন্দ তাত্ত্বিকদেরও বিভিন্ন ধারা বর্তমান। কয়েকজন যেমন, রক্ষণশীল, কয়েকজন তেমনি উদারবাদী বা

কেইনসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ; জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কেইনসের অর্থনীতির ভাবনার বিরোধীতা করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে বাজারের ব্যর্থতা মোকাবিলায় সরকারের একটি কার্যকরী ভূমিকা থাকে। উল্লেখ্য যে জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ বাজারে সচলতাকে আলোচনার কেন্দ্রে রাখলেও সরকার ও বাজারের আপেক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

৪.৬ সারাংশ

অর্থনীতির বিশেষ ধারা হিসেবে জনপছন্দ তত্ত্ব অর্থনীতির রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা রাজনীতিতে অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ওপর আলোকপাত করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করার জন্য অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা তাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করে। অর্থনীতি ও রাজনীতির সম্পর্কের টানাপোড়েনের নিরিখে জনপছন্দ তাত্ত্বিকগণ নির্বাচক, রাজনীতিবিদ, সরকারি আধিকারিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। কনিষ্ঠ জেমস বুচানন ও গর্ডন তুলক এই আলোচনার সূত্রপাত করেন। বুচানন ১৯৮৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সাবেক অর্থনীতির ধারণা অনুসরণ করে এই তত্ত্ব রাজনীতিবিদ ও আমাদের যুক্তিসিদ্ধ বাহক হিসেবে বিবেচনা করে। জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের মতে, রাজনীতিবিদ এবং আমলারা নিজেদের স্বার্থের সর্বাধিক তৃপ্তির জন্য কাজ করে, এর ফলে অন্যান্যরা যেটুকু উপকৃত হয়, তা সমাজের জন্য উপরি পাওনা মাত্র, অর্থাৎ সমাজের সার্বিক স্বার্থরক্ষা কখনওই এদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। এই তত্ত্ব মনে করে যে, ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং রাজনীতিবিদগণ পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের জন্য নীতি গ্রহণ করে থাকেন। এই কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের যেটুকু উপকার হয়, তা অতিরিক্ত।

সরকারি সিদ্ধান্ত কিভাবে গৃহীত হয়, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জনপছন্দ তত্ত্বের প্রবক্তাগণ অর্থনৈতিক তত্ত্বের দ্বারস্থ হন; জনপছন্দ তত্ত্বের আলোকে বাজার সংক্রান্ত যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে এবং অন্তরালে থাকা বহু সমস্যা যেমন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ এবং সংখ্যালঘিষ্টের শোষণের প্রশ্ন স্পষ্টরূপে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। জনপছন্দ তত্ত্বের ধারক ও বাহকগণ নির্বাচক, লবিগোষ্ঠী, রাজনীতিবিদ, আধিকারিক প্রমুখদের সংকীর্ণ স্বার্থবোধকে প্রকাশ্যে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে এরা নুন্যতম প্রয়াসে নিজেদের স্বার্থের সর্বাধিক পূরণের জন্য ব্যাপৃত থাকে এবং এই প্রয়াসের মধ্যে নিহিত থাকে সরকারের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। জনপছন্দ তত্ত্বের বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ জনগণের স্বার্থপূরণের হাতিয়ার নয়, বরং ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করার মাধ্যম।

৪.৭ পাঠ সমাপ্তি প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) জনপছন্দ তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশের ওপর একটি টীকা রচনা করুন।

(২) জনপছন্দ তত্ত্বের উদ্ভবের প্রেক্ষিতটি পর্যালোচনা করুন।

(৩) জনপছন্দ তত্ত্বটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

(৪) ‘Public Choice applies the methods of economics to the theory and practice of politics and government...’ যুক্তিসহযোগে মন্তব্য করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) জনপছন্দ তত্ত্বটির সমালোচনা লিখুন।

(২) জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে অর্থনীতিতে ‘বাজারের ব্যর্থতা’র মত সরকারও ব্যর্থ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে জনপছন্দ তাত্ত্বিকরা কিভাবে বাজারের ব্যর্থতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) জনপছন্দ তত্ত্বের পাঁচ জন তাত্ত্বিকের নাম লিখুন।

(২) নিসকান সরকারের অতি ক্রিয়াশীলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়টি পদক্ষেপের কথা বলেন? সেগুলি চিহ্নিত করুন ?

৪.৮ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

চক্রবর্তী, দেবাশীষ, *গণপরিচালন*।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Arora, R., *Public Administration—Fresh Perspectives*, New Delhi, Aalekh Publ., 2004.

Basu, Rajasree, *Jana Prasashan*—(Bengali)- Paschim Banga Rajya Pustak Parshad, 2005

Chakraborty, Bidyut, *Reinventing Public Administration-The Indian Experience*, Orient Longman, 2007

Ghosh, Soma, *Jana Prasashan: Tatto ‘O’ Pryog*, Kolkata, Progressive, 2012.

Henry, Nicholas, *Public Administration And Public Affairs*,–PHI Learning Pvt Ltd, 2010.

Sapru, R.K., *Administrative Theories and Management Thought*, New Delhi, Prentice Hall, 2008.

একক-৪ (খ) ❑ জনপছন্দ তত্ত্ব ও নীতি বিশ্লেষণ

গঠন

৪.১১ **নীতি বিশ্লেষণ ভূমিকা**

৪.১২ **নীতি বিশ্লেষণ পাঠের বিকাশ**

৪.১৩ **নীতি বিশ্লেষণ—একটি ধারণাভিত্তিক টীকা**

  ৪.১৩.১ **নীতি বিশ্লেষণ অনুধাবনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি**

  ৪.১৩.২ **নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন মডেল**

৪.১৪ **উপসংহার**

৪.১৫ **সারাংশ**

৪.১৬ **পাঠ সমাপ্তি প্রশ্নাবলি**

৪.১৭ **গ্রন্থপঞ্জী**

৪.১৮ **নির্বাচিত পাঠ**

৪.১১ নীতি বিশ্লেষণ ভূমিকা

জননীতি

যে কোনো ধরনের কর্মপ্রকল্প, যা যেকোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ব্যবসাক্ষেত্র, সরকার প্রভৃতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়তা করে, তা নীতি বলে পরিচিত। জননীতি হল সরকার-এর দ্বারা অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গৃহীত আনুষ্ঠানিক ও ব্যক্ত সিদ্ধান্ত ও কর্মপ্রক্রিয়া। বর্তমানে জননীতি সংক্রান্ত গবেষণায় জননীতির বৌদ্ধিক প্রকার বিশ্লেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি খোঁজার প্রচেষ্টা চলছে।

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, জননীতি প্রক্রিয়া হল এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সরকারের নীতি গৃহীত হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি যে সকল বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত তা হল, সরকারী উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সরকার প্রকৃতপক্ষে কি করতে চাইছে, সরকারের কাজ অর্থাৎ সরকার প্রকৃতপক্ষে কি করছে এবং ঐ কাজের পরিণাম অর্থাৎ সরকারকৃত ঐ কাজের ফলাফল এবং সমাজের উপর তার প্রভাব কি। জননীতি অতঃপর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি পরিণাম যা ভালো বা খারাপ নীতি গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে সরকারের দক্ষতা বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।

জননীতি প্রক্রিয়ার তিনটি অংশ রয়েছে—

(ক) বর্তমান তথা প্রচলিত অবস্থায় এবং নীতির মূল্যায়ন,

(খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, যার ভিত্তি হল কার্যকারিতা এবং দক্ষতা,

(গ) সমাজের উপর এই সকল সিদ্ধান্তের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং দায়িত্বের ক্ষেত্র নির্ধারণ।

সাধারণ ভাবে, নীতি প্রক্রিয়াটি ভিন্ন পরিস্থিতির সাপেক্ষে উপলব্ধি করতে হলে, চারটি তত্ত্বের উপর নির্ভর করা যেতে পারে—

(i) Rational actor model বা যৌক্তিক ক্রিয়ক আদর্শ : এই তত্ত্ব অনুযায়ী জনপছন্দ তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে মানুষের যুক্তিবোধই কাজ করে; এই তত্ত্বে অর্থনৈতিক মানুষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যে মানুষ উপযোগিতার নিরিখে বস্তুগত তৃপ্তির সন্ধানে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সম্পূর্ণ তথ্য লাভ না করলে যুক্তিবোধের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হয় না।

(ii) Incremental Model বা প্রান্তিক বৃদ্ধির আদর্শ : ১৯৫৯ সালে Lindblom তার Science of Muddling through নামক রচনায় প্রান্তিক বৃদ্ধির মাধ্যমে জননীতি গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর ভাবনা অনুসারে, অপর্যাপ্ত তথ্য এবং অপরিণত বোধের ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহীতারা স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে স্পষ্ট লক্ষ্য বা দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করবে এমন কোনো কথা নেই।

(iii) Bureaucratic Organizational Model বা আমলাতান্ত্রিক সংগঠন আদর্শ : এই ধরনের তাত্ত্বিক অবস্থানে বৃহৎ সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তের উপর মূল্যায়ন, অনুমান এবং আচরণ বিধির প্রভাব পরিমাপ করা হয়।

(iv) Belief System Model বা বিশ্বাস নির্ভর ব্যবস্থা আদর্শ : এই ধারণা অনুযায়ী বিশ্বাস এবং মতাদর্শের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং মনে করা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগুলি সাংগঠনিক রূপ পায় না যা ধারণা এবং মূল্যমান নির্ভর। জননীতি প্রক্রিয়ায় যে আদর্শ বা মডেলকেই ব্যবহার করা হোক না কেন, মূলতঃ যে সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা হয়, তা হল—কে, কি পাচ্ছে? কেন পাচ্ছে? এর ফলে রাজনীতিতে কি তারতম্য দেখা যাচ্ছে? বা সরকার কি ধরনের নীতি অনুসরণ করছে বা এ ধরনের নীতির ফলাফল কী?

জননীতির বিশ্লেষণ, অতঃপর 'how of Government' অর্থাৎ কী প্রক্রিয়ায় সরকার নীতি গ্রহণ করছে তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, সরকার কী করছে, তথা নীতির বিষয়বস্তু ও তার পরিণামের তুলনায় প্রক্রিয়াটি অধিক আলোকপ্রাপ্ত হয়। যে সকল চাহিদাগুলি বা পছন্দগুলি কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় গ্রন্থিকৃত হয় তার সমষ্টিগত প্রকাশের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর তুলনামুলকভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জননীতি প্রক্রিয়াকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হলে নাগরিকের চাহিদার প্রতি সরকার কতটা সংবেদনশীল সেই প্রশ্নের উত্তর যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই জনগণের প্রয়োজনের একটি তুল্যমুল্য ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যাবে।

৪.১২ নীতি বিশ্লেষণ পাঠের বিকাশ

নীতি সংক্রান্ত পাঠ মানবসভ্যতার প্রাচীন পর্ব থেকেই আনুষ্ঠানিক বা অ-আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত; এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সম্ভবতঃ গীতা, কোরাণ অথবা বাইবেল (Old Testament)-নীতি বিশ্লেষণের আংশিক প্রকাশ এই সকল গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। Barbara Tuchman তাঁর *The March of Folly* (1984) নামক রচনায় Trojar War

এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে সমসাময়িক নীতি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের উদাহরণ টেনেছিলেন। ম্যাকিয়াভেলির **The Prince**-এ ঐক্যবদ্ধ ইটালী গঠনের জন্য যে ভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল তা জননীতি বিশ্লেষণের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

রাজনীতির পাঠে বিভিন্ন সময় জননীতি বিশ্লেষণ ব্যক্ত বা সুপ্ত অবস্থায় স্থান পেলেও তা সুসংহত রূপ ধারণ করেছে অনেক পরে। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় রাজনীতির পাঠ বহু আগে থেকে শুরু হলেও সুসংহত জননীতি পাঠের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে। Daniel McCool মনে করেন যে, ১৯২২ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চার্লস মেরিয়ামের হাত ধরে জননীতি পাঠের শুরু, যিনি সরকারের প্রকৃত কার্যবিধির সঙ্গে রাজনীতির তত্ত্ব ও প্রয়োগকে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট হন অর্থাৎ ম্যাক্‌কুলের পরিভাষায় জননীতি পর্বের আলোচনার সূচনা করেন।

প্রকৃত অর্থে অবশ্য জননীতি পাঠের সুসংহত আত্মপ্রকাশ ঘটে বিংশ শতকের আমেরিকায়। নীতি পরিবর্তন ও নীতি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য জননীতি পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৫০-এর দশকের প্রারম্ভিক পর্বে নীতি বিজ্ঞানের অন্যতম প্রবক্তারা Lasswell, Daniel Lerner, Myres McDougal এবং Abraham Kaplan। নীতিবিজ্ঞানের সূচনা করেন। এই আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয় যখন ১৯৭০ এর দশকে বিভিন্ন জননীতির স্কুল গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালে জননীতি শাস্ত্রে যাদের প্রভাব বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তারা হলেন Harold Lasswell, William James, Charles Pierce এবং John Dewey।

জননীতি বিশ্লেষণ জনক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত হলেও অন্যান্য সংগঠনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের সময় ব্যবস্থা জ্ঞাপক বিশ্লেষণের সাপেক্ষে যেভাবে নীতি বিশ্লেষণ করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪.১৩ নীতি বিশ্লেষণ—একটি ধারণাভিত্তিক টীকা

বিভিন্ন নীতি পছন্দের মধ্য থেকে, যুক্তি এবং কৌশলগত মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক লাভের ভিত্তিতে নীতি বিশ্লেষণ করা হয়। প্রান্তিক ব্যয় এবং উপকারিতা প্রাপ্তির ভিত্তিতে পছন্দের যে তালিকা প্রস্তুত হয় তা নীতি বিশ্লেষণ হিসাবে পরিচিত। নীতি গ্রহণের সময়ে একটি ভারসাম্য পূর্ণ পছন্দ বা পছন্দক্রম সম্ভাব্য তালিকাগুলির থেকে নির্বাচন করার ভিত্তি হল নীতি বিশ্লেষণ, যা নীতি গঠনে সাহায্য করে। চূড়ান্ত পছন্দ সিদ্ধান্ত হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ রাজনীতির বিশ্লেষণের সাপেক্ষে করা হয়ে থাকে।

নীতি প্রক্রিয়া কতগুলি নীতিমানজ্ঞাপক অবস্থাকে অনুধাবন করবার চেষ্টা হয়—যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে পাবে, না প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে। যদি সরকার ছাত্রদের হাতে পৌঁছে দিতে চায়, তবে প্রত্যেক ছাত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য সরকারের কাছে থাকা প্রয়োজন। একটি পরিশুদ্ধ নীতি বিশ্লেষণে প্রান্তিক লাভের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে থাকে। কিন্তু কোনো বিশ্লেষণই পরিপূর্ণভাবে এইরূপে অর্থনৈতিক তথ্য দিতে পারে না। বাজারী সিদ্ধান্ত অতঃপর এই নীতি বিশ্লেষণের ভিত্তি হয়ে থাকে। নীতি বলতে যেহেতু রাষ্ট্র এবং রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে বোঝায়, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সেহেতু নীতি বিশ্লেষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকে।

প্রস্তাবিত নীতির পরিণাম আলোচনা ছাড়াও নীতি বিশ্লেষণ অপর যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে তা হল তুলনামূলক বিশ্লেষণে হাতিয়ার ব্যবহার করে কিভাবে বিকল্পনীতি গড়ে তোলা যায়। নীতি বিশ্লেষণের ভিত্তি

এরূপ নয় যে, X এর থেকে Y ভালো কিনা, বরং তার মৌলিক প্রভাব কি, নীতি বিশ্লেষণে তার উপরেই আলোকপাত করা হয়। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, বিভিন্ন পরিণামের কথা মাথায় রেখে X-এর থেকে Y আলো ভালো বলে সিদ্ধান্তে না এসে এই বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো, কারণ এটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিণাম, যা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দাবী করে। এককথায় বলা যায় যে, নীতি বিশ্লেষণ হল এমন একটি যৌক্তিক, কৌশলগত বিশ্লেষণাত্মক ক্রিয়া যেখানে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন এটি নয় যে, X ভালো না খারাপ, বরং বিবেচ্য বিষয় হল X-এর প্রান্তিক প্রভাব অথবা Y-এর নিরিখে X-এর প্রভাব। অতঃপর নীতি বিশ্লেষণ হল এমন একটি ক্রিয়া যার তত্ত্বগত অবস্থান প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল।

জননীতি গ্রহণ একটি কনভেয়ার বেল্টের মতো যেখানে মত প্রথম সমস্যা চিহ্নিত হয়, বিকল্প কর্মপ্রক্রিয়াগুলি বিবেচিত হয়, নীতি গৃহিত হয়, সংস্থার কর্মীদের দ্বারা সেই নীতি প্রযুক্ত হয়, নীতি মূল্যায়ন হয়, পরিবর্তিত হয় এবং সাফল্য বা ব্যর্থতার নিরিখে পরিত্যক্ত হয় (Lester and Stewart, 2000, 5)।

জননীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াগত ভাবেই গুণগত এবং সংখ্যাগত পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেমন case study, survey research, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি। সাধারণভাবে যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়, তা হল সমস্যাগুলিতে চিহ্নিত করা এবং মূল্যায়ণ করা। সমস্ত বিকল্পগুলিকে চিহ্নিত করা হতে পারে এবং তার ভিত্তিতে সর্বোৎকৃষ্ট নীতি প্রকল্প সম্বন্ধে সুপারিশ করা হতে পারে।

জননীতি বিশ্লেষণ যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে সাহায্য করে, তা হল বিভিন্ন নীতিগুলির মধ্যে লক্ষ্য পূরণে কোন নীতি সর্বোৎকৃষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে জননীতি বিশ্লেষণকে দুটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায় : নীতির বিশ্লেষণ এবং নীতির জন্য বিশ্লেষণ। নীতির বিশ্লেষণ বিশ্লেষণাত্মক, বর্ণনাত্মক, অর্থাৎ নীতিকে ব্যাখ্যা করা এবং তার বিকাশ বর্ণনা করা পর প্রথমোক্ত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। নীতির জন্য বিশ্লেষণ পরামর্শমূলক (Prescriptive) অর্থাৎ সেই ধরনের নীতি এবং প্রস্তাব গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত যা পরিণামসাপেক্ষ যেমন, সামাজিক কল্যাণ। আগ্রহ এবং বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। নীতি বিশ্লেষণ এবং কর্মসূচীর মুল্যায়ন সম্মিলিতভাবে নীতি পাঠের বিষয় বলে বিবেচিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে, নীতির বিশ্লেষণ শিক্ষণ সংক্রান্ত পাঠ, যা গবেষকদের আগ্রহের বিষয়, যার দ্বারা গবেষকগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট নীতির প্রভাব এবং উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে তার গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। বর্ণনাত্মক নীতি বিশ্লেষণ যেখানে নীতি প্রক্রিয়ার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে, পরামর্শমূলক বিশ্লেষণ পক্ষান্তরে নীতিগত প্রস্তাব ও বিকল্পগুলির বিশ্লেষণ করে। নীতি বিশ্লেষণ পদ্ধতিগত দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের; গুণগত ও সংখ্যাগত পরিমাপ পদ্ধতি সহ কেস স্টাডি, সার্ভে, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা নীতি বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে সমস্যা চিহ্নিত করা থেকে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে নীতি বিশ্লেষিত হয়ে থাকে; এই প্রক্রিয়া বিকল্প নীতিগুলোর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সর্বোৎকৃষ্ট নীতিটি নির্বাচনে সাহায্য করে থাকে।

নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী :

চিত্র-১

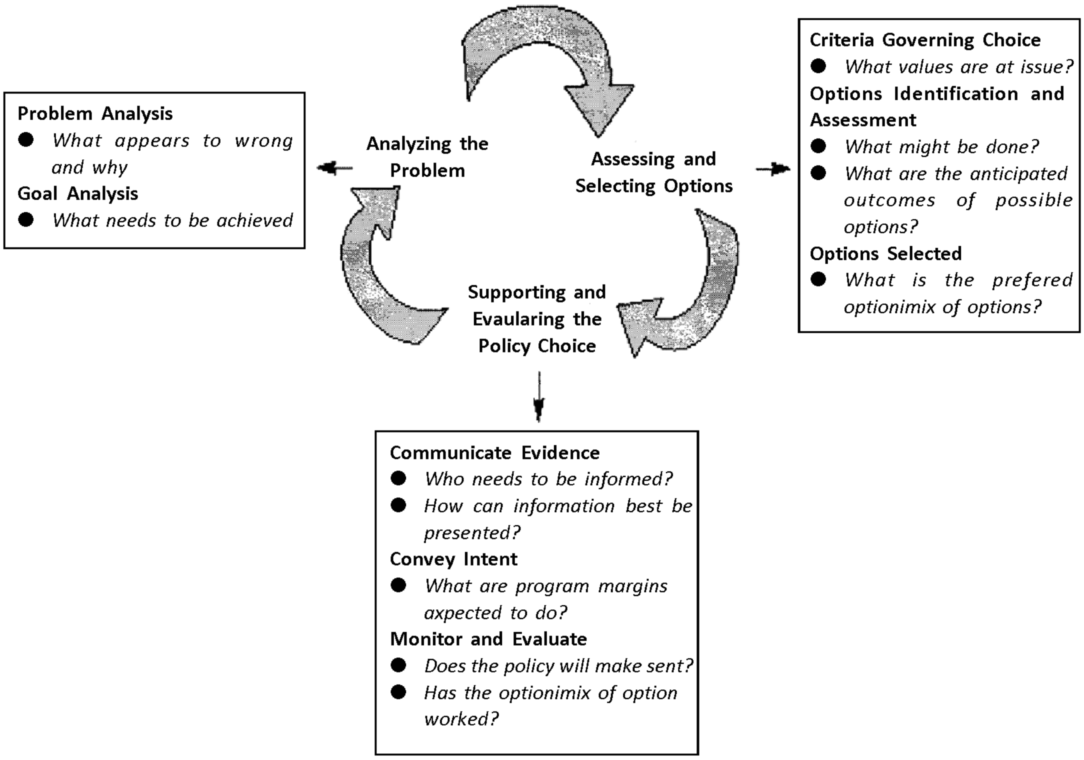
Analyzing the Problem
Assessing and Selecting Options
Supporting and Evaularing the Policy Choice

Problem Analysis
- *What appears to wrong and why*

Goal Analysis
- *What needs to be achieved*

Criteria Governing Choice
- *What values are at issue?*

Options Identification and Assessment
- *What might be done?*
- *What are the anticipated outcomes of possible options?*

Options Selected
- *What is the prefered optionimix of options?*

Communicate Evidence
- *Who needs to be informed?*
- *How can information best be presented?*

Convey Intent
- *What are program margins axpected to do?*

Monitor and Evaluate
- *Does the policy will make sent?*
- *Has the optionimix of option worked?*

চিত্র-২

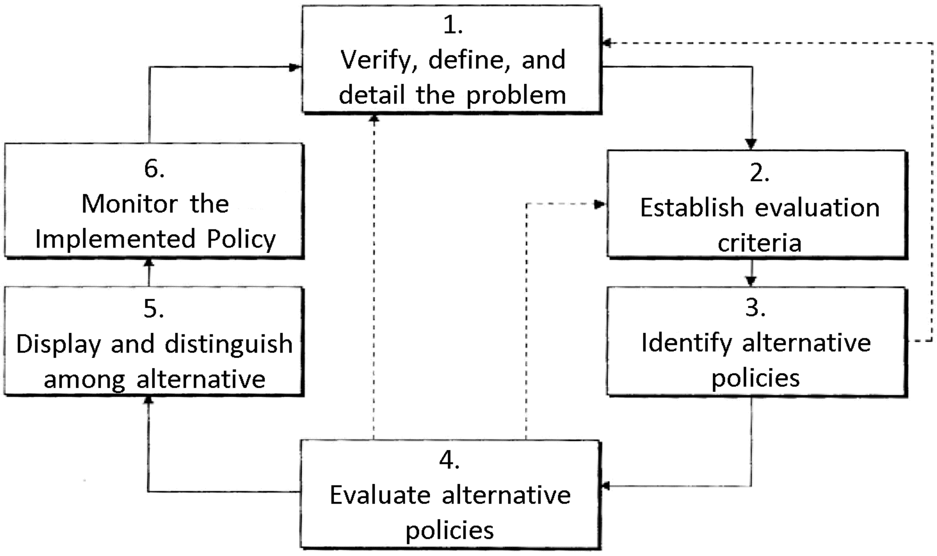
1.
Verify, define, and detail the problem
2.
Establish evaluation criteria
3.
Identify alternative policies
4.
Evaluate alternative policies
5.
Display and distinguish among alternative
6.
Monitor the Implemented Policy

চিত্র-৩

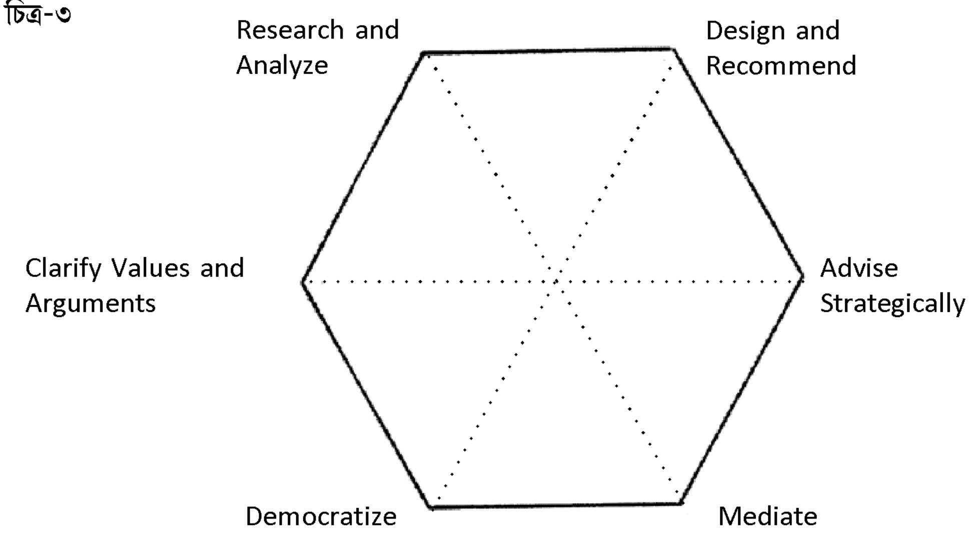

৪.১৩.১ নীতি বিশ্লেষণ অনুধাবনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি :

প্রশাসনিক গতিশীলতাকে অনুভব করাবার অন্যতম মাধ্যম হল প্রশাসনের প্রায়োগিক দিকের ওপর আলোকপাত করা। পরিস্থিতি, পরিবেশ, জাতীয় স্বার্থ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি, অভ্যন্তরীণ সমাজ ও রাজনীতির চাপ ও চাহিদা প্রভৃতির আলোকে যে জননীতি গৃহীত হয় তাই প্রশাসনে প্রাণ সঞ্চার করে। তথ্যসংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মূল্যায়ন ও পরিণাম বিশ্লেষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রশাসনের প্রধান প্রায়োগিক দিক বলে চিহ্নিত হতে পারে। জননীতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলিও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নীতি নির্ধারণে রাজনীতিবিদদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধান দ্বাররক্ষীর ভূমিকা পালন করে জনগণের চাহিদাকে সমর্থনের মাধ্যমে জননীতি প্রক্রিয়ায় সঞ্চালন করে। এই সঞ্চালনা একটি নীতিগত অবস্থানের পরিণাম। এই পরিণামকে ফলাফলে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে থাকে আইনসভা, বিভিন্ন কমিটি, পেশাদারী রাষ্ট্রকৃত্যক, এমনকি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থগোষ্ঠীগুলো। স্বার্থের সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এই জননীতি প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মুখ্য উপাদানগুলো হল—সমস্যা নির্বাচন, বিকল্পের সন্ধান, বিকল্পের মূল্যায়ন, বিকল্পের তুলনা, বিকল্প নির্বাচন, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত রূপায়ণ ও প্রয়োগ; এই উপাদানগুলো নিজেদের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবাহিত হয়, জননীতি সংক্রান্ত অবস্থানের ভিত্তিতে। জননীতি হল একটি ধারাবাহিক সামাজিক প্রক্রিয়া, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্য ধাবিত হয়।

নিয়ন্ত্রক সরকারি নীতি, বন্টনমূলক সরকারি নীতি ও পুনর্বন্টনমূলক সরকারি নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সরকার সমাজ, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের প্রচেষ্টা করে। বাণিজ্যনীতি, শিল্পীনীতি বা MRTP, FERA জাতীয় নিয়ন্ত্রণমূলক আইনগুলি নিয়ন্ত্রক সরকারি নীতি নলে পরিচিত হতে পারে। ভূমিসংস্কার, জলবন্টন, বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত নীতিগুলি বন্টনমূলক সরকারি নীতি হিসেবে খ্যাত। কর, বাজেট, শ্রমনীতি (বিশেষত মজুরি) সংক্রান্ত সরকারি নীতিগুলিকে পুনর্বন্টমূলক সরকারী নীতি বলা যেতে পারে।

মূলধন গঠনের জন্য কিছু জননীতি তথা সরকারি নীতি গ্রহণ করা হয়। অর্থনৈতিক পনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সরকারি নীতি গ্রহণ করা হয়। এই সরকারি নীতি গ্রহণের সময় আন্তর্জাতিক বাজার, অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের চাহিদা, দেশীয় অর্থভাণ্ডারের অবস্থা ও ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, প্রযুক্তির চাহিদা প্রভৃতি বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সময়, স্থান ও কাল বিশেষে সরকারি নীতির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়।

মূলধনের জন্য সরকারি নীতি গৃহীত হয়ে থাকে। শিল্পে বিনিয়োগ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, বিশেষ খাতে কর আরোপ বা মুকুব, ভরতুকির অবলুপ্তি, আমদানি-রপ্তানি নীতির সরলীকরণ, বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত, ব্যাঙ্ক, বীমা, দূরভাষ, পরিবহন, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি পুঁজিকে স্বাগত জানিয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির উপযুক্ত প্রতিযোগিতার সুচনা করা প্রভৃতি একবিংশের বিশ্ব বাণিজ্যের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সরকারি নীতি গৃহীত হয় চলেছে।

সরকারি নীতির সঙ্গে নৈতিক প্রশ্নও জড়িত থাকে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির চাহিদা অনুসারে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য স্বল্প সঞ্চয়ে সুদ হ্রাস করা হলেও সাধারণ মানুষের কথা মনে রেখে সুদের হার নির্ণয় করতে হয়, কারণ সেখানে সরকারের পক্ষে নৈতিক দায় অস্বীকার করা সম্ভব হয় না।

সরকারি নীতি যেমন কর্মসূচির নির্ধারক হতে পারে, তেমনি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সংগঠনেও সরকারি নীতি গৃহীত হতে পারে। সরকারি নীতি বিষয়ভিত্তিক হতে পারে, আবার পদ্ধতি নির্ধারকও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্যের সঙ্গে নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। বিষয়গত ও পদ্ধতিগত সরকারি নীতি পরস্পরের পরিপূরক।

সরকারি নীতি কীভাবে গৃহীত হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াগত তারতম্য ঘটাতে পারে। অভিজাত সরকারি নীতি, অর্থাৎ সমাজের ওপরের অংশের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা গৃহীত সরকারি নীতি সমাজের জনগণের ওপর আরোপিত হয়। এই ধরনের সরকারি নীতি স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী। গোষ্ঠীনীতি তথা স্বার্থগোষ্ঠী বা বিভিন্ন ধরনের লবির দ্বারা প্রভাবিত সরকারি নীতি নিয়ন্ত্রণের বা নির্ধারণের কাজ করে। এই ধরণের সরকারি নীতি আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। ব্যবস্থাপক সরকারি নীতি তথ্যনির্ভর ও একটি ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণ ও পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে। প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি নীতি আনুষ্ঠানিকতার পরিচায়ক। সাংগঠনিক কাঠামো ও কাজ, সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিভাগীয় কর্মসম্পাদন, জনকৃত্যকের আচরণবিধি সংক্রান্ত সরকারি নীতি এই পর্যায়ভুক্ত। নয়া প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি নীতি উপব্যবস্থাকে স্পর্শ করে। নয়া প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি নীতিতে বন্টনমূলক, পুনর্বন্টনমূলক ও নিয়ন্ত্রক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, তথা ব্যক্তি, মতাদর্শ যেমন নীতির বিষয় হয়, তেমনি নীতিভঙ্গে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা প্রয়োজনে সুনাগরিকের জন্য পুরস্কারের ইঙ্গিত বহন করে নয়া প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের বন্টনও এই প্রক্রিয়ায় বিবেচ্য বিষয়।

৪.১৩.২ নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন মডেল

নীতি ও লক্ষ্যের মধ্যে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিকল্প নীতিটি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য নীতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। নীতি বিশ্লেষণকে দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে—**নীতির বিশ্লেষণ** এবং **নীতির জন্য বিশ্লেষণ**। **নীতির বিশ্লেষণ** বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনাত্মক। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া নীতি ব্যাখ্যা করে ও তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করে। **নীতির জন্য বিশ্লেষণ** নির্দেশকে ভূমিকা পালন করে, যা

নীতি প্রণয়নের পথ দেখায় এবং নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব দেয় (যেমন, সামাজিক কল্যাণ কিভাবে উন্নততর করা যায়)। নীতি বিশ্লেষণের আগ্রহ ও উদ্দেশ্য ঠিক করে যে কোন ধরনের বিশ্লেষণ করা হবে। নীতি বিশ্লেষণ ও প্রকল্প মূল্যায়ন যৌথভাবে নীতি পাঠ হিসেবে বিবেচিত হয়।

নীতির জন্য বিশ্লেষণ নীতি বিকাশের প্রকৃত ধারা নিয়ে গবেষণার ইঙ্গিত দেয়, যা আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরে নীতি রূপায়ণে প্রযুক্ত হয়। **নীতির বিশ্লেষণ** পঠন-পাঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা গবেষকদের উদ্বুদ্ধ করে, কিভাবে নির্দিষ্ট সময়ে একটি নীতি বিকশিত হয় ও তার প্রভাব কি, তা বুঝতে।

নীতি বিশ্লেষণ, অতএব, বর্ণনাত্মক বা নির্দেশক হতে পারে। বর্ণনাত্মক নীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া নীতির বিকাশ প্রক্রিয়া বর্ণনা করে। নির্দেশক নীতি বিশ্লেষণ নীতি প্রস্তাব করে এবং বিকল্প নিয়ে আলোচনা করে। নীতিগ্রহণ ও প্রয়োগের পূর্বে নীতি বিশ্লেষণ করলে যে উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়ন করা হয়, তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। নীতি বিকাশের বিশ্লেষণ পর্বে প্রস্তাবিত নীতির ত্রুটিগুলো ধরা পড়ে এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ওপরে এর সম্ভাব্য প্রভাব বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে কোনো একটি নীতি সঠিকভাবে সমাজের উপকারিতায় লাগলেও কোনো একটি গোষ্ঠীর উপকারে না লাগতে পারে—এই বিষয়টির তুল্যমূল্য আলোচনাই নীতি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে নীতি বিশ্লেষণের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রণিধানযোগ্য—বৈশ্লেষিক দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি প্রক্রিয়া ও নীতি রূপান্তর দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈশ্লেষিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত সমস্যা ও তার সমাধানের ওপর আলোকপাত করে; আণবিক পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কৌশলগত ভাবনার ধারক। নীতির কৌশলগত অবস্থান ও অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা এই দৃষ্টিভঙ্গির মুল বিষয়বস্তু। যদি দেখা যায় যে অর্থনৈতিক বা কৌশলগত কারণে নীতিটি গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে নীতিটি বাতিল করে বিকল্প নীতির কথা ভাবা হয়।

নীতি প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং গ্রাহকদের মতামতকে গ্রহণ করে। আনবিক এককের গন্ডী ছাড়িয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে ব্যবহার করে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যার ব্যাখ্যা করে। নীতি প্রক্রিয়ায় গ্রাহকদের ভূমিকা ও প্রভাব ব্যাখ্যা করার জন্য প্রক্রিয়া ও উপায়গুলোকে বিশ্লেষণ করা এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য। কিছু গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও প্রভাবের আপেক্ষিক পরিবর্তন সমস্যার সমাধান সূত্র নির্ণয়ে সাহায্য করে, যা মুলত রাজনীতিকেন্দ্রীক বলে এই দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে। প্রস্তাবিত নীতিটি রাজনীতিতে কতক্ষণ টিকে থাকবে তা বিশ্লেষণ করার কথা বলে এই দৃষ্টিভঙ্গি।

নীতি রূপান্তর দৃষ্টিভঙ্গি একটি ব্যবস্থাপক ও প্রেক্ষিত কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি। বৃহত্তর এককে এই দৃষ্টিভঙ্গি নীতি বিশ্লেষণের কথা বলে। কি ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উপাদান নীতি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, অর্থাৎ কি প্রেক্ষাপটে নীতি প্রণীত হয়ে থাকে তার বিশ্লেষণের কথা বলে এই দৃষ্টিভঙ্গি। কাঠামোগত উপাদান সমস্যার ইঙ্গিত দিলে কাঠামোকেই বদলে ফেলা দরকার বলে এই দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে। প্রস্তাবিত নীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার ওপর এই দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করে; নীতি বিকাশ প্রক্রিয়ায় এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ অবদানের সাক্ষর রাখে। নীতি বিকাশ প্রক্রিয়ায় কাঠামোগত উপাদানগুলো এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

জননীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ করার জন্য অনেকগুলো মডেল বিকশিত হয়েছে। এই সকল মডেলগুলো ব্যবহার করে নীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বিশ্লেষকগণ আলোচনা, ব্যাখ্যা ও পূর্বানুমান করে থাকেন।

প্রাতিষ্ঠানিক মডেল (Institutional Model) : এই মডেল সাবেক সরকারি সংগঠনের ওপর আলোকপাত করে এবং বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনাকে নিয়ে আলোচনা করে। সাংবিধানিক ধারা, প্রশাসনিক ও সাধারণ আইন, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এই মডেল।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জননীতিকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে অবলোকন করে থাকে—বৈধতা, সার্বজনীনতা এবং বল প্রয়োগ। সাবেক নিয়ম অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থানা, বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর মধ্যে সংযোগের ওপর গুরুত্ব দিত না এবং জননীতির বিষয় তেমন গুরুত্ব পেত না। জননীতির ওপরে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব একটি অভিজ্ঞতাবাদী প্রশ্ন। উল্লেখ্য যে, কাঠামো ও নীতি উভয়েই সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

নয়া প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি : ভিন্ন রূপে জননীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানকে স্বতন্ত্র সত্তায় স্বীকার করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ও বিভিন্ন নীতি এলাকার মধ্যে অথবা বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে জননীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ সাধারণভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রথমদিকে নয়া প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব বা উত্থানের ওপরে আলোকপাত করত, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন এবং বিকাশও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

প্রক্রিয়া মডেল (Process Model) : নীতি প্রণয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যা কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে।

- সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সরকারের কাজের জন্য দাবি;
- আলোচ্য বিষয়সূচী নির্ধারণ;
- বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী কর্তৃক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব সূত্রবদ্ধকরণ (যেমন, আইন বিভাগীয় কমিটি, চিন্তার ভাঁড়ার সমূহ বা স্বার্থগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রস্তাব সূত্রবদ্ধকরণ);
- নীতি নির্বাচন ও আইনে রূপায়ন, যা নীতিকে বৈধতা প্রদান করা বলে অভিহিত হয়;
- নির্বাচিত নীতির প্রয়োগ;
- নীতি মূল্যায়ন।

এই প্রক্রিয়া মডেলটি অবশ্য অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট বলে সমালোচিত হয়েছে। বাস্তবে নীতি প্রক্রিয়া যে সকল ধাপগুলোকেই পরপর অতিক্রম করবে, তা নাও হতে পারে। এই মডেল বহু উপাদানকে নীতি প্রণয়নের প্রেক্ষাপটে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না বা পরিস্থিতির জটিলতাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না।

জনশাসনকে সরকারি নীতির সাপেক্ষে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টায় প্রথম সমালোচনাটি আসে হারবার্ট সাইমনের বক্তব্য থেকে। তাঁর মতে সরকারি নীতি নয়, সরকারি নীতি প্রণয়নকারীদের আচরণ এবং পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে যে কোনো সরকারি নীতিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রশাসনিক আচরণবিধি যে কোনো সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে বলে তিনি মনে করেন।

১৯৬০-এর দশকে সাইমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩টি আদর্শকে তুলে ধরেন—

(১) অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Non-programmed decision making), যার ভিত্তি হল দূরদর্শিতা, বিবেচনা, অন্তর্দৃষ্টি এবং এরকম যুক্তি বহির্ভূত কিছু বিষয়।

(২) বিশুদ্ধ ও সর্বাধিক যুক্তিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Pure-rationality optimal decision making)

(৩) তৃপ্তিদায়ক সিদ্ধান্ত (Satisficing decision making)

১৯৫৯ সালে Charles Lindblom, নীতি রূপায়ণের দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। একটি তত্ত্বগত তথা যুক্তিসিদ্ধ সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি (Rational Comprehensive Approach) এবং অপরটি ক্রমোন্নত পর্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা দরাদরির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Incremental steps)।

Rational Comprehensive Approach এর অপর নাম Rational Deductive Models of Decision Making। কোনো সরকারি নীতিকেই চূড়ান্ত যুক্তিসিদ্ধ (absolute rational) বলা যায় না, এ ব্যাপারটা খুব আপেক্ষিক, কারণ সময়, স্থান, কাল, নীতিপ্রণেতা বিশেষ সরকারি নীতি পরিবর্তিত হয়।

যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Rational Deductive Models of Decision Making) : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাত্ত্বিক হারবার্ট সাইমন ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *Administrative Behaviour* গ্রন্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যুক্তিসিদ্ধ মডেলের মধ্যে দিয়ে প্রশাসনিক দক্ষতার বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সাইমনের মতে, এই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে কোনো এক অবস্থায় প্রশাসক তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে বিচার করবেন এবং তাঁর সামনে যে সকল বিকল্প কার্যপদ্ধতি আছে সেগুলির ফলাফল বিচার করবেন এবং যেটি সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক ও যুক্তিসঙ্গত মনে হবে তাই তিনি সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করবেন। যুক্তিসিদ্ধ মডেল সর্বাধিক সামাজিক লাভ অর্জন করতে চায়।

সাইমনের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়গুলি হল—

১. অবস্থা বা পরিবেশের বৌদ্ধিক বিচার : সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় হল পরিবেশ বা অবস্থার বিশ্লেষণ পূর্বক তথ্য সংগ্রহ, সম্যক সমস্যা ও সুযোগগুলো চিহ্নিত করে তার যথাযোগ্য বিশ্লেষণ।

২. বিকল্প কর্মপন্থার বিচার : পরিবেশ বা অবস্থার কথা বিবেচনা করে প্রশাসক বিভিন্ন কর্মপন্থা ভেবে দেখবেন এবং প্রত্যেকটি কর্মপন্থা থেকে উদ্ভুত ফলাফল লক্ষ্য করবেন।

৩. প্রত্যেকটি গুণাগুণ বা সুবিধা-অসুবিধা বিচার করতে হবে।

৪. প্রশাসক প্রাসঙ্গিক মূল্যমানের নিরিখে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি প্রদানকারী কর্মপন্থাটি গ্রহণ করবেন এবং পরিরাম বিচার করে বিকল্প নীতি বিবেচনা করবেন এবং এটিই হবে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সাইমনের এই যুক্তিসিদ্ধ সুসংহত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশাসক একটি নীতি সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই লক্ষ্য নির্ধারিত হয় আপেক্ষিক গুরুত্বের পূর্বাপর অনুসারে।

সাইমনের এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেলও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সমালোচকদের মতে—

১. যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক উপাদান হল প্রাসঙ্গিক তথ্য, অর্থাৎ এটি বিভিন্ন চাহিদা, কী সুবিধা-অসুবিধা বা চাওয়া-পাওয়া এই আপেক্ষিক জিনিসগুলির উপর নির্ভর করে।

২. যুক্তিসিদ্ধ নীতি গ্রহণ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যাশা করা হয় যে নীতি গ্রহীতা সময় বিষয়কে একই সঙ্গে বিবেচনাধীনে রাখবে, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বা বহুজাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমন্বয়সাধনজনিত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

৩. বিভিন্ন সমস্যা, লক্ষ্য এবং প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

৪. ব্যক্তিগত চাহিদা, প্রতিশ্রুতি, দায়বদ্ধতা এবং ভাবনার সীমাবদ্ধতা যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।

৫. প্রত্যেক প্রশাসনিক এককের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকে, যা কালক্রমে আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্কের কিছু প্রস্তুতিগত পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

৬. ব্যক্তিগত প্রশাসকের মনোভাব যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। অতঃপর নীতি গ্রহীতা সর্বোত্তম নয়, তৃপ্তিদায়ক নীতি গ্রহণ করে।

সাইমনের মডেল নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক আবেদনযুক্ত। এই তত্ত্ব জনপ্রশাসনের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। ড্যুইট ওয়ালডো সাইমনের তত্ত্বকে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে একাধারে বৈপ্লবিক এবং রক্ষণশীল বলে অভিহিত করেছেন।

একইভাবে Wiktorowicz and Deber তাঁদের গবেষণা 'Regulating biotechnology : a rational politics model of policy development'-এর মাধ্যমে নীতি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করেন। এঁরা যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে যে পর্যায়গুলির ওপর আলোকপাত করেন তা হল—

(১) তথ্যের সুসংহত সংগঠন ও বিশ্লেষণ,

(২) প্রতিটি বিকল্পের যথাযথ পরিণাম বিচার,

(৩) প্রতিটি সম্ভাব্য পরিণামের বাস্তবতা বিশ্লেষণ,

(৪) প্রতিটি পরিণামে মূল্য বা উপযোগিতা বিচার।

Wiktorowicz and Deber-এর দৃষ্টিভঙ্গি সাইমনের অনুরূপ এবং তাঁরা মনে করেন যে যুক্তিসিদ্ধ মডেল ঘটনা বা তথ্য নির্ভর এবং একমাত্র সর্বশেষ পর্যায়ে এই মডেল মূল্য বিশ্লেষণ করে থাকে।

Patton এবং Sawicki যুক্তিসিদ্ধ মডেলকে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন—

(১) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পূর্বক সমস্যার সংজ্ঞায়ন,

(২) প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত কখন বা কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হবে। যাতে সমস্যার যথাসম্ভব সমাধান সম্ভব হয় তার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ,

(৩) সমস্যা সমাধানকল্পে সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর তালিকা নির্মাণ,

(৪) বিকল্পগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে তুলনামূলক আলোচনা করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা,

(৫) প্রতিটি বিকল্পের মূল্যায়ন সাপেক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্প নির্বাচন,

(৬) চূড়ান্ত নীতি গ্রহণ করা।

যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তগ্রহণ মডেল সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য এই মডেল সমালোচনার উর্দ্ধে নয়; অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক মডেল হিসেবে এটি সমালোচিত হয়েছে। এই মডেল অত্যন্ত কঠিন, কারণ সামাজিক সমস্যাগুলো যথেষ্ট জটিল ও অস্পষ্ট। রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতা সমস্যাগুলোর পরস্পর নির্ভরতার সাপেক্ষে এই মডেলের অতি সরলীকরণ অপ্রয়োগযোগ্য ও অবাস্তব।

Thomas Dye যুক্তিসিদ্ধ মডেলকে প্রশংসা করে বলেছেন যে, এই মডেল আধুনিক সমাজের যুক্তি সিদ্ধতার প্রেক্ষিতে একটি উত্তম দৃষ্টিভঙ্গী উপহার দেয়। যুক্তিসিদ্ধ নীতি বিশ্লেষণ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোন বিষয়গুলোকে উপলব্ধির স্তরে আনা উচিৎ, সে সম্বন্ধে একটি ধারণা ব্যক্ত করে। সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়াদি যা নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অবশ্য বিবেচ্য তা চিহ্নিত করে এই যুক্তিসিদ্ধ নীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পরিবেশগত নীতি গ্রহণের জন্য যে সকল মাপকাঠিকে বিশ্লেষণ করা হয় তা হল—

- পরিবেশের প্রভাব—যথা, জৈব বৈচিত্র্য, জলের গুণগত মান, বায়ুর গুণগত মান, বসবাসকারী প্রাণী বৈচিত্র ইত্যাদি।
- অর্থনৈতিক দক্ষতা—ব্যয় ও উপাকারিতার তুলমূল্য আলোচনা;
- বন্টনে সমতা—বিভিন্ন জনপরিমণ্ডলে কিভাবে নীতির সুবিধাগুলো বন্টিত হবে এবং জায়গা, গোষ্ঠী, উপার্জন এবং পেশার ভিত্তিতে কিভাবে এগুলো প্রভাব বিস্তার করবে তা বিশ্লেষণ;
- সামাজিক/সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা—বর্তমান সামাজিক রীতি বা সাংস্কৃতিক মূল্যমানের প্রেক্ষিতে নীতির গ্রহণযোগ্যতা বা বিরোধীতার সম্ভাবনা বিশ্লেষণ;
- প্রয়োগগত বাস্তবতা—নীতি কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিশ্লেষণ;
- আইন সিদ্ধতা—প্রচলিত আইনী কাঠামোর সঙ্গে নীতির সামঞ্জস্য বনাম নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ;
- অনিশ্চয়তা—নীতির প্রভাব পূর্বাহ্নেই কতদূর পর্যন্ত পরিমাপযোগ্য তা বিশ্লেষণের ওপর নীতি প্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে।

কয়েকটি মাপকাঠি, যেমন অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত, সহজে পরিমাপযোগ্য হলেও, কয়েকটি, যেমন পরিবেশগত বিষয়াদি সহজে অনুধাবনযোগ্য নাও হতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল নীতিগত লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে নীতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন; কিন্তু পক্ষান্তরে যদি সহজে অনুধাবনযোগ্য মাপকাঠিগুলোর ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্লেষণে পক্ষপাতদুষ্টতা অনিবার্য।

যুক্তিসিদ্ধ মডেলকে ওয়েবারিও মডেলও বলা হয়ে থাকে। কারণ জার্মান সমাজতাত্ত্বিক Max Weber জননীতি বিশ্লেষণে যুক্তিসিদ্ধ প্রক্রিয়াকেই ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন। যুক্তিসিদ্ধ মডেল বিভিন্ন নীতি বিকল্পের মধ্যে থেকে মোট মুল্যলাভের সাপেক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট নীতিটি বেছে নেয়। যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ব রাজনীতি ও নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে আত্মস্বার্থ সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্বন্ধে একটি উন্নততর ধারণার উপস্থাপনা করে।

গোষ্ঠী মডেল

রাজনীতির গোষ্ঠী তত্ত্ব অনুযায়ী জননীতি হল গোষ্ঠীসংগ্রামের পরিণাম। সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংঘাতপূর্ণ স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সমন্বয় সাধন করাই হল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা। রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও মিথস্ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীতত্ত্ব গড়ে ওঠে। একটি গোষ্ঠী তাদের সাধারণ স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে অপর গোষ্ঠী থেকে নিজের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। গোষ্ঠীগুলো যখন সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেদের দাবিদাওয়া পেশ করে। তখন উক্ত গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক স্বার্থ গোষ্ঠী বলা হয়। এই সকল গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে গোষ্ঠী সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালি হয়, নীতিগ্রহণে তার ভূমিকা থাকে সর্বাধিক। গোষ্ঠীতত্ত্ব অনুযায়ী নীতিগ্রহণ ব্যবস্থাকে নিজের অনুকূলে প্রবাহিত করতে হলে গোষ্ঠীকে সিদ্ধান্ত গ্রহীতার কাছে সাফল্যের সঙ্গে নিজের চাহিদাকে পৌঁছে দিতে হবে। চাপ সৃষ্টি গোষ্ঠীগুলো অনানুষ্ঠানিকভাবে নীতিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করলেও স্বার্থগোষ্ঠীগুলো এই কাজ করে থাকে আনুষ্ঠানিকভাবে। গোষ্ঠীগুলো প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে সিদ্ধান্ত বা নীতিগ্রহণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও উল্লেখ্য যে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সবসময়েই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে পদ্ধতিগত দিক থেকে রাজনীতি ও নীতিগ্রহণকে কেবলমাত্র গোষ্ঠীস্বার্থ ও সংঘাতের সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা সঠিক নয়; অন্যান্য অনেকগুলো বিষয়, যেমন মতাদর্শ, ভাবনা বা প্রতিষ্ঠান নীতির বিকাশকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে থাকে।

অভিজাত মডেল

এই মডেলের সার্থকগণ মনে করেন যে সমাজে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ রক্ষা করেই নীতি রূপায়িত হয়, অর্থাৎ নীতি কখনওই জনগণের চাহিদার প্রতিফলন নয়। নীতিগত প্রশ্নে অভিজাতরা জনগণের মতামতকে প্রভাবিত করে, জনগণের মতামতের আলোকে অভিজাতদের মতামত তৈরি হয় না।

হিংসা, দমন-পীড়ন, জনগণের বিশৃঙ্খল আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাতরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং এরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলায় অভিজাত ও জনগণের মধ্যে মতের বিনিময় হয় এবং এরই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাধান্যকারী শ্রেণি তথা অভিজাতরা পরিস্থিতি ও পরিবেশকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ব্যাখ্যা করে নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থ বা মতের অনুকূলে পরিচালিত করে থাকে। দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়েতেও অভিজাতরা নিজেদের ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়ে নীতিগ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

অভিজাত তত্ত্ব অনুযায়ী, অতঃপর, জননীতি হল শাসকগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও পছন্দের প্রতিফলন।

অধ্যাপক টমাস ডাই এবং হারমন জেগলার অভিজাত তত্ত্বের একটি সারাংশ উপস্থাপিত করেছেন।

(১) সমাজ দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত—একটি গোষ্ঠীর হাতে প্রভূত ক্ষমতা ও অপরটি ক্ষমতাহীন।

(২) কতিপয় ব্যক্তি যারা শাসন করেন, তারা শাসিতের মত নয়। সমাজের আর্থসামাজিক স্তরের অসম অবস্থান থেকেই উদ্ভূত হয় অভিজাত গোষ্ঠী।

(৩) যারা অভিজাত নয়, তাদের অভিজাতদের অবস্থানে উত্তোরণ ধীরগতিপ্রাপ্ত হয়, যাতে স্থায়িত্ব বজায় থাকেও বিপ্লব না হয়। অভিজাত ভাবনার সঙ্গে সহমত না হলে এই উত্তোরণ হয় না।

(৪) সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক মুল্যবোধ সম্বন্ধে সহমত পোষণের মাধ্যমে অভিজাতরা প্রচলিত ব্যবস্থাকে রক্ষা করে চলে।

(৫) জননীতি জনগণের চাহিদার নয়, অভিজাতদের মূল্যবোধের প্রতিফলন।

ছয় পর্যায় মডেল

১. সমস্যার পরীক্ষা, সংজ্ঞায়ন ও বিস্তৃতকরণ

২. মুল্যায়নের মাপকাঠি নির্ণয়

৩. বিকল্প নীতি চিহ্নিতকরণ

৪. বিকল্প নীতি মূল্যায়ন

৫. বিকল্প নীতিগুলির প্রকাশ ও পৃথকীকরণ

৬. নীতি প্রয়োগের ওপর নজর প্রদান।

নীচের চিত্রটির সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়।

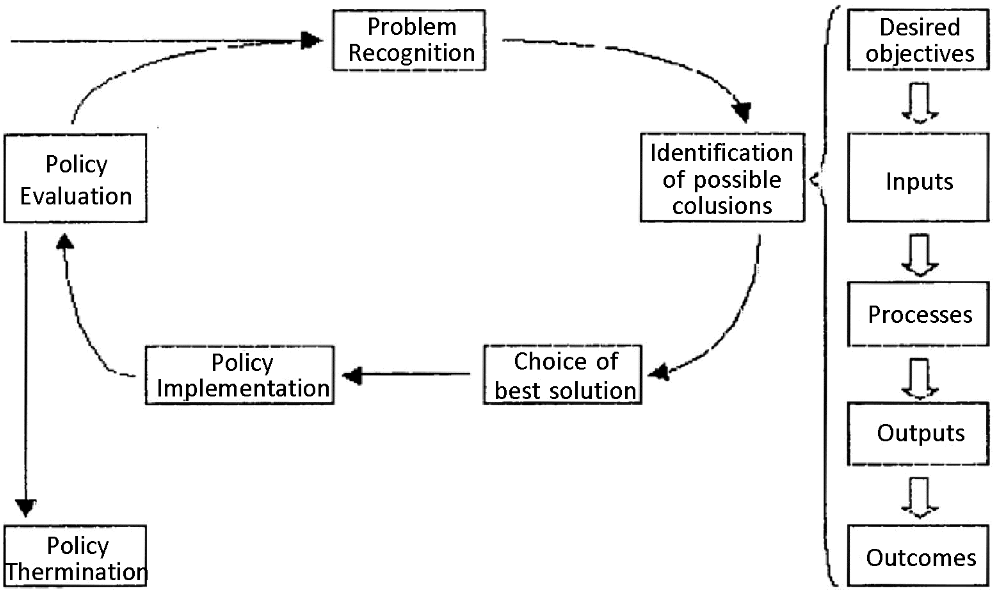
Problem Recognition
Desired objectives
Policy Evaluation
Identification of possible colusions
Inputs
Processes
Policy Implementation
Choice of best solution
Outputs
Policy Thermination
Outcomes

সাধারণভাবে নীতি বিশ্লেষণকে নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

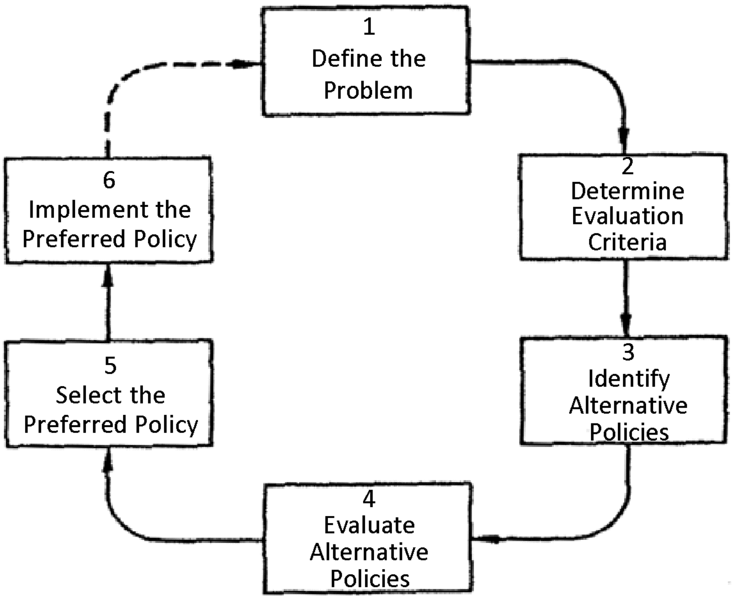
1
Define the Problem
2
Determine Evaluation Criteria
3
Identify Alternative Policies
4
Evaluate Alternative Policies
5
Select the Preferred Policy
6
Implement the Preferred Policy

নীতি বিশ্লেষণ অতঃপর যে সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে তা হল—

(১) নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি সীমিত অনুসন্ধান সংগ্রহ নির্মাণ;

(২) সীমিত বিকল্পের অনুসন্ধান, যা গ্রাহকের মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপিত হবে;

(৩) নির্দেশিকা তৈরি, নীতিসংক্রান্ত কাগজ প্রস্তুত ও আইনের খসড়া নির্মাণ;

(৪) একজন নির্দিষ্ট গ্রাহক, তিনি আধিকারিক, নির্বাচিত সদস্য, সরকারি স্বার্থগোষ্ঠী, প্রতিবেশি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যাইহোক না কেন, তার একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যাকে গুরুত্ব প্রদান;

(৫) সমস্যার অভিমুখের বিকল্প প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা;

(৬) সময় নির্দেশিকা, যা নির্বাচিত জনআধিকারিকদের দরুণ ও অন্যান্য অনিশ্চয়তার কারণে পরিবর্তিত হতে পারে, তা স্মরণে রাখা;

(৭) কাজের সম্পূর্ণতার জন্য একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ;

পর্যায়ক্রমিক বা প্রান্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Incremental or marginal and disjointed varieties)

হারবার্ট সাইমন প্রবর্তিত যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মডেল প্রশাসনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে। যে কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা সময় অপচয় এবং সংবাদ সংক্রান্ত বা

নীতিগত বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি করে। Charles Lindblom (১৯৫৯)-এর মতে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেলে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং তথ্যের উৎস সম্পর্কে যে অনুমান করা হয় তা সত্য নয় এবং সীমিত সময় ও সম্পদের দরুণ যুক্তিসঙ্গত নীতি নির্ধারণ করা সবসময় সম্ভব নয়। এইজন্য Lindblom 'The successive limited comparisons or branch technique'-এর কথা বলেছেন।

Lindblom-এর মতে নীতি রচয়িতারা সর্বদাই গৃহীত কার্যসূচি এবং বাজেট থেকে শুরু করে তার সঙ্গে নতুন কর্মসূচি ও নীতি যোগ করে। সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে কার্যত যা হয়, তা হল প্রান্তিক বৃদ্ধি অর্থাৎ কিছু কিছু সংশোধন করে অতীত কার্যাবলীই চলতে থাকে। প্রান্তিক বৃদ্ধির বা Incrementalism-এর ধারণা অনুসারে প্রশাসকেরা ভবিষ্যৎ নীতি নির্বাচনে অতীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়।

পর্যায়ক্রমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Incrementalism) ক্রমবিবর্তনের মাধ্যম :

সামাজিক পরিবর্তনের কথা বলে। এই পদ্ধতিতে সর্বপ্রকার বিকল্পকে বিবেচনার মধ্যে আনা হয় না। প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পগুলির বৈধতাকে স্বীকার করে নিয়ে পূর্ববর্তী মঞ্জুরীকৃত বাজেটে কিছু অর্থ সংযোগ করে ক্রমবিবর্তনের সুপারিশ করে এই পদ্ধতি।

পর্যায়ক্রমিক অথবা প্রান্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের (Incremental or marginal model of decision making) প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে Charles Lindblom বলেন যে, বাস্তবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার বে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয় বাস্তবে এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়; তিনি বলেন যে, প্রান্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিতে প্রশাসক সর্বোত্তম প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য ধাবিত হন না, বরং কতকগুলো খণ্ডে ক্ষুদ্র পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে পরিবর্তনের কথা ভাবেন। কিছু সীমিত ঘটনা পরম্পরার তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সেই মুহূর্তে হাতের কাছে পাওয়া যাবে এমন একটি পছন্দের তালিকা থেকে এমন সমঝোতাপূর্ণ নীতি নেওয়া যেতে পারে, যাতে সমস্ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরাই সন্তুষ্ট হন। পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন এই পদ্ধতির লক্ষ্য হওয়ায় সব সময় সিদ্ধান্ত স্থান-কাল নির্বিশেষে একরূপী ও সুসমন্বিত হয় না।

Lindblom-এর মতে, প্রান্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির দুটি মুখ্য সুবিধা আছে। সিদ্ধান্ত গ্রহীতা ছোটো পর্যায়ে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন বলে বড় ভুল বা বৃহৎ মাপের রদবদলের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই পদ্ধতি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কারণ এই পদ্ধতি জনসমর্থন ও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা জনগণের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। Lindblom উল্লেখ করেন যে, বিদগ্ধ তাত্ত্বিকরা তাঁর তত্ত্বকে অবৈজ্ঞানিক ও অসঙ্গত বলতে পারেন। একথাও সত্যি যে, এই পদ্ধতি সর্বপ্রকার বিকল্পগুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতে অসমর্থ। কিন্তু তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই পদ্ধতি সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ এই পদ্ধতিতে দীর্ঘসূত্রতা নেই বা সুদুর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হয় না এবং এই পদ্ধতি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। পর্যায়ক্রমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি সরকারি নীতি গ্রহণের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা এবং সরকারি নীতি রূপায়ণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

Lindblom প্রান্তিক বৃদ্ধি (Marginal Incrementalism) এবং পক্ষপাতিত্বমূলক পারস্পরিক সমঝোতা

(Partisan mutual adjustment) এই দুই ধারণার সাহায্যে সরকারের প্রকৃত নীতি নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, এক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় সরকারি নীতির সীমিত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, বিশেষ অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমঝোতার ওপর জোর দেওয়া হয় Lindblom-এর এই মডেলে বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্বার্থ ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক সমন্বয়হীন সমঝোতা হিসেবে নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দেখা যায়। আর এই কারণেই এটি বিচ্ছিন্নতাপূর্ণ বৃদ্ধির রূপ গ্রহণ করে।

Lindblom-এর এই প্রান্তিক বৃদ্ধির ধারণা সাইমনের যুক্তিসঙ্গত মডেলের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই প্রান্তিক বৃদ্ধির ধারণার সমালোচনা করে ড্রর (Dror) বলেছেন নতুন পরিস্থিতিতে উত্তম নীতি নির্ধারণের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই এবং প্রান্তিক বৃদ্ধির ধারণা মূলত স্থিতিশীলমুখী। যখন অতীত নীতির ফলাফল অসন্তোষজনক হয়ে পড়ে, তখন এই মডেল ভবিষ্যৎ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগে না। কারণ প্রান্তিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ভবিষ্যতে কোনো উত্তম ফলালাভ করা যায় না।

সরকার বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এই পদ্ধতি যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। কারণ এই পদ্ধতি স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী। এই পদ্ধতি যেভাবে ক্রমান্বয়ে বিকাশের কথা বলে, তা কখনই দ্রুত পরিবর্তনের অনুকূল হতে পারে না।

সংশ্লেষক পদ্ধতিতে জননীতি গ্রহণ (Mixed Scanning)

এৎশিয়নি ‘Mixed Scanning’ তথা মিশ্র পদ্ধতির কথা বলেন। তিনি যুক্তিসিদ্ধ অবরোহণ পদ্ধতিকে সমালোচনা করলেও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনমূলক পদ্ধতিকেও সমর্থন করেননি। এই পদ্ধতি একপেশে এবং উদ্ভাবনী শক্তিবিহীন; এটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সংগঠিত এবং ক্ষমতাবানদের স্বার্থ সংরক্ষণে উৎসাহিত করে। এই পদ্ধতি কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অকার্যকারী, যেমন—যুদ্ধ ঘোষণা। সেই কারণে এৎশিয়নি উক্ত দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণে Mixed Scanning-এর কথা বলেন। এৎশিয়নি সংগঠনকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আধারে বিশ্লেষণ করেছেন; তাঁর মতে, কোনো সংগঠন কী ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ব্যবহার করে, তার ওপর তার প্রকৃতি নির্ভর করে। তিনি তাঁর পদ্ধতিটিকে ব্যাখ্যা করেন একটি অসাধারণ উদাহরণের সাহায্যে, ধরা যাক বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করা হবে। যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সম্পূর্ণ আকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি গ্রহণের জন্য বহু ক্যামেরা ব্যবহৃত হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হবে, এর ফলে বিশদ বিবরণ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু তা হবে অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ, যা কর্মক্ষমতার সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে। পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন পদ্ধতির সমর্থকরা সাম্প্রতিক অতীতে যেসকল স্থানে একই ধরনের আবহাওয়া লক্ষ করা গেছে, সেগুলির ওপর এবং পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এর ফলে কিছু অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া বৈচিত্র্য বিশ্লেষিত নাও হতে পারে। পদ্ধতির সমর্থকেরা এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁরা দুটি ক্যামেরা ব্যবহার করবেন, একটি সমস্ত আকাশের ছবি তুললেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলিকে বিশ্লেষণের মধ্যে যাবেন না এবং দ্বিতীয় ক্যামেরাটি প্রথম ক্যামেরা থেকে প্রাপ্ত ছবির বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সকল অঞ্চলে কিছু বৈচিত্র্য বা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা গেছে, সেই সকল অঞ্চলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছবি গ্রহণ করবে। এৎশিয়নি-র মতে, Mixed Scanning পদ্ধতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা নজরে না আসতে পারে, তবে তুলনায় সেই সমস্যা অনেক কম।

৪.১৪ উপসংহার

জননীতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, যা নীতিটিকে বৈধতা প্রদান করে। সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি সকল নাগরিকের ওপর প্রযোজ্য এবং সরকার নীতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনে শক্তি ব্যবহার করে থাকেন। সরকারের আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ নীতিকে বৈধতা দেয়। সরকারি নীতির বিশ্লেষণে অনেক অনিশ্চয়তা দেখা সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পরিবেশের প্রতিফলনের মধ্যে জটিল সম্পর্ক নীতি বিশ্লেষণে অবশ্য প্রণিধানযোগ্য।

জননীতি সম্বন্ধে পাঠ জনগণের সমস্যার সমাধানকল্পে রচিত; অতঃপর বর্তমান ও আশু সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি সংক্রান্ত সামাজিক গবেষণাই প্রাসঙ্গিক। অন্যভাবে নীতি সংক্রান্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হল সরকারি ও সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তাব বহন করা। ইস্টনের উত্তর আচরণবাদ। লিণ্ডব্রথের বিযুক্ত প্রান্তিক বৃদ্ধির মতবাদ এবং ড্র'রের নীতি সংক্রান্ত মতবাদ নীতিগ্রহণের বর্তমান অভিমুখের ওপর আলোকপাত করে থাকে।

নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষানীতির পাঠে নীতির বিশ্লেষণ ও নীতির জন্য বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে নীতি বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিটি গড়ে ওঠে। যা ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত হয় নীতি বিশ্লেষণ ও গবেষণা কাঠামোর বিভিন্ন ধারার সঙ্গে।

নীতি বিশ্লেষণ, নীতি গঠন, নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি রূপায়ণ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষণীয়। সাধারণভাবে এই কাজগুলোকে নীতি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই ভাবনা যথার্থ নয়, কারণ এইভাবে পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব নয় এবং এই কাজগুলো কোনো নির্দিষ্ট ক্রমে সংঘটিত হয় না। তবে প্রতিটি কাজই আপন বৃত্তে স্বতন্ত্র ও নিজস্ব তত্ত্বের দ্বারা সমর্থিত।

জননীতি একটি কলা ও কারিগরী বিদ্যাপ্রসূত। এটিকে কলা বলা হয়। কারণ জননীতিও দুরদৃষ্টি অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা ও কল্পনা নির্ভর। এটি কারিগরী বিদ্যার দ্বারা সমৃদ্ধ কারণ জননীতি রূপায়ণেও অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসনের জ্ঞান আবশ্যক। সাবেক পাঠ্যশাস্ত্রের প্রয়োগগত উপভাগ হল জননীতি। জনগণের সমস্যার সমাধানে কোনো নিখুঁত, বিশুদ্ধ ও চিরস্থায়ী সমাধান হয় না; জননীতিও সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সময়োপযোগী হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ : নীতি বিশ্লেষণ যেখানে একটি কমধারার লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক লাভের হিসেব কষে। নির্বাচকমণ্ডলী বা নির্বাচনী এলাকা রাজনৈতিক বিশ্লেষণে যতটা গুরুত্ব পায়, মোট সামাজিক উপকারিতা তা মোটেই পায় না। জনগণের মঙ্গল নীতি বিশ্লেষণে যতটা গুরুত্ব পায়, রাজনৈতিক বিশ্লেষণে তা পায় না, বরং ভোটই এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণের তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণের তত্ত্ব।

- নীতি বিশ্লেষণ তত্ত্ব হল প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব।
- নীতি রূপায়ণের তত্ত্ব হল আন্তঃসংস্থা রাজনীতির তত্ত্ব।
- নীতিভিত্তিক সিদ্ধান্তের তত্ত্ব হল রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রতিফলন, যা কর্তৃত্বকে তুলে ধরে।
- অন্তিমে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের তত্ত্ব হল রাজনৈতিক আচরণ তত্ত্ব।

এই সকল কার্যকলাপ একযোগে জননীতি প্রণয়ন, রূপায়ণ ও প্রয়োগকে একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কার্যকরী রূপ প্রদান করে।

৪.১৫ সারাংশ

জননীতি সম্বন্ধে পাঠ ও নীতি বিশ্লেষণ সম্বন্ধে পাঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং জনপ্রশাসনের একটি প্রতিষ্ঠিত অংশ। জননীতি হল সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মধারা। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারি ক্রীয়করা যে লক্ষ্যনির্ভর কর্মধারা নির্বাচন করে, তাই জননীতি বলে পরিচিত। জননীতি হল একটি প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত ও প্রযুক্ত হয়। জননীতি প্রক্রিয়া কয়েকটি বিশ্লেষণের ধাপ অতিক্রম করে। ১৯৬০-এর দশক থেকে জননীতি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার নবরূপায়ণ ঘটেছে, যা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

৪.১৬ পাঠ সমাপ্তি প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) নীতির লক্ষ্য কী কী? জননীতি বিশ্লেষণের প্রধান দৃষ্টিকোণগুলো কী?

(২) জননীতি বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝায়? কিভাবে এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাস্তবে চলে? সিদ্ধান্ত কি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গৃহীত হয়, নাকি রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে?

(৩) রাজনৈতিক জগতে নীতিবিশ্লেষণের তাৎপর্যটিকে সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।

(৪) নীতি বিশ্লেষণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে একটি টীকা রচনা করুন।

(৫) নীতি বিশ্লেষণের মডেলগুলো ব্যাখ্যা করুন।

(৬) রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং নীতি বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন এবং তাদের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) নীতি বিশ্লেষণের যুক্তিসিদ্ধ মডেলের মৌলিক অনুমান ও উপাদানগুলোর ওপর আলোকপাত করুন।

(২) কোনো ব্যক্তির জন্যই একটি নির্দিষ্ট মডেল বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রক্ষণশীল মনোভাব দেখানো সঠিক নয়—পর্যালোচনা করুন ও মন্তব্য করুন।

(৩) নীতি প্রক্রিয়া কিভাবে বাদ করে?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) নীতিবিশ্লেষণের প্রাতিষ্ঠানিক মডেল চিহ্নিত করুন।

(২) টীকা লিখুন :

(ক) যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ,

(খ) নীতি বিশ্লেষণের অভিজাত মডেল।

(৩) সংশ্লেষ পদ্ধতিতে জননীতি গ্রহণ বলতে কি বোঝেন?

৪.১৭ গ্রন্থসূচী

Dahl, R., *Who Governs*? New Haven, Yale University Press, 1961.

Dunn, William, *Public Policy Analysis: An Introduction*, NJ, Prentice Hall, 2003.

Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy* (12th ed.), NJ, Prentice Hall, 2007

Ian, Thomas, ed., *Environmental Policy: Australian Practice in the Context of Theory*. Sydney: Federation Press, 2007

Lester and Stewart, Techniques to Investigate a Depressed Employee, Ottawa: Self-Published, 2000... Canada and Immigration: Public Policy and Public Concern, Second Edition, ...2000

Mccool, Daniel, *Public Policy Theories, Models, and Concepts: An Anthology*, NJ, Prentice Hall, 1995

Woodhouse, J.E & Lindblom, C.E., *Policy Making Process*, 3rd Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1992

৪.১৮ নির্বাচিত পাঠ

ঘোষ, সোমা, *জনপ্রশাসন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ প্রকাশনা, ২০১০।

বসু রাজশ্রী, *জনপ্রশাসন*, কলকাতা, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

সোম, সুভাষ, *জনপ্রশাসন*।

বসু, রুমকী ও চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, *জনপ্রশাসন*।

চক্রবর্তী, দেবাশীষ, *গণপরিচালন*।

পর্যায়—৩

গণতান্ত্রিক প্রশাসন ও সুশাসন

একক-১ ☐ সুশাসন : অর্থ ও উদ্দেশ্য
একক-২ ☐ জনপ্রশাসনে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা
একক-৩ ☐ বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা হস্তান্তর ও উন্নয়ন
একক-৪ ☐ ভারতীয় প্রেক্ষিতে সুশাসন

একক-১ ❑ সুশাসন : অর্থ ও উদ্দেশ্য

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ সুশাসনের পটভূমি

১.৪ সুশাসনের অর্থ ও উদ্দেশ্য

১.৫ সুশাসন ও সুশীল সমাজ

১.৬ সুশাসনের মূল্যায়ন

১.৭ সারসংক্ষেপ

১.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা হবে :

- কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সুশাসনের ধারণা গড়ে ওঠে?
- সুশাসন বলতে আমরা কী বুঝি?
- সুশাসনের নানা সংজ্ঞা
- সুশাসনের বিবিধ বৈশিষ্ট্য
- সুশাসনের মাধ্যমে আমরা কী উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি?
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুশীল সমাজের কী ভূমিকা?
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে উদ্ভুত সমস্যাদি।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভূমিকা।

১.২ ভূমিকা

জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে কতগুলি শব্দ—সরকার, প্রশাসন ও শাসন—আমাদের কাছে অতি পরিচিত শব্দ। শব্দগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত; তবে, তারা সমার্থক নয়। শব্দগুলির অর্থের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আলোচনার শুরুতেই এই বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রয়োজন।

জনপ্রশাসনের সনাতন ধারণার উদ্ভব ঘটে উনিশ শতকে। তার আগে পর্যন্ত সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা কোন পৃথক ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃত ছিল না। সে আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৮৭ সালে উড্রো উইলসনের বিখ্যাত নিবন্ধ *The Study of Administration* প্রকাশিত হয়। নিবন্ধে তিনি জনপ্রশাসনকে রাজনীতি থেকে পৃথক বিষয় হিসাবে আলোচনার দাবী রাখেন। তাঁর বক্তব্য ১৯০০ সালে প্রকাশিত ফ্র্যাঙ্ক গুড্নাউ-এর বই *Politics and Administration*-এ সমর্থন পায়। ক্রমেই জনপ্রশাসনের পৃথক অস্তিত্বের দাবী স্বীকৃতি লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই জনপ্রশাসন নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই সময়ে দুটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য লেখা ফ্রেডারিক্ উইনস্লো টেলর-এর *Principles of Scientific Management* (১৯১১) ও অঁরি ফেয়ল-এর *General and Industrial Management* (১৯১৬) প্রকাশিত হয়। লেখা দুটি সংগঠনের দক্ষতা ও প্রশাসনের বিশ্বজনীন নীতির আবিষ্কার ও প্রয়োগের উপর জোর দেয়। ১৯২৬-এ লিওনার্ড ডি ওয়াইট-এর *Introduction to the Study of Public Administration* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি রাজনীতি প্রশাসনের বিভেদকে আরো সুস্পষ্ট রূপ দেয়। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে নানা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে জনপ্রশাসনের বিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৩৭-এ লুথার গুলিক্ ও লিণ্ডাল্ উর্উইক্ Papers on the Science of Administration-এ POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) প্রশাসনিক নীতিগুলি উত্থাপন করেন। এঁদের অবদানকে ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব জনপ্রশাসনে অত্যন্ত প্রভাবশালী তত্ত্ব হলেও তা সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না। সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর উপর গুরুত্ব আরোপ করায় ও যান্ত্রিকভাবে নীতি প্রয়োগ করায় ১৯৩০-এর দশকের সময় থেকেই সমালোচনা আসে মানবিক সম্পর্ক তত্ত্বের তাত্ত্বিকদের দিক থেকে। মানবিক সম্পর্ক তত্ত্ব গড়ে তোলার পিছনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন মার্কিন তাত্ত্বিক এল্টন্ মেয়ো ও তাঁর সহযোগী গবেষকরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের কাছে Western Electric Company-র Hawthorne Plant-এ ১৯২৪—১৯৩৩-এর গবেষণালব্ধ ফলের ভিত্তিতে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিকতাকে বর্জন করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অ-আনুষ্ঠানিক কাজের ধারার বিশ্লেষণের উপর জোর দেন। এই তত্ত্ব মানুষের উপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং তার মনস্তাত্ত্বিক তাগিদ ও অ-আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠী সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেয়। এই তত্ত্ব ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এক অর্থে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা প্রভাবশালী আচরণবাদী তত্ত্বের পুর্বসুরি বলা যেতে পারে।

১৯৪৭-এ হার্বার্ট সাইমনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Administrative Behaviour* প্রকাশিত হয়। সাইমন আচরণবাদী তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা। তিনি তাঁর গ্রন্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা Decision-making-এর উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর রচনায় রাজনীতি-প্রশাসন বিভাজনের ধারণাটি পরিত্যক্ত হয়।

ষাটের দশক ছিল বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আলোড়নের দশক। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ সহ নানা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রতিবাদী আন্দোলনে উত্তাল হয়। সেই পটভূমিতেই ১৯৬৮-র মিনোব্রুক্ সম্মেলন থেকে New Public Administration-এর জন্ম হয়। এই আন্দোলন গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ডুয়াইট্ ওয়াল্ডো-র নেতৃত্বে একদল তরুণ সমাজবিজ্ঞানী। মিনোব্রুক্ সম্মেলনের আলোচনার

বক্তব্য ১৯৭১-এ *Toward A New Public Administration:The Minnowbrook Perspective* গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। চিরাচরিত বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি আলোচনায় গুরুত্ব পায় প্রশাসনের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ব্যক্তির সঙ্গে আমলাতন্ত্রের সম্পর্ক ইত্যাদি নতুন বিষয়। New Public Administration বা নব জনপ্রশাসন মূলতঃ প্রাসঙ্গিকতা, অংশগ্রহণ, বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক আমলাতন্ত্রের কথা বলে।

১৯৭০-এ উইলিয়াম্ নিস্কানেন্ (১৯৭১) ও ভিন্‌সেন্ট অস্ট্রম্-এর (১৯৭৪) হাত ধরে উঠে আসে Public Choice Theory বা জন পছন্দ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন ক্রমোচ্চ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন মানবিক ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ ব্যক্তিকে সামাজিক বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখেন। মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী হওয়ায় তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে। ফলে ব্যক্তির পছন্দকেই দেখতে হবে সামাজিক সংগঠনের নির্ধারক হিসাবে এমনটাই মনে করেন এই তাত্ত্বিকরা। তাঁরা জনপ্রশাসন ও জননীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনসংস্থা এমনকি সরকারে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আনার কথা বলেন। বলাবাহুল্য, দৃষ্টিভঙ্গিটি বাজারমুখী এবং সামাজিক কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের পক্ষে। নীতিগত দিক থেকে এটি নয়া-উদারনৈতিক রাষ্ট্র দর্শনের কাছাকাছি।

১৯৮০-৯০-এর দশকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মনিটারি ফান্ড 'Governance'-এর ধারণাকে সামনে আনে। উদ্দেশ্য, পৌর সমাজ, এন.জি.ও. ও অসরকারী সংস্থাদের জননীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা। Governance শব্দটি এই বিশেষ অর্থে ১৯৮৯-এ বিশ্ব ব্যাঙ্ক তার একটি প্রতিবেদনে ব্যবহার করে। আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা-সংলগ্ন এলাকার সামগ্রিক অনগ্রসরতা বোঝাতে সেখানের 'Bad Governance'-কে দায়ী করা হয়।

১.৩ সুশাসনের পটভূমি

বর্তমান প্রেক্ষিতে সুশাসনের ধারণা বিশ্লেষণ করতে হলে বিশ্বায়নের পটভূমিতে তা করা প্রয়োজন। আশির দশক থেকেই জনপ্রশাসনে অনেক নতুন চিন্তা-ভাবনাকে উঠে আসতে দেখা যায়। সে চিন্তাভাবনার অনেকটাই ছিল রাষ্ট্র সম্পর্কে সমালোচনামূলক। তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রায়শই রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতার উপর জোর দেওয়া হয়। একদিকে যেমন আর্থিক অ-ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রকে দায়ী করা হয়, অপর দিকে তেমনই বাজার ও সুশীল সমাজের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মূল প্রতিপাদ্য হল রাষ্ট্র বা সরকারের ভূমিকা হ্রাস করা। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে যে নতুন চিন্তা দেখা দেয় তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৮০-র দশকের নতুন অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে। জনপ্রশাসনের সনাতনী চিন্তাগুলিকে অতিক্রম করে উঠে আসে নয়া উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিক ও জনপছন্দ তাত্ত্বিকদের বক্তব্য। বিশ্বায়নের অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই চিন্তা ধারার উদ্ভব ঘটে।

১৯৮০ দশক থেকে আমরা দেখতে পাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইতালি, স্পেন, সুইডেন প্রভৃতি দেশে নিউ রাইট-এর উত্থান ঘটে। তাদের প্রভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সংকুচিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। গুরুত্ব দেওয়া হয়, বেসরকারী প্রশাসন, বেসরকারী ব্যবস্থাপন ইত্যাদিকে। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা উঠে আসতে থাকে। তারই হাত ধরে উঠে আসে Good Governance বা সুশাসনের ধারণা।

১.৪ সুশাসনের অর্থ ও উদ্দেশ্য

জনপ্রশাসনের সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনায় শাসন বা Governance-এর ধারণাটা বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। আগে, সনাতন জনপ্রশাসনে সরকারের সাংগঠনিক কাঠামো, সরকারের নীতি, আমলাতন্ত্র ও সিদ্ধান্তগ্রহণ-এর উপরই প্রধানতঃ আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকতো। প্রশাসনের কাজ বা Governance সেই তুলনায় কম আলোচিত হ'ত। আজ 'সরকারকেন্দ্রিক' আলোচনা থেকে আমরা 'প্রশাসনের ক্রিয়ার' দিকে ফিরে তাকাচ্ছি।

Oxford English Dictionary-তে আলাদাভাবে Governance শব্দটি অন্তর্ভুক্ত আছে। সেখানে সেটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় 'The action or manner of governing' হিসাবে। অর্থাৎ, সেটি 'শাসনের ক্রিয়া বা পদ্ধতি'র দিকে ইঙ্গিত করে। *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* অনুসারে Governance হল 'Method or system of government or management'। যার অর্থ দাঁড়ায়, শাসন 'সরকার বা ব্যবস্থাপনের প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা'। সব মিলিয়ে স্পষ্টতই বোঝা যায়, সরকার ও শাসনের ধারণা সমার্থক নয়। শাসনের ধারণায় একটি ক্রিয়াগত ও নীতিগত মানদণ্ড লক্ষ্য করা যায়।

১৯৯২-এ প্রকাশিত Governance and Development নামক তার নথিতে বিশ্বব্যাঙ্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে প্রক্রিয়ায় একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা করা হয় তাকেই Governance হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। বলা যেতে পারে, Governance-এর লক্ষ্য হল একটি অ-সফল ব্যবস্থাপনাকে পরিবর্তন করে সুষ্ঠ সামাজিক পুনর্গঠন করা। Governance শুধু সরকারের ক্রিয়া নয়। Governance বহু নায়ক বা Plurality of actors-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করে। নাগরিকের দাবী ও ইচ্ছাপূণের লক্ষ্যে Governance সরকার, সুশীল সমাজ ও বাজারের সাহায্য নেয়।

Garry Stoker, *International Social Science Journal*-এর মার্চ ১৯৯৮-এ তার "Governance as Theory : Five Propositions" শীর্ষক নিবন্ধে Governance-এর যে পাঁচটি দিকের উপর আলোকপাত করেন সেগুলি হল :

(১) Governance-এর ধারণার কিছুটা সরকারী হলেও তার অনেক কিছুই সরকার বহির্ভূত।

(২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে Governance কাজ ও দায়িত্বের সীমারেখা বিভাজনকে অস্বীকার করে।

(৩) যৌথ কাজে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার সম্পর্ককে Governance চিহ্নিত করে।

(৪) স্বাধিকারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে Governance আলোচনা করে।

(৫) Governance-এর ধারণা অনুসারে কেবলমাত্র সরকারী নির্দেশ ও ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সব কাজ করা সম্ভব নয়।

Governance বা শাসনের ধারণায় চারটি প্রধান উপাদানের কথা বলা হয়। সেগুলি হল—

(১) দায়বদ্ধতা বা accountability

(২) স্বচ্ছতা বা transparency

(৩) নিশ্চয়তা বা certainty

(৪) অংশগ্রহণ বা participation

এগুলির উপর সুশাসন নির্ভরশীল।

(১) **দায়বন্ধতা :** সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির জনগণের কাছে তাদের কাজকর্মের জন্য দায়বন্ধ থাকা প্রয়োজন। একমাত্র Rule of Law বা আইনের শাসন থাকলেই তা সম্ভব।

(২) **স্বচ্ছতা :** কি পদ্ধতিতে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। সব কিছুই আইন মেনে হওয়া দরকার। স্বচ্ছতার ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে তথ্য জানার অধিকার। স্বচ্ছতার জন্য সঠিক তথ্য যাতে সহজে পাওয়া যায় সেদিকে চোখ রাখা দরকার।

(৩) **নিশ্চয়তা :** নিশ্চয়তা হল উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা বা বিচার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকতে পারার মতো পরিস্থিতি থাকা।

(৪) **অংশগ্রহণ :** সুশাসনের মূল স্তম্ভ হল জনগণের অংশগ্রহণ। এই অংশগ্রহণের সাফল্য সঠিক তথ্যের আদানপ্রদানের উপর নির্ভরশীল। বাক্ স্বাধীনতা, সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও সুসংগঠিত সুশীল সমাজ থাকা প্রয়োজন। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমেই জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে, আর এর মাধ্যমেই জনগণ জনসম্পদের ব্যবহার ও সরকারী কাজকর্মের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্গত United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific সুশাসন বা Good Governance-এর আটটি উপাদান চিহ্নিত করে। সেগুলি হল—অংশগ্রহণ (Participation), ঐক্যমত (concensus), আইনের শাসন (rule of law), দায়বন্ধতা (accountability), স্বচ্ছতা (transparency), সংবেদনশীলতা (responsiveness), কার্যকারিতা ও দক্ষতা (effectiveness) এবং সমদর্শিতা ও পরিবেষ্ঠনতা (equity and inclusiveness)।

১.৫ সুশাসন ও সুশীল সমাজ

১৯৯০-এর দশক থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে Right to Information Act বা তথ্যের অধিকার আইন, Consumer Protection Legislation বা উপভোক্তা নিরাপত্তা বিষয়ক আইন, Citizens' Charter, Whistleblower Protection, e-Governance, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, Public Interest Litigation ইত্যাদি। বর্তমানে দেখা যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনেকখানি চাপই আসে সুশীল সমাজের দিক থেকে। উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যায়, লোকসত্ত্বা-র কথা। হায়দরাবাদ-কেন্দ্রীক এই সামাজিক সংগঠন লক্ষাধিক গ্রামবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি পিটিশন সরকারের কাছে জমা করে। পিটিশনে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বাড়ানোর দাবী রাখা হয়।

সুশাসন বজায় রাখার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের নানাবিধ অবদান আছে।

(১) ¢Ÿæbe¢›y Watchdog বা পাহারাদারের ভূমিকা পালন করে। কোথায় Governance-এর ঘাটতি দেখা গেল বা কোথায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হল সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখে ও প্রতিবাদ সংগঠিত করে।

(২) সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে কাজ করে।

(৩) বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের অধিকারের লড়াইতে আন্দোলনকারীর ভূমিকা পালন করে।

(৪) শিক্ষাদাতার ভূমিকা পালন করে। একদিকে যেমন নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলায় সুশীল সমাজের বড় ভূমিকা আছে, অপর দিকে সরকারকে বাস্তব পরিস্থিতি ও জনমত সম্পর্কে সচেতন করার কাজও সুশীল সমাজ পালন করে।

(৫) সুশীল সমাজ নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিষেবা দানেরও ব্যবস্থা করে। বিশেষতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং সেই মানুষদের মধ্যে যেখানে সরকারের সাহায্য যথাযথ ভাবে পৌছোয় না।

(৬) সংগঠকের কাজ সুশীল সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুশীল সমাজ নানা ক্ষেত্রে জনমত সংগঠিত করে কখনও তা করে ভাল নীতির পক্ষে, কখনও বা খারাপ নীতির বিপক্ষে। কখন তাদের দেখা যায় শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, টীকাকরণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারী প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় জনমত সংগঠিত করতে।

(৭) যে পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা তাদের অ-নমনীয়তার জন্য সীমিত সাফল্য অর্জন করতে পারে, সেখানে অনেক বেশি নমনীয় অবস্থান থাকায় সুশীল সমাজকে সক্রিয় সহযোগিতা করতে দেখা যায়।

সুশীল সমাজ সংগঠন সমূহ নানা নামে পরিচিত। যথা, Voluntary Organization (VO), Non-governmental Organization (NGO), Civil Society Organization (CSO) ইত্যাদি। এই ধরনের সংগঠন নানা রকমের হওয়ায় তাদের কর্ম-পদ্ধতি; দক্ষতা সবই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কতগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল—সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে; আবার কিছু সংগঠন তুলনামুলকভাবে অ-সফল, সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান নেই বললেই চলে। সুশাসনের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রভাব ফেলতে গেলে এই সংগঠনগুলিকে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে হয়, যোগ্য নেতৃত্ব থাকা প্রয়োজন, আর প্রয়োজন দায়বদ্ধতা, তৃণমুল স্তরে কাজের অভিজ্ঞতা, স্বচ্ছতা ও আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র।

সুশীল সমাজ সংগঠনগুলিকে প্রায়শই কিছু দুর্বলতার শিকার হতে দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কর্মী ও সম্পদের অভাব, অর্থনৈতিক সমস্যা, আর্থিক সহায়কের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, দুর্নীতি, ইত্যাদি।

সুশীল সমাজ শক্তিশালী ও উপযুক্ত হলে তবেই তা সুশাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

১.৬ সুশাসনের মূল্যায়ন

যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, দেশে দেশে সুশাসনের ধারণার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তার অর্থ অনেকটাই নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান, সরকারের কাঠামো, সামাজিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর। এ ছাড়াও আছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাব। ফলে, কোন একটি দেশে যা স্বাভাবিক মনে করা যেতে পারে অন্য দেশে তা নাও হতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দুর্নীতি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ায় সুশাসনের ধারণাটি অনেকাংশেই জনসাধারণের তত্ত্বগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। দুর্নীতি এমনভাবে রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের মধ্যে তার শিকড় বিস্তার করেছে যাতে তা প্রায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে।

অনেক উন্নয়নশীল দেশেই Rule of Law বা আইনের শাসনের অভাব লক্ষণীয়। এর ফলে সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে যারা ক্ষমতাসম্পন্ন তারা কোন অসুবিধায় পড়েন না, কিন্তু দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হন। কোন দেশে আইনের শাসন না থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয় না।

বর্তমানের চিন্তাভাবনায় নাগরিকদের উপভোক্তা হিসাবে গণ্য করা হয়। সে ক্ষেত্রে সুশাসনের অর্থ হওয়া উচিত এই উপভোক্তাদের জনপরিষেবার সুবিধা যথাযথ ভাবে পৌঁছে দেওয়া। অথচ বাস্তবে দেখা যায় ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী পক্ষ ও আমলারা কেউই সে বিষয়ে তৎপর নয়। করদাতা ও অবদমিত জনসাধারণের কাছে পরিষেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে স্পষ্টতই অনীহা দেখা যায়।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক বেসরকারী সংস্থা সমূহকে উৎসাহিত করার পক্ষে ও তাদের অবাধ বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অন্ততঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনেকটাই রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে হবে। বেসরকারী সংস্থাগুলির জনগণের প্রতি প্রয়োজনীয় দায়বদ্ধতা থাকে না, মুনাফার হিসাবই তাদের কাজের প্রধান নির্ণায়ক। রাষ্ট্রই একমাত্র নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিষেবা আম-জনতার মধ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

অথচ, রাষ্ট্রই আবার অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝে কাজ করতে বাধ্য থাকে। এগুলির মধ্যে দেশের বাইরে এবং ভিতরের নানা ধরনের চাপ থাকে। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আছে, বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর টানাপোড়েন। অনেকক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদও সুশাসনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১.৭ সারসংক্ষেপ

১৮৮৭ সাল থেকে একটি বৌদ্ধিক বিষয় হিসাবে উঠে আসা জনপ্রশাসন সময়ের সাথে সাথে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছে।

১৯৯০-এর দশক থেকে বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এককথায় যাকে বিশ্বায়ন নামে আখ্যা দেওয়া হয়। এই পরিবর্তন আসার কিছুকাল আগে থেকেই বৌদ্ধিক স্তরে তার সপক্ষে নানা ধরনের মতামত উঠে আসতে থাকে। উঠে আসে জনপছন্দ তত্ত্ব। সেই চিন্তা ভাবনার পথ বেয়ে জনপ্রশাসনকে আমরা দেখি 'প্রশাসন' থেকে 'শাসন'-এর ধারণার দিকে অগ্রসর হ'তে; সেখান থেকে আসে সুশাসনের চিন্তা। ক্রমেই সুশাসনের বা Good Governance-এর দাবীকে আমরা জোরালো হয়ে উঠতে দেখি।

এতে শুধু সরকার নয়, সরকারের পাশাপাশি অ-সরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপুর্ণ হিসাবে গণ্য হয়। তবে, নানা জটিলতা ও সমস্যাও থেকে যায়; তাদের সুষ্ঠু মোকাবিলার মধ্যে দিয়েই সুশাসন এগোতে পারে।

১.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) সুশাসনের ধারণা বিশ্লেষণ করুন।

(২) সুশীল সমাজ ও সুশাসনের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(৩) সুশাসনের ধারণার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) সুশাসনের ধারণার উৎপত্তি আলোচনা করুন।

(২) 'Administration' ও 'Governance'-এর পার্থক্য কী?

(৩) সুশাসনের ধারণার মূল বক্তব্য কী?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) সুশাসন বজায় রাখার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

(২) সুশাসনের চারটি উদ্দেশ্য লিখুন।

(৩) Garry Stoker তাঁর Governance as Theory : Five Propositions নিবন্ধে কোন পাঁচটি দিকের উল্লেখ করেছেন?

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

S. K. Das, *Civil Service Reform and Structural Adjustment*, Oxford University Press, 1998.

D. Osborne and T. Gaebler, *Reinventing Government*, Prentice Hall, New Delhi, 1992.

T. N. Chaturvedi (ed.), *Towards Good Governance*, New Delhi, IIPA, 1998.

World Bank, *Governance and Development*, Washington D. C. 1992.

রাজশ্রী বসু, *জনপ্রশাসন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, কলকাতা, ২০০৫

Garry Stoker, "Governance as Theory : Five Propositions", *International Social Science Journal*, No. 155, March. 1998.

Indian Journal of Public Administration, July-Sept. 1998. (Special Number on Good Governance)

একক-২ ❑ প্রশাসনে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ দায়বদ্ধতার নানা রূপ
২.৪ উন্নয়নশীল দেশে দায়বদ্ধতা
২.৫ স্বচ্ছতা
২.৬ তথ্যের অধিকার
২.৭ সুশাসন ও স্বচ্ছতা
২.৮ সারসংক্ষেপ
২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী
২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল—

- প্রশাসনে দায়বদ্ধতা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- দায়বদ্ধতার নানা রূপ বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা।
- উন্নয়নশীল দেশে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।
- তথ্যের অধিকার বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করা।
- সুশাসন ও স্বচ্ছতার সম্পর্ক অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

২.২ ভূমিকা

অতীতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছিল না, বা থাকলেও ছিল সীমিত। জনগণ শাসিত হত এবং শাসকের দেওয়া নির্দেশ পালন করতো। কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ অনেক বেশি দেখা যায়। শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের সক্রিয় অংশীদারিত্বের দাবী ওঠে। জনগণের শাসন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে উঠে আসে তার সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকারের প্রশ্ন; কারণ, সেই তথ্যের উপর নির্ভর করেই কেবলমাত্র যথাযথ অংশগ্রহণ সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ শুধু শাসিত হবেন তা নয়, তাদের যথার্থ ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের নানা দিক বৌদ্ধিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে। জনগণ যে একাধারে করদাতা ও জনপরিসেবার উপভোক্তা তা উপলব্ধ হয়। জনগণ, তথা নাগরিককে কেন্দ্রে রেখে উন্নয়নের ধারণা ব্যক্ত হয়।

২.৩ দায়বদ্ধতার নানা রূপ

জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার ধারণা প্রথমতঃ ইংল্যান্ডে উঠে আসে, সামন্ত ব্যবস্থার অবক্ষয়ের পটভূমিতে। যখন সামন্ত ব্যবস্থার অবক্ষয়ের পাশাপাশি নতুন বাণিজ্যিক শ্রেণীর উত্থান দেখা যায়, রাজা সেই শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুনাফার অংশ দাবী করেন। অপর দিকে সেই বাণিজ্যিক শ্রেণী তাদের কষ্টার্জিত মুনাফার ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। দায়বদ্ধতার ধারণাটি আরো পরিমার্জিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের গৃহ যুদ্ধের সময়ে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্-এর শাসনকালে তা শাসনের একটি মৌলিক নীতি হিসাবে উঠে আসে। আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভবের সাথে সাথে ধারণাটি আরও পরিমার্জিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মনে করা হয়, ইংরাজি ভাষায় 'accountable' শব্দটি প্রথম ১৫৮৩ সালে ব্যবহৃত হয় এবং তা অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে। আজ অবশ্য শব্দটির বিস্তার আরো ব্যাপক এবং সরকারের সমস্ত কাজকর্মের প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত। *Shorter Oxford English Dictionary* মোতাবেক, 'accountable' হল 'liable to be called to account'। আবার, *Webster's New International Dictionary of the English Language* প্রায় একইভাবে বলে 'Liable to be called on to render an account'।

দায়বদ্ধতার মূলতঃ দুটি দিক আছে, একটি রাজনৈতিক অপরটি প্রশাসনিক। এই দুটো দিক স্বতন্ত্রও বটে, আবার যুক্তও বটে। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় নানা পদ্ধতির মাধ্যমে পার্লামেন্ট প্রশাসনকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য রাখে। পার্লামেন্টের মাধ্যমে এই দায়বদ্ধতা থাকে জনগণের কাছে। এটি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। এছাড়া দেখা যায় প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তা তথা মন্ত্রীর কাছে আমলারা দায়বদ্ধ থাকে। এটি হল প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা। এই দুই ধরনের দায়বদ্ধতা একে অপরের পরিপূরক।

রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা

বর্তমানকালে মনে করা হয় কোন বিশেষ আমলাকে তাঁর কাজের জন্য দায়বদ্ধ রাখতে হলে মন্ত্রীকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এর কারণ হল, মন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া আমলার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিকভাবে আমলা সরাসরিভাবে জনসাধারণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন না। যদিও তাঁরা তাঁদের বিশেষ জ্ঞানের সুবাদে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করেন কিন্তু জনগণের চোখে পরিচয়হীন থেকে যান।

সংসদের কাছে দায়বদ্ধতা

সংসদ নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনের উপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সাংসদদের প্রশাসন সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাসা থাকলে সংসদে সেই দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে তা জানতে চাইতে পারেন। মনে রাখা প্রয়োজন, আমলারা নীতি রূপায়ণের সাথে যুক্ত থাকলেও সংসদের কাছে তাদের কোন সরাসরি দায়বদ্ধতা থাকে না। তাদের বদলে প্রশ্নের

সম্মুখীন হন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা। সংসদীয় নানা কমিটির মাধ্যমে সংসদ প্রশাসনিক নানা দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান চালায়। প্রয়োজন হলে দপ্তর থেকে তথ্য চেয়ে পাঠায়। আমলাদের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে হয়।

সংসদের হাতে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যতম উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হল অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে সংসদের হাতে। সরকারের Budget প্রস্তাব সংসদে পাস হওয়া আবশ্যক। সংসদে বাজেটের (Budget) উপর বিতর্ক হয়, সরকারের প্রস্তাবের সমালোচনা ওঠে এবং সংসদ তা বাতিল বা সংশোধন করতে পারে। যদিও এটা সচরাচর ঘটে না, তবে তাত্ত্বিক দিক থেকে বললে বলা যায়, এটা সম্ভব।

সরকারের অর্থ ব্যয়ের পর তা অডিট্ হয়। শীর্ষ অডিটরের রিপোর্ট সংসদের সামনে পেশ হয়। সংসদ সেই রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখে যে যাতে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল তা সেই উদ্দেশ্যেই যথাযথ ভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা এবং ব্যয় প্রক্রিয়ায় আইন কানুন যথাযথ ভাবে মান্য করা হয়েছে কিনা।

বিচার বিভাগের কাছে দায়বদ্ধতা

অনেক উদারনৈতিক দেশেই, দেশের শীর্ষ আদালতের কাছে প্রশাসন ও আইনসভা দায়বদ্ধ থাকে। ব্রিটেন ও ভারত তার উদাহরণ। আদালত প্রশাসন বা আইনসভার বিভিন্ন কাজের সমালোচনায় রিট জারি করতে পারে।

পৌর সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা

আধুনিককালে পৌর সমাজ অনেকটাই সক্রিয়ভাবে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা চালায়। নীতি নির্ধারণের দিকনির্দেশ থেকে শুরু করে নীতি রূপায়ণের নানা দিকের উপর গণতান্ত্রিক দেশে পৌরসমাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। নিজেদের অবস্থানের সপক্ষে জনমত সংগঠিত করার নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে। মিটিং, মিছিল, সভা, সমিতি, গণ-স্বাক্ষরের পাশাপাশি আধুনিক প্রচার মাধ্যমকে হাতিয়ার করে। প্রসঙ্গতঃ, মনে রাখা প্রয়োজন আধুনিককালে গণমাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী। এই শক্তির অনেকটাই নতুন তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। উচ্চমানের ক্যামেরা ও ইলেকট্রনিক তথ্য মাধ্যম তথ্যের আদান প্রদানকে অনেক প্রভাবশালী ও সহজ করে দিয়েছে। অনেক স্পষ্টভাবে উচ্চমানের ছবি সহকারে জনসাধারণের কাছে কোন ঘটনার বিবরণ আজ অনেক সহজে পৌঁছে যায়—অতি অবশ্যই জনমত গঠনে তার প্রভাব ফেলে। বলা বাহুল্য, প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব সম্পর্কে গণতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার ওয়াকিবহাল। তাই সরকারের তরফ থেকে নিয়মিত সংবাদমাধ্যমগুলির জন্য প্রেস্ বিবৃতি দেওয়া হয় বা প্রেস্ কনফারেন্স করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রেসের মাধ্যমে সরকার জনসাধারণকে তার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সচেতন করতে ও প্রভাবিত করতে সচেষ্ট থাকে। সংবাদমাধ্যম সরকারের পক্ষে থাকলে সরকারের পক্ষে নীতিগ্রহণ ও তা রূপায়ণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, সংবাদমাধ্যম সরকারের বিরুদ্ধে গেলে সেই প্রচার সরকারের ক্ষতি সাধন করতে পারে, এমনকি সরকারের পতনের কারণও হতে পারে।

কাঠামোগত দায়বদ্ধতা

ক্রমোচ্চ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কাঠামোগতভাবে দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দেখা যায়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে থাকা মন্ত্রীর কাছে তার অধীনস্ত আমলারা তাদের কার্যকলাপের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। ক্রমোচ্চ ব্যবস্থার পাশাপাশি, শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা, আদেশের ঐক্য, নিয়ন্ত্রণের ঐক্য, কর্তৃত্বের শৃঙ্খল, প্রভৃতি কাঠামোগত ভাবে দায়বদ্ধতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

অডিট্ ব্যবস্থা ও দায়বদ্ধতা

দায়বদ্ধতাকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখতে Audit ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সাংবিধানিক পদাধিকারী Comptroller and Auditor-General–এর নেতৃত্বে স্বতন্ত্র যে অডিট্ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে তা সরকারের আয় ব্যয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। আয়-ব্যয় যথাযথভাবে আইনকানুন মেনে হয়েছে কিনা তার হিসাব করে।

২.৪ উন্নয়নশীল দেশে দায়বদ্ধতা

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ-ই অতীতে কোন না কোন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনস্থ ছিল। ফলে সেই দেশগুলির শাসন কাঠামোও সেই সাম্রাজ্যবাদী দেশের ধাঁচে গড়ে ওঠে। দায়বদ্ধতার ধারণাও সেই মতই তৈরি হয় পাশ্চাত্যের ধাঁচে। দেখা যায়, আমলারা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ থাকে। তাও, সেই দায়বদ্ধতার নিয়ম নীতি খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। এর ফলে, আমলাদের উপর মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ কতটা থাকবে তা অনেকটাই নির্ভর করে বাস্তব পরিস্থিতির উপর, আমলা ও মন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন এই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আমলারা তাদের বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতার জোরে, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাস্তবে, নানা দুর্বলতার কারণে আইনসভাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসনের উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে না; এটা বিশেষত দেখা যায় বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে। অর্থবহ আলোচনার জন্য প্রয়োজন তথ্য ও বিশেষ জ্ঞান, সাংসদদের মধ্যে এই দুটিরই ঘাটতি দেখা যায়। তাদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত নন, এমনকি কেউ কেউ আবার প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। ফলে, নানা বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের তথ্যনির্ভর আলোচনা করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়। সংসদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রাপ্তির পরিকাঠামোও অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল। ফলে অনেক সময়ই আলোচনা হয় নিয়মমাফিক, উপর উপর।

উন্নয়নশীল দেশে গণমাধ্যম অনেকক্ষেত্রেই সরকার নিয়ন্ত্রিত। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের পক্ষে সরকারের সমালোচনা করা কঠিন হয়। যে গণমাধ্যম সরকার নিয়ন্ত্রিত নয়, তার আবার অন্য ধরনের দুর্বলতা থাকে। যেমন, আর্থিক দুর্বলতা বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারার ক্ষেত্রে দুর্বলতা। ফলে উভয় প্রকারের গণমাধ্যমের ক্ষমতা সীমিত থেকে যায়।

আবার, তত্ত্বগত দিক থেকে বললে বলতে হয়, আমলারা মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশে প্রায়শই মন্ত্রী ও আমলার মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে এক ধরনের অ-শুভ আঁতাত গড়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, এর ফলে নাগরিকদের স্বার্থ ব্যাহত হয়।

গত শতকের আশির দশক থেকে জনপ্রশাসনে যে নতুন চিন্তাভাবনা উঠে আসে তার ফলে আমলা মন্ত্রী সম্পর্কের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকটা পরিবর্তিত হয়। সুশাসনের ধারণা গুরুত্ব পায় এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় স্বচ্ছতার আবশ্যিকতা।

২.৫ স্বচ্ছতা

সনাতন ওয়েবেরিয় দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারী কাজের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়া হত। সরকারী ক্রিয়াকলাপকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হত। ফাইল, নথি, চিঠি প্রভৃতিতে প্রায়শই উপরে ‘গোপনীয়’ শব্দটি লেখা থাকত। ধরেই নেওয়া হত তা জনগণের জানার কোন অধিকার নেই বা জনগণকে জানানোরও সরকারের কোন

দায়বদ্ধতা নেই। স্বচ্ছতার ধারণা এর ঠিক বিপরীত ধারণা। এর মূল অর্থ হল সরকারের নীতি ও ক্রিয়াকলাপকে জনসমক্ষে রাখা। *Oxford English Dictionary* অনুসারে, **'transparent'** শব্দটির অর্থ হল—**'frank, open, candid, ingenuous'**।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কিন্তু জনসাধারণের তথ্যের অধিকার ক্রমেই স্বীকৃত হতে থাকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা ১৯৪৬-এ তার প্রথম অধিবেশনে তথ্যের স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে উল্লেখ করে। সেটি সম্পর্কে বলা হয় **'a fundamental human right and the touchstone of all the freedoms to which the UN is consecrated"**। ১৯৪৮ সালে গৃহীত রাষ্ট্রপুঞ্জের **Declaration of Human Rights**-এ বলা হয়, **"everyone shall have the right to seek, receive, impart information and ideas through the media regardless of frontiers"**।

গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা ও সুশাসনের ধারণার সঙ্গে স্বচ্ছতার ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গণতন্ত্রে নাগরিকদের সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানার ও নিয়ন্ত্রণ করার শুধু যে পূর্ণ অধিকার আছে তা-ই নয়, সে বিষয়ে তাদের দায়িত্বও আছে। এই অধিকার ভোগ করতে ও দায়িত্ব পালন করতে হলে সরকার কী করছে না করছে তা জানা আবশ্যক। আর, স্বচ্ছতা না থাকলে তা জানা সম্ভব নয়। অমর্ত্য সেন তার গ্রন্থ *Development as Freedom*-এ পাঁচ ধরনের স্বাধীনতার উল্লেখ করেন; তার মধ্যে তিনি স্বচ্ছতার স্বাধীনতার কথা বলেন।

২.৬ তথ্যের অধিকার

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্যের অধিকারের প্রশ্নটি যুক্ত। সাম্প্রতিককালে নাগরিকদের তথ্যের অধিকার ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে। নাগরিক আজ কেবলমাত্র কিছু পরিষেবার উপভোক্তা নয়; সে সরকারের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রকও, আর সেই হিসাবে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তার জন্য চাই তথ্য। জনপ্রশাসন যথাযথভাবে স্বচ্ছ না হলে কিন্তু আশানুরূপ তথ্য পাওয়াও সম্ভব হয় না। ফলে, তথ্য পাওয়া অনেকটাই প্রশাসনিক স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে। প্রশাসন যত বেশি স্বচ্ছ হবে, তথ্য দিতে তার তত কম আপত্তি থাকবে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যে দেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বেশি থাকে সেখানে দূর্নীতির সম্ভাবনাও বেশি থাকে। লোকচক্ষুর আড়ালে দুর্নীতি বেড়ে ওঠে। আর্থিক দুর্নীতি থেকে শুরু করে স্বজন পোষণ অনেক সহজে ঘটে। স্বচ্ছতা দুর্নীতি রোধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তথ্যের অধিকার স্বচ্ছতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তথ্য জানার অধিকারের মধ্য দিয়ে নাগরিকরা সরকারের নানা নীতি ও কাজকর্ম বিষয়ে খবর সংগ্রহ করতে পারে ও তা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে বা জনসমক্ষে আনতে পারে।

তবে কোন প্রশাসনই সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারে না। অথবা সব বিষয়ের উপর তথ্য দিতে পারে না। স্বচ্ছতার মধ্যেও কিছু বিষয় থাকে যা মনে করা হয় গোপন রাখা প্রয়োজন। বিষয়গুলির অধিকাংশই নিরাপত্তা সংক্রান্ত। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সেই সব তথ্য লোক সমক্ষে আনা হয় না। তবে বলাবাহুল্য, এই গোপনীয় তথ্যের অংশ যত কম রাখা যায় তত ভাল।

ভারতে ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন সংসদে পাস হয়। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক গণব্যক্তিত্ব তার সংস্থার কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত, আয়-ব্যয়, কাঠামোগত তথ্য জনসমক্ষে রাখতে বাধ্য থাকে। এই আইন মোতাবেক যে

কোন তথ্য যা সংসদে পেস করা যায় তা থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করা যাবে না। এই আইন বলে কেন্দ্রীয় স্তরে থাকে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন। এই কমিশনের শীর্ষ স্থানে থাকেন প্রধান তথ্য কমিশনার। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে থাকে রাজ্য তথ্য কমিশন যার শীর্ষে থাকেন রাজ্য প্রধান তথ্য কমিশনার। এই তথ্য কমিশনারদের পৌর আদালতের সমান ক্ষমতা থাকে। ২০০৫-এর আইন অনুযায়ী প্রতিটি সরকারী অফিসেই জন তথ্য আধিকারিকের নাম ঘোষিত হতে হয়। কেউ সেই সংস্থা থেকে তথ্য চাইলে তিনি তা সরবরাহ করবেন। এর জন্য যথাযথভাবে একটি ফি সহ দরখাস্ত করতে হয়। তিরিশ দিনের মধ্যে সেই দরখাস্ত হয় নাকচ হয় নতুবা তথ্য দিতে হয়।

তবে তথ্য পাওয়ার উপর কিছু সমীবদ্ধতা আছে। যেমন, দেশের নিরাপত্তা, জাতীয় সংহতি ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত তথ্য, ব্যক্তির নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য, বিদেশ নীতির ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য বিষয়ক গোপনীয় তথ্য, প্রভৃতি তথ্যের দাবী অগ্রাহ্য হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পৌর সমাজ ও গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো দুর্বল হওয়ায় প্রায়শই স্বচ্ছতার অভাব দেখা দেয়। অতীতের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্যও তার অন্যতম কারণ। দেখা যায়, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার চারপাশে গোপনীয়তার এক বৃত্ত গড়ে তোলে। তথ্য সরবরাহ করার ব্যাপারে আমলাদের মধ্যে অনেক সময়ই তীব্র অনীহা দেখা যায়। তথ্যের দাবীকে তারা নিজেদের অবস্থানের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখে, এক ধরনের বিপন্নতা বোধ তাদের গ্রাস করে। অপর দিকে, জনগণের সংগঠিত ভাবে এগিয়ে এসে তথ্য দাবী করার পরিমণ্ডল এখনও দুর্বল। এই দুর্বলতার মূলে আছে আইনি জ্ঞানের অভাব, আর্থিক কারণ, পৌর সমাজের সার্বিক দুর্বলতা, ব্যাপক দুর্নীতি প্রভৃতি কারণ।

যারা এগিয়ে এসে তথ্য দাবী করে এবং তার ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়ের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে তৎপরতা প্রদর্শন করে তাদের নিরাপত্তাও অনেক সময়ে বিপন্ন হয়। তাদের নিরাপত্তার জন্য আইনী পদক্ষেপ নেওয়াও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে, ২০১৪-য় Whistleblowers Protection Act সংসদে পাস হয়।

২.৭ সুশাসন ও স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতা সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা আবশ্যক। কী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, কী সেই সিদ্ধান্ত এবং তার রূপায়ণ প্রক্রিয়া কী, তা জানা নাগরিকদের প্রয়োজন। তারই ভিত্তিতে সুশাসনের বিভিন্ন উপাদান সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব। সুশাসন নাগরিকদের শাসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবী করে। পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্য ছাড়া যথাযথ অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। আবার, মনে রাখা দরকার যে স্বচ্ছতা ছাড়া তথ্য পাওয়াও সম্ভব নয়। যে প্রশাসন গোপনীয়তার উপর জোর দেয় সে প্রশাসন তথ্যের অধিকারকেও মানবে না। সেখানে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এ সবই সুশাসনের পরিপন্থী। সুশাসন সার্বিক উন্নয়নমুখী। সেই উন্নয়ন জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি, প্রশাসন ও সমাজ দাবী করে। সে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা অপরিহার্য উপাদান।

২.৮ সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিককালে জনপ্রশাসনের নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভবের সাথে সাথে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ধারণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিষয়গুলি নতুন না হলেও তা নতুন মাত্রা পেয়েছে। উন্নয়নের লক্ষ্যে

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার যে তাগিদ আজ আমরা দেখি তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার ধারণা আলোচিত হচ্ছে।

দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আইন-কানুন, আইনের শাসন, সজাগ নাগরিক ও সক্রিয় পৌর সমাজ আবশ্যক। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার পথে নানা ধরনের বাধা লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে আছে নাগরিক সমাজের দুর্বলতা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সমস্যা ও ব্যাপক দুর্নীতি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এসব কিছু অতিক্রম করার চেষ্টা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে, তথ্যের অধিকারের গুরুত্ব মনে রাখা দরকার। ভারতবর্ষে তা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে একাধিক আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে।

২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) জনসাধারণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতার ধারণার বিবর্তন আলোচনা করুন।

(২) জনসাধারণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতার নানা দিক বিশ্লেষণ করুন।

(৩) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বোঝেন?

(২) জনগণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত করায় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন।

(৩) স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্যের অধিকার কিভাবে সম্পর্কিত?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) আমলারা তাদের কাজের জন্য কার কাছে দায়বদ্ধ থাকে?

(২) টীকা লিখুন—তথ্যের অধিকার

(৩) উন্নয়নশীল দেশে দায়বদ্ধতার প্রকৃতি লিখুন।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

T. N. Chaturvedi (ed), *Administrative Accountability,* New Delhi : IIPA, 1984.

M. Bhattacharya, *Restructuring Public Administration : Essays in Rehabilitation*, New Delhi : Jawahar, 1997.

S. R. Maheswari, *Open Government in India,* New Delhi : Macmillan, 1981.

S. K. Das, *Civil Service Reform and Structural Adjustment*, Delhi : Oxford University Press, 1998.

একক-৩ ❑ বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা হস্তান্তর ও উন্নয়ন

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ ও রূপ

৩.৪ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

৩.৫ উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ

৩.৬ সারসংক্ষেপ

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে সাধারণ ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।
- উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা গঠনে সহায়তা করা।

৩.২ ভূমিকা

বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, সাংবিধানিক আইন ও জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে আলোচিত। যদিও সাধারণভাবে বিকেন্দ্রীকরণকে বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়, নানা দিক থেকে মতান্তরের অবকাশ আছে। তার পরিধি, স্বরূপ ও সীমা প্রসঙ্গে নানা পন্ডিতের নানা মত। এই মতান্তরের পিছনে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থেকে শুরু করে ঐতিহাসিকসহ নানা কারণ লক্ষ্য করা যায়।

বিকেন্দ্রীকরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা যায়। ভৌগোলিক দিক থেকে সেটাকে দেখা যায়, কর্মবিন্যাসের দিক থেকে দেখা যায় আবার আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়েও আমরা আলোচনা করে থাকি। কাঠামোগত দিক থেকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণও উল্লেখযোগ্য।

মনে করা হয়, বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের পক্ষে অনুকূল; স্থানীয়ভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উন্নয়নের পথে সহায়ক। স্বাধীনতা-উত্তরকালে উন্নয়নশীল দেশগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জাতি গঠন ও উন্নয়নের লক্ষ্যের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে।

৩.৩ বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ ও রূপ

বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা কেন্দ্রীকরণের ধারণার বিপরীত ধারণা। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসাবে তা উচ্চতর প্রশাসনিক স্তর থেকে নিম্নতর স্তরে আইনী, বিচারালয় সংক্রান্ত বা প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তর বোঝায়। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন হয়; আবার সেই সমন্বয় কিভাবে হবে, কেমন হবে তা নিয়ে নানা জটিলতা থাকে। সংগঠনের আয়তন, কর্মীসংখ্যা, কাজের পরিধি যত বেড়ে যায় বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের তাগিদও তত বাড়ে। একটি সংগঠনের আয়তন যখন অনেকটাই বেড়ে যায় তখন অতিরিক্ত কাজের চাপ সামলাতে সংগঠন তার অভ্যন্তরে কিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ গড়ে, তাদের সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে কাজের দায়িত্ব বণ্টন করে। এই ভাবে একটি সংগঠনে বিকেন্দ্রীকৃত বিভাগ গড়ে ওঠে। একইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

বিকেন্দ্রীকরণের দুটি ধরণ বা রূপ দেখা যায়। একটি হল উল্লম্ব ও ভৌগোলিক (vertical and territorial), অন্যটি হল আনুভূমিক ও কার্যগত (horizontal and functional)। প্রথমটিতে সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষেত্রটিকে উল্লম্বভাবে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রই স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে, আনুভূমিক ও কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি বিভাগ সমপর্যায় স্তরের প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়; সেই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়।

বিকেন্দ্রীকরণের বেশ কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভার অনেকটাই কমানো সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিটি স্তরের মধ্যে কাজের বণ্টন হওয়ায় ও তার ফলে চাপ সীমিত হওয়ায় কাজের মান উন্নততর হওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক দিক থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জনগণের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব হয়। চতুর্থতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে লাল ফিতের ফাঁস, তথা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার জটিলতা অনেকটাই কমানো যায়। পঞ্চমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আলাদা আলাদা অঞ্চলের জন্য, তাদের আলাদা আলাদা ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে, আলাদা আলাদা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়। ষষ্ঠতঃ, বিকেন্দ্রীকরণ, সীমিত এলাকায় প্রশাসনিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোকে সম্ভবপর করে। সপ্তমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণ স্বশাসনের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। বিখ্যাত চিন্তাবিদ Harold Laski-র মতে, বিকেন্দ্রীকরণ হল “...a training in self-government”। এবং এটি তাদেরই ক্ষমতা দেয় যারা “those who feel most directly the consequences of those powers” (Harold J. Laski, *A Grammar of Politics,* George Allen & Unwin, 1960, পৃ. ৬১)। অষ্টমতঃ, বিভিন্ন স্তরে ক্রমোচ্চ কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে বিকেন্দ্রীকরণ আমলাতান্ত্রিকতাকে হ্রাস করে। নবমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সরকার ও জনগণের সব দিক থেকে যোগসূত্র জোরদার হয়। সরকারের কথা জনসাধারণের কাছে পৌঁছায়, জনসাধারণের কথা সরকারের কাছে পৌঁছায় সহজে এবং দ্রুত।

বিকেন্দ্রীকরণের কিছু সমস্যার কথা অবশ্য মাথায় রাখা দরকার। প্রথমতঃ, বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পেতে হলে বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন। সমন্বয়ের অভাব ঘটলে অযথা সংঘাত ঘটতে ও কাজের পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি অংশ বা স্তরের কাজের এক্তিয়ার সঠিকভাবে নির্দিষ্ট না

হলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় গোষ্ঠীদের দিক থেকে অতিরিক্ত চাপ আসতে পারে।

ক্ষমতা হস্তান্তর হল নিয়মমাফিক প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্থার হাতে আইন মোতাবেক বিশেষ কিছু কাজ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা। H. Maddick-এর কথায় **"the legal conferring of powers to discharge specified or residual functions upon formally constituted local authorities."** এইভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে সংবিধান বা আইন সংশোধন না করে সে ক্ষমতা প্রত্যাহার করা যায় না।

সুষ্ঠ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য যে নীতিগুলি মেনে চলা প্রয়োজন সেগুলি হল—

(১) হস্তান্তরের বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আকারে হওয়া দরকার।

(২) প্রতিটি স্তরের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সীমারেখা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(৩) ক্ষমতা হস্তান্তর সুপরিকল্পিত ও বাস্তবসম্মত হওয়া দরকার।

(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নতর স্তরের আধিকারিকদের দায়বদ্ধতা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় থাকা দরকার।

(৬) সংগঠনের ভিতর উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা আবশ্যক।

৩.৪ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ

সাম্প্রতিককালে বিকেন্দ্রীকরণকে গণতন্ত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক মনে করা হয়। বিকেন্দ্রীকরণ বললে আমরা সরাসরিভাবে গণতন্ত্রের সাথে তার যোগ দেখি না। বিকেন্দ্রীকরণ সরাসরিভাবে দেখলে বলা যায় একটি আইনি, প্রশাসনিক কাঠামোগত ব্যবস্থা। সেটির সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যোগ থাকতেও পারে আবার নাও পারে। তাই, আমরা আজ শুধু বিকেন্দ্রীকরণ নয়, জোর দিই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের উপর; অর্থাৎ, 'গণতান্ত্রিক' শব্দটিকে 'বিকেন্দ্রীকরণের' সাথে যুক্ত করে দেখি। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বললে শুধু কার্যগত বা এলাকা ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ বোঝায় না। এতে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার পূণর্বিন্যাসের একটা ছবি ফুটে ওঠে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বোঝায়। জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ও স্বাধিকার থাকে।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম গুণ হল এটি গণতন্ত্রের পরিধিকে বিস্তৃত করে। যাদের জন্য পরিকল্পনা তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তার সাথে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এখানে ক্ষমতা যে উৎস থেকে প্রবাহিত হয় সেটিও যেমন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সেই ক্ষমতার অংশবিশেষ হস্তান্তরিত হয় সেটিও গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

ক্ষমতা হস্তান্তর নানা ধরনের হ'তে পারে। তা সম্পূর্ণ বা আংশিক হতে পারে, শর্তাধীন বা নিঃশর্ত হতে পারে; আনুষ্ঠানিক বা অ-আনুষ্ঠানিক হতে পারে; আবার প্রত্যক্ষ বা মধ্যবর্তী হতে পারে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কাঠামোগত বা সাংগঠনিক বাধার পাশাপাশি অনেক সময়ে ব্যক্তিগত বাধাও উঠে

আসে। সাংগঠনিক বাধার উদাহরণ হিসাবে দেখা যায় নিয়মকানুনের অভাব বা অস্পষ্টতা অথবা উপযুক্ত যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব। আবার, ব্যক্তিগত বাধার দিক থেকে থাকে আধিকারিকদের ব্যক্তিত্বের ধরণ, অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্খা, শ্লথতা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতের সীমাবদ্ধতা।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ যেমন কার্যকারিতার উপর জোর দেয়, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ কিন্তু আরো কিছু আনার চেষ্টা করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নিম্নতর আধিকারিক ও সংস্থাদের কাজের সুবিধার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ তার পাশাপাশি জনসাধারণকে নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার অধিকার দেয়। সেদিক থেকে নিছক বিকেন্দ্রীকরণের তুলনায় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের পরিধি ব্যাপকতর। প্রথমটায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা জনগণকে দেওয়া হয়, দ্বিতীয়টায় জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করা হয়।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের স্থানীয় স্বশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, যদিও দুটি ধারণা এক নয়। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ একটি রাজনৈতিক ধারণা; স্থানীয় স্বশাসন একটি কাঠামোগত বিন্যাস ব্যবস্থা। তবে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের চেতনা অনেকটাই এই কাঠামোগত বিন্যাসের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। যথা পঞ্চায়েত বা পৌরসংস্থার মাধ্যমে জনগণ স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন কোন পথে হবে সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও ভোট প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আবার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের এটি একটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর নিম্নতম স্তর।

এই স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলি জনসাধারণের খুব কাছের; ফলে স্থানীয় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন উপলব্ধি করার পক্ষে বিষেভভাবে উপযুক্ত। জনসাধারণের মধ্যে যথাযথ চেতনার উন্মেষ ঘটলে গণতান্ত্রিকীকরণের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। Hugh Tinker সঠিকভাবেই বলেন, "A healthy system of local government offers almost the only method of keeping a check on the new bureaucracy created by the growth in the activities of the state." [Hugh Tinker, *Foundations of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma*, Bombay, ১৯৬৭, পৃ. ৩৪৬]

তবে সমস্যাও আছে। গ্রামীণ সমাজে প্রায়শই দেখা যায় ধর্ম, জাতি বা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রবল; প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা নানা অত্যাচারের শিকার। কুসংস্কারের শিকড় সমাজের অতি গভীরে প্রোথিত। এ হেন পরিস্থিতিতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের সংস্থাগুলির মধ্যেও এর কুপ্রভাব দেখা যায়। ফলে, সঠিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে উচ্চতর স্তরের হস্তক্ষেপ ও পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে।

আরো একটি সমস্যার দিক আছে। উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ বা রূপায়ণ করা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে বহু তথ্য সংগ্রহ করা, বিশ্লেষণ করা ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। এ কাজ সঠিকভাবে করতে হলে বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন হয়। বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া এটা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই বিশেষজ্ঞ সহায়তা স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা শক্ত, ফলে উপর থেকে সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা দরকার 'সহায়তা' যেন 'নিয়ন্ত্রণ'-এ পরিণত না হয়!

কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও আজ প্রায় সবাই গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব স্বীকার করেন। বামপন্থী থেকে শুরু করে নয়া উদারনীতিবাদীরা ও পরিবেশবিদরা সবাই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকে সুশাসনের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করছে।

৩.৫ উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ

উন্নয়ন বললে আমরা সাধারণত উন্নততর এক জীবনযাত্রার মান লাভ করার কথা ভাবি। সেই পথে অগ্রসর হওয়ার দিকে তাকাই। এটি পরিবর্তন, তবে যে কোন ধরনের পরিবর্তন নয়। এই পরিবর্তনের ধারণার পিছনে বিশেষ লক্ষ্য আছে, বলা যেতে পারে একধরণের মূল্যবোধ বা দর্শন। সে দর্শন সাম্যভিত্তিক, উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দর্শন। ইউনাইটেড্ নেসন্স্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা UNDP-র মতে উন্নয়নের অর্থ হল, **"to lead long and healthy lives, to be knowledgeable, to have access to the resources needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community."**

উন্নয়নের ধারণা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ধারণা নয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে আমরা Gross Domestic Product (GDP)-র প্রেক্ষিতে দেখি। উন্নয়নের ধারণায় কিন্তু জনগণের সার্বিক কল্যাণের ছবি ধরা পড়ে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি অবশ্যই এর একটা দিক, তবে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হলেই যে তার সুফল সব অংশের মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রকৃত উন্নয়নের উপাদানগুলি বিবেচনা করলে দেখা যায় সেগুলির লক্ষ্য হল—

(১) দারিদ্র্য হ্রাস করা।

(২) জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করা।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল জনগণের মধ্যে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া।

(৪) জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া।

(৫) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি যার ফলে উৎপাদন ও পরিষেবা বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

(৬) মানুষের সামনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকল্পগুলির পরিধি বৃদ্ধি করা।

(৭) উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নাগরিকদের আরো সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

ক্রমেই উন্নয়নের ধারণা অর্থনৈতিক পরিধি অতিক্রম করে বৃহত্তর রূপ ধারণ করে সেখানে সরকার, বাজার ও পৌর সমাজের ভূমিকা স্বীকৃত। সে উন্নয়ন 'মানবকেন্দ্রিক' সামাজিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর জোর দেয়। এই উন্নয়নের চিন্তাভাবনায় মানবাধিকার, সমাজিক ন্যায়, আইনের শাসন ও রাজনৈতিক সাম্য গুরুত্ব পায়।

স্বাধীন ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক, জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় একদিকে যেমন সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখা যায় তেমনই অপরদিকে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক উদারনীতিবাদ ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণকে সেই ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। মনে করা হয়, যথার্থ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উন্নয়ন জনমুখী হয়ে উঠতে পারে; কেন্দ্রীয় নির্দেশনামা, কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠান সমুহ ও আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তা সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পরিকল্পনা ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তারই সঙ্গে উঠে আসে উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন করার চাহিদা। অর্থাৎ, Sustainable Development-এর ধারণা।

ভারতবর্ষে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়। সে সময়ে ভারত সরকার বলবন্ত রাই মেহতা কমিটির পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ক সুপারিশ গ্রহণ করে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়। তাতে জেলা স্তরে জেলা পরিষদ, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সীমিত আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হলেও প্রতিনিধিরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন। ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে উন্নততর করার লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়। All-India Panchayat Parishad, Consultative Council on Panchayat Raj ও Central Council of Local Self-Government-এর মতো সংস্থা গঠিত হয়। মূল লক্ষ্য বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে উন্নত করা, সেখানে সমন্বয় ঘটানো এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা। তবে ১৯৫৯-এ পঞ্চায়েতি রাজের সূচনা থেকে শুরু করে ১৯৭৭ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনেকটাই দুর্বল ছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতার বা আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ অল্পই হয়েছিল; এ ব্যাপারে প্রশাসনিক বা সাংবিধানিক পরিবর্তনও বিশেষ দেখা যায়নি। তবে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কিছু উন্নয়ন সংস্থা স্থাপিত হয় যথা CADC, DPAP, IRDP, DRDA প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পিত ও আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করতে পঞ্চায়েতের সঙ্গে সহযোগিতায় এই সংস্থাগুলির কাজ করার কথা।

ক্রমেই দেখা যায় যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে তিনটি রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮-এর Committee on Panchayati Raj Institutions, ১৯৮৪-র Working Group on District Planning এবং ১৯৮৫-এর Committee to Review the Existing Administrative Arrangements for Rural Development and Poverty Alleviation Programmes (CAARD) এর রিপোর্ট।

বিভিন্ন আলাপ আলোচনার পর বিকেন্দ্রীকরণকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯২-তে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনী আনা হল। ৭৩তম সংশোধনী পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে এবং ৭৪তম সংশোধনী পৌর সংস্থাগুলি প্রসঙ্গে। এই সংবিধান সংশোধনীগুলির ফলে বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থা সাংবিধানিক মর্য্যাদা লাভ করে। গ্রামীণ স্তরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে জনগণের হাতে স্থানীয় সম্পদ, তার ব্যবহার ও উন্নয়নমুখী কর্মসূচী গড়ে তোলার ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলে তারই পরিপূরক হিসাবে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী 243ZD ধারা ও 243ZE ধারা সংবিধানে সংযোজিত করে; এর মাধ্যমে যথাক্রমে District Planning Committee (DPC) ও Metropolitan Planning Committee (MPC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তর থেকে উঠে আসা পরিকল্পনার সঙ্গে জেলা স্তরের পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়।

গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা, ১৯৮৯ থেকে

প্রবর্তিত জওহর রোজগার যোজনা (JRY) রূপায়নের ক্ষেত্রে ১৯৯৩-৯৪-এ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এই প্রকল্পের সাথে দুটি নতুন প্রকল্প যুক্ত করা হয়। এই দুটি প্রকল্প বা Sub-scheme হল ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY) ও মিলিয়ন ওয়েলস্ স্কিম (MWS)।

সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধন চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রশাসন তৃণমূল স্তরের প্রান্তিক মানুষের থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ছিল। নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই সীমাবদ্ধতা কিছুটা হলেও দূর হয়। তফসিলি জাতি, জনজাতি, অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণিভুক্তদের ও নারীদের উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে অনেক বেশি সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ও তা রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। জনসাধারণের উন্নয়নক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক শাসনের লক্ষ্যে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ; সুশাসনের দিকে এক ধাপ এগোনো। এক্ষেত্রে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুকে বৃহত্তর স্তর বা Macro level থেকে ক্ষুদ্র স্তর বা micro level-এ নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে। নতুন ব্যবস্থার ফলে চিরাচরিত ক্ষমতার বিন্যাস কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা এখনও থেকে গেছে। সেগুলির কথা ২০০২-এ ৬ এপ্রিল-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত প্রধানদের জাতীয় কনফারেন্স-এ আলোচিত হয়। আলোচনায় উঠে আসে ১৯৯২-এর সংবিধান সংশোধনের দুর্বলতার কথা। মনে করা হয়, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের চাহিদাগুলি যথাযথভাবে পূরণ করা হয়নি। স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণকে আরো জোরালো করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লিখিত হয়।

৩.৬ সারসংক্ষেপ

বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা হস্তান্তর ও উন্নয়ন একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রত্যেকটিই অপরিহার্য। তৃণমূল স্তরে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক বিকাশ আনা তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর আবশ্যক। বিকেন্দ্রীকরণ একাধারে রাজনৈতিক ও কাঠামোগত ধারণা। এর সঙ্গে স্থানীয় স্বশাসনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর নিম্নতর স্তর হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে ১৯৯২-র ৭৩-৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে নানা ধরনের সমস্যাও থেকে গেছে যেগুলোকে অতিক্রম করা আবশ্যক।

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(২) বিকেন্দ্রীকরণকে কি হিসাবে উন্নয়নের সহায়ক মনে করা হয় তা আলোচনা করুন।

(৩) ভারতে উন্নয়নের লক্ষে বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) ক্ষমতা হস্তান্তর বলতে আমরা কী বুঝি?

(২) উন্নয়নের মূল লক্ষ্য কী?

(৩) গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে আমরা কী বুঝি?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) বিকেন্দ্রীকরণের পাঁচটি সুবিধা লিখুন।

(২) ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কাম্য নীতিগুলি লিখুন।

(৩) বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে তিনটি রিপোর্ট উল্লেখ করুন।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

L. D. White, *Introduction to the Study of Public Administration,* New York, Macmillan, 1955

H. Maddick, *Democracy, Decentralization and Development,* Bombay : Asia Pub. 1966.

S. Mishra, *Democratic Decentralization in India : Study in Retrospect and Prospect,* New Delhi : Mittal, 1994.

A. Aziz and D. Arnold (eds), *Decentralized Governance in Asian Countries,* New Delhi, Sage, 1996.

P. Bardhan, 'Decentralization of Governance and Development', *Journal of Economic Perspectives,* vol. 16 (4), 2002.

James W. Fesler, *"Approaches to the Understanding of Decentralization." Journal of Politics,* XXVII, August 1965.

রাজশ্রী বসু, *জনপ্রশাসন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৫।

Mohit Bhattacharya, *Development Administration,* New Delhi, Jawahar Publishers, 1997.

একক-৪ ❑ ভারতীয় প্রেক্ষিতে সুশাসন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ ভারতীয় প্রেক্ষিত
৪.৪ আমলাতন্ত্রে পরিবর্তন
৪.৫ সিটিজেন্স্ চার্টার
৪.৬ স্বচ্ছ শাসন : তথ্যের অধিকার
৪.৭ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন
৪.৮ সারসংক্ষেপ
৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী
৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- ভারতীয় প্রেক্ষিতে সুশাসনের ধারণা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের আমলাতন্ত্রের পরিবর্তন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- সিটিজেন্স্ চার্টার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা প্রদান করা।
- স্বচ্ছ শাসনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে তথ্যের অধিকার বিষয়ে ধারণা প্রদান করা।
- ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।

৪.২ ভূমিকা

আজ জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সুশাসনের ধারণাটি উঠে আসে। মনে করা হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এটি মূল বিবেচ্য হওয়া উচিত। ১৯৯২-এ প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর *Governance and Development*-এ Governance-এর তিনটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রথমতঃ, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ, এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে। তৃতীয়তঃ, সরকারের নীতি রূপায়ণ করা ও সাধারণভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করার পরিকাঠামোগত ক্ষমতা থাকা।

বর্তমানে উন্নয়ন ও সুশাসনকে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মনে করা হয়। বর্তমানে উন্নয়নকে কেবলমাত্র আর্থিক বৃদ্ধি হিসাবে দেখা হয় না। উন্নয়ন বলতে বোঝায় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ থেকে শুরু করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা। আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার, সুশাসন না থাকলে সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বিশ্বব্যাঙ্ক উন্নয়ন ও সুশাসনকে সংযুক্তভাবে দেখার পক্ষে জোরালো সওয়াল করে। এই বক্তব্য তুলে ধরা হয় তার একাধিক প্রকাশনায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *Governance : The World Bank Experience,* যেটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৭-এ প্রকাশিত *The State is a Changing World*।

৪.৩ ভারতীয় প্রেক্ষিত

সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাপী শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে ভয়াবহ মন্দা দেখা দেয়। গোটা ইউরোপ এই মন্দার শিকার হয়। দক্ষিণপন্থী থেকে শুরু করে বামপন্থী সরকারগুলি সকলেরই টালমাটাল অবস্থা হয়। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের ছায়া দেখা যায়। বৈদেশিক ঋণের বোঝা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির ব্যর্থতা, বেকারত্ব, ছাঁটাই, শ্রমিক অসন্তোষে দেশগুলি তোলপাড় হতে থাকে। এর ফলে রাষ্ট্রের ভূমিকার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ হতে থাকলো। এহেন বৈধতার সংকটকালে সীমিত রাষ্ট্র ও মুক্ত অর্থনীতির পক্ষে সওয়াল ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রেগন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার। ক্রমেই পশ্চিমী দেশগুলি এই নীতিকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করে। এই উদারিকরণ প্রক্রিয়া ক্রমেই বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে। উদারিকরণনীতি গ্রহণের পক্ষে আর্থিক সঙ্কটাপন্ন দেশগুলির উপর বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মনিটারি ফান্ডের চাপ আসে। উদারিকরণ নীতির মূল প্রতিপাদ্য ছিল সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ কমানো, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা; প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বাড়ানো ও বাজার পরিচালনা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা বাড়ানো।

১৯৯১ সালে ভারতের নরসীমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৯০-৯১ সালে ভারতের অর্থনীতি চরম সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি যথা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আই. এম. এফ.-এর দিক থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার মেনে নেওয়ার জন্য জোরালো চাপ আসছিল। এ হেন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নতুন অর্থনীতি সংক্রান্ত ঘোষণা হয়। পূর্ববর্তী চার দশক অনুসৃত নেহরু মডেলের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তাভাবনার অবসান ঘটে। পশ্চিমের দেশগুলির মতই ভারত উদারীকরণ ও মুক্ত বাজারের অর্থনীতি গ্রহণ করে; কাঠামোগত সমঝোতা বা Structural Adjustment-এর ভিত্তিতে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। ১৯৯২-৯৭ সালের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের ভূমিকা ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে পূণর্মূল্যায়ন ও পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। সরকারি ক্ষেত্রের পুণর্গঠন প্রয়োজন এমনটাই মনে করা হয়। মনে করা হয়, সরকারের সঠিক কাজ হবে বেসরকারি সংস্থা, পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের উপযুক্ত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উঠে আসে সুশাসনের বিষয়টি। ১৯৯৬-এ নভেম্বর মাসে Chief Secretary-দের কনফারেন্স্-এ বিষয়টি আলোচিত হয়। এই সম্মেলন থেকে সরকারে প্রশাসনিক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বেশ কিছু

সুপারিশ উঠে আসে। ভারতের অর্থনীতিকে বাজারমুখী করার লক্ষ্যেই এই সুপারিশগুলি করা হয়। সুশাসনের চিন্তাভাবনা তারই অংশ বিশেষ। এই সম্মেলনে উঠে আসা সিদ্ধান্তগুলি জনসাধারণের মতামতের জন্য তুলে ধরা হয়। সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে, বেসরকারি সংস্থা, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক গোষ্ঠী প্রভৃতির মতামত আহবান করা হয়। ১৯৯৭-এর মে মাসে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয়; সেখানে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারা Chief Secretary-দের প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন এবং একটি Action Plan গ্রহণ করেন। শুরু হয় সরকারিভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, স্বাধীন ভারতে শুরু থেকেই জাতি গঠন (nation-building) এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (ocio-economic development)-এর উপর জোর দেওয়া হয়। এমনকি স্বাধীনতার আগেও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যে প্রায়শই উঠে আসে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার সময়ে গণপরিষদে নেহরুর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, "The first task of the Assembly is to free India through a new Constitution, to feed the starving people and clothe the naked masses, and to give every Indian fullest opportunity to develop himself according to his capacity.... If we cannot solve this problem soon, all our paper Constitutions will become useless and purposeless."

অর্থাৎ, গণপরিষদের সামনে প্রথম কাজ হল একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে ভারতকে মুক্ত করা, ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য দেওয়া, নগ্ন মানুষকে আভরণ দেওয়া আর প্রতিটি ভারতীয়কে নিজের বিকাশ ঘটানোর পুর্ণ সুযোগ করে দেওয়া।...এই সমস্যার আশু সমাধান না করতে পারলে আমাদের সমস্ত কাগুজে সংবিধান ব্যর্থ হবে। তবে সংবিধান রচনার সময়ে Governance শব্দটির খুব একটা ব্যবহার ছিল না। সংবিধানের প্রস্তাবনায় শব্দটি একবারও ব্যবহৃত হয়নি। দেখা যায়, শব্দটি একবার মাত্র সংবিধানে ব্যবহৃত হয়েছে সেটি Directive Principles of State Policy-তে ৩৭নং ধরায়। সেখানে বলা হয়, "The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws."

Directive Principles of State Policy-তে উল্লিখিত নীতিগুলির মধ্যে আছে—

(১) জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার যথাযথ পদ্ধতির অধিকার।

(২) জনগোষ্ঠীর সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার এমন ভাবে বিস্তৃত হবে যাতে সর্বাধিক জনকল্যাণ সম্ভব হয়।

(৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত নয় যাতে সম্পদ জনস্বার্থের বিপক্ষে কুক্ষিগত হয়।

(৪) একই কাজের জন্য পুরুষ ও নারীর সমান মজুরি হওয়া।

(৫) পুরুষ ও নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা ও শিশুদের বয়স যেন লাঞ্ছিত না হয় এবং আর্থিক কারণে যেন নাগরিকরা এমন পেশায় প্রবেশ করতে বাধ্য না হয় যেটা তাদের বয়স ও ক্ষমতার অনুপযুক্ত।

দেখা যায়, Directive Principles-এ শাসন প্রক্রিয়ার ‘content’-এর উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৯৭-এ শিশুদের সুরক্ষার জন্য আরো একটি নীতি এই তালিকায় স্থান পায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হওয়া, তথা তৃণমূল স্তরে প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে Governance-এর ধারণার বাস্তবায়ন কিছুটা হলেও অগ্রসর হয়। ১৯৭৮-এর অশোক মেহ্‌তা কমিটির সুপারিশের ফলে দেখা যায় ১৯৮০-র দশকে পঞ্চায়েতের বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। কারণ হল, পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থাগুলিকে এবার কেবলমাত্র উন্নয়নের সংস্থা হিসাবে না রেখে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে, আমরা জানি, সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় স্ব-শাসন সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। তবে, সমস্যা হল, তার পরও ক্ষমতা হস্তান্তর অনেকটাই রাজ্য সরকারগুলির মর্জির উপর থেকে যায়। তবু, তার ইতিবাচক দিক হিসাবে দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা বাধ্যতামূলক হয়, সরাসরি নির্বাচিত গ্রাম সভার বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়; নারী, তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে; এবং প্রতি পাঁচ বছরে রাজ্য ফাইন্যান্স কমিশন স্থানীয় সংস্থাগুলি কি ভিত্তিতে এবং কত অনুদান রাজ্যের কাছ থেকে পাবে তার সুপারিশ করে।

৪.৪ আমলাতন্ত্রে পরিবর্তন

স্বাধীনতা-উত্তর ভারত তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকটাই বৃটিশ শাসনকালের কাঠামো থেকে প্রাপ্ত হয়। ভারতে শাসন কালে ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের উপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলেছিল। ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে শোষণ করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করা ও দখলীকৃত দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন যন্ত্রকে চিরস্থায়ী করা। ফলে, শাসন প্রক্রিয়ার মূল্য লক্ষ্য ছিল—

(১) দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(২) রাজস্ব সংগ্রহ করা।

(৩) ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখা।

(৪) ব্রিটিশ রাজের অনুগত বিশ্বস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

দেখা যায় স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারত ব্রিটিশ প্রশাসনিক ঐতিহ্যের কাঠামোগত, সমাজতাত্ত্বিক ও কার্যগত উত্তরাধিকার অনেকটাই বহন করে। সময়ের সাথে সাথে আমলাতন্ত্রকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা সম্পন্ন ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। কেউ কেউ তার ‘ওয়েবেরিয়’ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কেউ বা তাকে জাতি ধর্ম, গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা বড় জমির মালিকের পক্ষপাতিত্ব করতে দেখে।

স্বাধীনতার সময়ে প্রশাসনিক পরিকাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও দেখা যায় ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ১৯৬৪ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মারা যান; জাতীয় অর্থনীতির হাল খুব একটা ভাল ছিল না; প্রশাসনিক দূর্নীতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তার পাশাপাশি ছিল ব্যাপক রাজনৈতিক দূর্নীতি। এই পটভূমিতে প্রশাসনকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করার লক্ষ্যে Administrative Reforms Commission গঠিত হয়। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তখন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬৮ থেকে

১৯৭০ সালের মধ্যে এই কমিশন তার নির্ধারিত কাজ করে, ৫৮১টি প্রস্তাব সম্বলিত ১৯টি রিপোর্ট জমা দেয়। ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব আনা হয়। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সংস্কার আনার আরো নানাবিধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৬৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ‘committed bureaucracy’-র পক্ষে সওয়াল করেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭-এর ভিতর, ইমার্জেন্সির সময়ে, উচ্চ পর্যায়ের কিছু আমলার রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয়টি শাহ্ কমিশনের রিপোর্ট-এ সমালোচিত হয়।

নব্বই-এর দশকের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরে আমলাতন্ত্রে প্রথম সংস্কার আনার প্রস্তাব আসে পঞ্চম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশে। ১৯৯৬-এর এই সুপারিশে একদিকে যেমন সরকারের কাজের পরিধি ও দায়িত্ব হ্রাস করার কথা বলা হয়, অপর দিকে তেমন আমলাদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের মধ্যে ছিল “outsourcing”-এর সুপারিশ ও “public-private partnership”-এর সুপারিশ। মূল উদ্দেশ্য ছিল আমলাতন্ত্রকে আধিপত্যের স্থানে না রেখে সহযোগীর স্থানে নিয়ে আসা, যেখানে সরকার বাজার ও পৌর সমাজকে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করতে সাহায্য করবে। তবে, প্রশাসনিক ও আমলাতন্ত্রের সংস্কারের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গৃহীত হলেও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তা খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। প্রশাসন রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েনের মধ্যে আটকে থেকেছে। তার বিরুদ্ধে প্রায়শই পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে।

৪.৫ সিটিজেন্স্ চার্টার

নব্বই-এর দশক থেকে যে সুশাসনের ধারণা গুরুত্ব পেয়ে এসেছে, Citizen’s Charter-কে তার অপরিহার্য দিক বলে মনে করা হয়। এমন একটা সময়ে যখন জনপ্রশাসনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল এবং সার্বিকভাবে সরকারের যোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ছিল। Citizen’s Charter-কে অনেকটাই সুরাহার পথ হিসাবে দেখা হয়।

Citizen’s Charter-এর মূল বৈশিষ্ট্য হল (ক) জনপরিষেবার ক্ষেত্রে কাজের মানদন্ড প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত করা (খ) কর্ম প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা, (গ) উপভোক্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা ও তাদের চাহিদা সম্পর্কে জানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে গুরুত্ব দেওয়া, (ঘ) সমস্ত উপভোক্তাকে সমানভাবে পরিষেবা দেওয়া। আধিকারিকদের নামের ব্যাজ পরা উচিত ও নম্র সহযোগিতার আচরণ করা উচিত; (ঙ) যদি পরিষেবা দানে কোথাও কোন ভুল হয়, দ্রুত ক্ষমা প্রার্থনা করে তা শোধরানো উচিত। অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়া, যতটা সম্ভব, সুপ্রচারিত ও সহজ হওয়া দরকার। (চ) জাতীয় সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুযোগ্য পরিষেবা প্রদান করা উচিত এবং নাগরিক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত মানদন্ডের মাপকাঠিতে কাজের স্বাধীন মূল্যায়ন করা উচিত।

সুশাসনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। Citizen’s Charter সেই লক্ষ্যেই অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ। প্রতিদিন প্রশাসনের সাথে তার আদান প্রদানে নাগরিকরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেইগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই Citizen’s Charter-এর ধারণাটি আসে। পরিষেবা দাতা ও গ্রহিতার মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপন করা তার লক্ষ্য।

ব্রিটেনে ১৯৯১ সালে প্রথম এই ধারণাটি উঠে আসে ও গৃহীত হয়। এর লক্ষ্য ছিল নাগরিক স্বার্থ মাথায় রেখে ক্রমাগত পরিষেবা উন্নততর করা। মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন ঘটানো।

ব্রিটেনের এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অনেক দেশেই আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। এর ফলে যে রাষ্ট্রগুলি Citizen's Charter চালু করে তাদের মধ্যে ছিল অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, স্পেন প্রভৃতি। ভারতেও ১৯৯৭-এ Citizen's Charter চালু হয়।

৪.৬ স্বচ্ছ শাসন : তথ্যের অধিকার

তথ্যের অধিকারকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও সুশাসনের জন্য আজ অপরিহার্য্য মনে করা হয়। তথ্যের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনা সম্ভব; আর, কেবলমাত্র প্রশাসনিক স্বচ্ছতা থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

১৯৯৬-এর Chief Secretary-দের সম্মেলনে স্বচ্ছতা ও তথ্যের অধিকারের সপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। তারা মনে করে সমস্ত সরকারী দপ্তরে স্বচ্ছতা ও তথ্য পরিষেবার এক নতুন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তারা এও মনে করে যে সরকারে যত বেশি গোপনীয়তা থাকবে তত বেশি দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকবে।

নব্বই-এর দশক থেকে উঠে আসা এই চিন্তা ভাবনা স্পষ্টতই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিকোণ। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কার্যকলাপের বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখাই ছিল প্রচলিত রেওয়াজ। জনসাধারণ ও প্রচার মাধ্যমকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মূল বাধা ছিল ১৯২৩-এর Official Secrets Act। ১৯২৩-এর আইনটির ফলে সরকারী কর্মচারিদের কোন তথ্য প্রকাশ করাটা ছিল অপরাধ! এই আইনের ফলে সরকারি কর্মচারিরা নাগরিকদের কাছে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য অনেকাংশে গোপন রাখে।

নব্বই-এর দশক থেকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে Official Secrets Act-এর সংশোধন আনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। সেই মত সংশোধন আনা হয়। তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশনামা জারি করে সরকারি বিভাগগুলোর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা আনার প্রচেষ্টা চালায়।

কম্পিউটার নির্ভর National Informatics Centre (NIC) এর মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন আরো সহজ করা হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান সরাসরিভাবে জনসাধারণকে তথ্যের অধিকার না দিলেও মনে করা হয় তা প্রকারান্তরে ১৯নং (১) (ক) ধারায় দেওয়া আছে, যেখানে নাগরিকদের মত প্রকাশের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।

তথ্যের অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিতে ২০০৫-এ সংসদ তথ্যের অধিকার আইন বা Right to Information Act (RTI) পাস করে। এই আইনটির পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত, প্রশাসনের প্রায় সবটাই এর আওতায় আসে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন কোনটাই বাদ থাকে না। এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি সফল হবে এমনটাই মনে করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রসঙ্গে তার প্রস্তাবনায় বলা হয়

"...to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commission and for matters connected therewith and incidental thereto."

তথ্যের অধিকার আইনের মূল বক্তব্য হ'ল—

- নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে।
- এই 'তথ্য' বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা নথি, ই-মেল, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তথ্য প্রভৃতি।
- সাধারণতঃ একজন আবেদনকারী তার আবেদন করার তিরিশ দিনের মধ্যে তথ্য পেতে পারে।
- বিশেষ ক্ষেত্রে (যদি তা জীবন-মরণ বা স্বাধীনতার প্রশ্ন হয়) ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেও তথ্য পাওয়া যায়।
- লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে আবেদন জমা হলে সরকারি আধিকারিক তথ্য দিতে বাধ্য।
- বিশেষ কিছু ধরনের তথ্য দেওয়া অবশ্য নিষিদ্ধ আছে।
- তথ্য চেয়ে কেউ দরখাস্ত করতে চাইলে সে দরখাস্ত না নেওয়া বা যথা সময়ের মধ্যে তথ্য না দেওয়া জরিমানাযোগ্য অপরাধ।
- কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলিকে যথাক্রমে Central Information Commission ও State Information Commission গঠন করতে বলা হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থার ফলে, সরকারি সংস্থায় অনেক বেশি স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা আনা সম্ভব। সে দিক থেকে বিচার করলে মানতেই হয় তথ্যের অধিকার আইন নিঃসন্দেহে সুশাসনের দিকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

৪.৭ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সুশাসন

নব্বই-এর দশক থেকে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে। বৈদ্যুতিক মাধ্যমে, দ্রুত, সহজভাবে, কম ব্যয়ে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। শাসন অনেকটাই ই-শাসনের রূপ নেয়। Manuel Castells তাঁর গ্রন্থ *The Information Age : Economy, Society and Culture* (Book I)[Oxford : Blackwell, 1996]-এ লেখেন :

"As a historical trend, dominant functions and processes in the information age are increasingly organized around networks."

ই-গভর্নেন্স-এর মূল অর্থ হল কম্পিউটারের মাধ্যমে সরকারের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা ও online পরিষেবা প্রদান করা। ভারত সরকার এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাসনকে SMART শাসনে রূপান্তরিত করার কথা বলে। এই SMART শাসন হল Simple, Moral, Accountable, Responsive ও Transparent। অর্থাৎ, সহজ, নৈতিক,

দায়বদ্ধ, সংবেদনশীল ও স্বচ্ছ। Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), International network (internet), মোবাইল ও কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে আশা করা হয় এই উন্নততর পরিষেবা সম্ভব হবে।

উনিশশো আশির দশকে ভারতে সরকারি ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার প্রথম চালু হয়। নব্বই-এর দশকে তার ব্যবহার ব্যাপকতর হয়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ই-গভর্নেন্স-এর বিষয়টি গুরুত্ব পায়। একদিকে যেমন তার চাহিদা উঠে আসে। অপরদিকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় সরকারের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। অগ্রগতি এতই দ্রুত হয় যে দেখা যায় ২০১৪-র মধ্যে এক লক্ষ কোটি সরকারি ই-আদান প্রদান হয়। দু-একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র যেখানে নাগরিকরা online পরিষেবা পান—কেন্দ্রীয় সরকারের নির্মল ভারত অভিযান, পাসপোর্ট সেবা প্রকল্প, চন্ডিগড়ে ই-সম্পর্ক, কর্ণাটকের ভূমি প্রকল্প, মধ্যপ্রদেশের গ্রাম সম্পর্ক। যে দপ্তরগুলির কাজকর্মের ক্ষেত্রে ই-পরিষেবা লব্ধ হয় সেগুলির মধ্যে আছে ভুমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুলিশ, রেল।

ই-পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে নাগরিকদের পরিষেবা লাভ করা অনেকটাই সহজ হয়েছে। সরকারি কোন কাজ করতে হলে নাগরিকদের আগের মত লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয় না, জটিল প্রক্রিয়ায় সময় নষ্ট করতে হয় না। কর্মচারীদের আচরণের শিকারও হতে হয় না। যেখানে যেখানে ই-পরিষেবা পাওয়া যায় সেখানে নিঃসন্দেহে শাসন অনেক বেশি স্বচ্ছ, সংবেদনশীল ও দক্ষ। তবে, সমস্যা হল সব প্রত্যন্ত গ্রামে এই পরিষেবা এখনও যথাযথ ভাবে পৌঁছয়নি।

ই-গভর্নেন্স্ নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ও সার্বিক সুশাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভারতে এখনও বেশ কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। সেগুলির মধ্যে আছে—সবার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সুযোগ না থাকা, কম্পিউটার সংক্রান্ত জ্ঞান না থাকা, প্রথাগত শিক্ষার অভাব, পরিষেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি।

৪.৮ সারসংক্ষেপ

জনপ্রশাসনের চিন্তাভাবনায় আজ সুশাসনের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সনাতন জনপ্রশাসনের চিন্তা ছিল প্রশাসনিক পরিকাঠামো কেন্দ্রিক। সুশাসনের ধারণা শাসনের ক্রিয়া নির্ভর, মূল্যভিত্তিক ধারণা। নব্বই-এর দশক থেকে বিশ্বের পরিবর্তিত আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেশে দেশে অনুভুত হয়। এই পটভূমিতে ভারতও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই সুশাসনের শর্ত হল ব্যাপক প্রশাসনিক পরিবর্তন যার সহায়তায় প্রশাসন, পৌর সমাজ ও বাজারের তৎপরতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। নাগরিকরা স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, সংবেদনশীল পরিষেবা পাবে। প্রশাসনিক নানা পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল Citizen's Charter ব্যবস্থা চালু করা, তথ্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বাড়ানো ও দুর্নীতির সম্ভাবনা হ্রাস করা, এবং ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে উপভোক্তাদের উন্নততর পরিষেবা প্রদান করা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও নানা আর্থ-সামাজিক সমস্যা পূর্ণ সুফল লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) ভারতে সুশাসন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার উদ্ভবের প্রেক্ষিত আলোচনা করুন।

(২) ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা আলোচনা করুন।

(৩) তথ্যের অধিকার সুরক্ষিত করতে ভারত সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) ১৯৯৬-এর Secretaries Conference-এর গুরুত্ব কী ছিল?

(২) Citizen's Charter-এর ধারণা সম্পর্কে লিখুন।

(৩) সুশাসন বলতে কি ধরনের শাসন বোঝায়?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল?

(২) ভারতে তথ্যের অধিকারের মূল বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(৩) SMART শাসন বলতে কি বোঝেন?

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Mohit Bhattacharya, *New Horizons of Public Administration*, Jawahar Publishers, New Delhi, 2003.

Rumki Basu, *Public Administration : Concepts and Theories*, Sterling Publishers, New Delhi, 1994.

S. K. Chopra (ed), *Towards Good Governance,* Delhi : Konark, 1997

K. Mathur, *From Government to Governance : A Brief Survey of the Indian Experience,* Delhi : National Book Trust, 2008.

S. K. Das, *Civil Service Reform and Structural Adjustment,* New Delhi : OUP, 1998.

S. Munshi and B. P. Abraham (eds), *Good Governance, Democratic Society and Globalization,* New Delhi : Sage, 2004.

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিক জনপ্রশাসনের রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* নবোদয় পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ২০০৪।

রাজশ্রী বসু, *জনপ্রশাসন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৫।

পর্যায়—৪

জনপ্রশাসনের সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ

একক-১ ☐ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন
একক-২ ☐ জনপ্রশাসন ও সুশীল সমাজ
একক-৩ ☐ বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন
একক-৪ ☐ উদারিকরণের যুগে ভারতীয় প্রশাসন

একক-১ ❑ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসনের অর্থ
১.৪ জনপ্রশাসনে পিতৃতন্ত্র
১.৫ মানব মূলধন তত্ত্ব ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব
১.৬ জনপ্রশাসনে লিঙ্গ বৈচিত্র্যের সুবিধা
১.৭ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ইউ.এন.ডি.পি. **(U.N.D.P)** ও অন্যান্য প্রতিবেদন
১.৮ নারী ও জনপ্রশাসন—সামাজিক—সংস্কৃতিগত বাস্তবতা
১.৯ বিশ্বায়ন—সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ
১.১০ বিশ্বায়ন ও নারী
১.১১ সরকারি অফিসে লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধ বা সমাপ্তি সংক্রান্ত আইনসমূহ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)
১.১২ জনপ্রশাসনে প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কেস স্টাডি
১.১৩ বৃহত্তর লিঙ্গ সমতার জন্য একটি চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
১.১৪ উপসংহার
১.১৫ নমুনা প্রশ্নাবলী
১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা যাবে এবং তাদের বিশ্লেষণ করা সহজ হবে :

- লিঙ্গ ও জনপ্রশাসনের অর্থ।
- জনপ্রশাসনে ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অসম প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করে রচিত মানব মূলধন তত্ত্ব ও সামাজিক মূলধন তত্ত্ব।

- ইউ. এন. ডি. পি. ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, যেগুলি জনপ্রশাসনে লিঙ্গ-বৈষম্যের ধারার ওপর আলোকপাত করে।
- বিশ্বের অধিকাংশ সমাজেই লিঙ্গ-বৈষম্যের উপস্থিতি এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের জন্য দায়ী কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা।
- বিশ্বায়ন এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের সম্পর্ক।
- সরকারি অফিসে লিঙ্গ-বৈষম্য প্রতিরোধ সংক্রান্ত কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন।
- জনপ্রশাসনে লিঙ্গ-প্রশ্নসংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক কেস স্টাডি এবং লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

১.২ ভূমিকা

খাদ্য, বাসস্থান, পানীয় জলের যোগান বা গৃহপরিচালনা সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা সমাজে নানাভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, পরিচালনা, বা শাসনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে তারা বিবেচনার বাইরে ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রাষ্ট্রপরিচালনা, প্রশাসনিক নির্দেশদান ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিকোণকে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রগুলিতে নারীও পুরুষের সমান অংশগ্রহণের লক্ষ্য অর্জনের প্রতি চ্যালেঞ্জগুলিকে অতিক্রম করতে হবে এবং জনপ্রশাসনের আলোচনায় লিঙ্গপ্রেক্ষিতে যুক্ত করার পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। সমাজ পরিচালনা ও সংগঠনের আরো নিরাপদ ও টেকসই উপায় বিকাশের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাগুলির কেন্দ্রীয় বিষয় হল লিঙ্গমাত্রা।

১.৩ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসনের অর্থ

লিঙ্গ বলতে বোঝায় নারী বা পুরুষ হিসাবে অবস্থানকে। লিঙ্গ হল জৈবিক পার্থক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গযুক্ত। লিঙ্গ পার্থক্যের উৎপত্তি হয় একদিকে জৈবিক ক্রোমোজোম, মস্তিষ্ক কাঠামো এবং হরমোনের প্রভৃতি থেকে এবং অন্যদিকে সামাজিকভাবে নির্মিত লিঙ্গ ভূমিকা থেকে। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সংক্রান্ত পার্থক্য এবং উভয়ের পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিসর জৈবিক হতে পারে (নারী বা পুরুষ হিসাবে অস্তিত্ব), লিঙ্গ পরিচয় ও লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক কাঠামো (লিঙ্গ ভূমিকা ও সামাজিক ভূমিকা)ও হতে পারে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক আদানপ্রদান ও মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সামাজিকভাবে নির্মিত ভূমিকা, দায়িত্ব ও পরিচয় সৃষ্ট হয়—পুরুষ ও নারী বা বালক ও বালিকা হিসাবে। লিঙ্গ প্রেক্ষিত বিষয়টি সমাজে লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান। ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজের প্রাত্যহিক জীবনে তা সক্রিয় ও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও নিয়মনসমূহের মধ্যে লিঙ্গভূমিকা প্রতিফলিত হয়।

সমাজের লিঙ্গ সম্পর্কগুলি পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে চারটি ক্ষেত্রে—

(১) লিঙ্গভিত্তিক পরিচয় বা শারীরিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহের সমাহার (যা সমাজের মধ্যে বালক ও বালিকা এবং নারী ও পুরুষের পরস্পরের থেকে পৃথক করে রাখে);

(২) ব্যক্তিসত্তার অনুভূতি বা নারী ও পুরুষ বা বালিকা ও বালক হিসাবে তাদের স্বতন্ত্র ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের ধারণা বা বোধ;

(৩) বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা উপরোক্ত বোধ বা ধারণা দ্বারা পরিচালিত কার্যসমূহের ধরন;

(৪) সামাজিক অবস্থান বা পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজে নারী বা পুরুষ হিসাবে অধিকৃত স্থান।

লিঙ্গ সমাজের সব ক্ষেত্রগুলিকেই প্রভাবিত করে—সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। এই সব ক্ষেত্রগুলির মধ্যে লিঙ্গ সংক্রান্ত সামাজিক সম্পর্কগুলি ন্যায়সঙ্গত নয়—সেগুলি সর্বত্রই বালিকা ও নারীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল। সমাজের লিঙ্গ সম্পর্কগুলি এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে, নারীরা পরিবার, সম্প্রদায় বা সমাজের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় অধস্তন স্থান অধিকার করে। পরিসংখ্যানগতভাবে সামাজিক মইয়ের স্তর নির্বিশেষে তারা পুরুষদের তুলনায় মৌলিক সামাজিক সুবিধাগুলির ভোগ থেকে অনেক বেশি বঞ্চিত। একই শ্রেণী বা শ্রেণীগত বিভাগে অবস্থান করলেও পুরুষদের তুলনায় নারীরা পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার অনেক কম ক্ষমতা ভোগ করে। দারিদ্র্যের মাত্রাগত দিক থেকে দেখলে নারীদের দারিদ্র্যের বিষয়টি বেশ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। (বিশ্বের দরিদ্রদের মধ্যে ৬০%-ই হল নারী)। নারীরা অনেক কম সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকানা ভোগ করে, তাদের রোজগার কম, সম কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় তাদের মজুরী কম, দক্ষতার দিক থেকে তারা নিচে অবস্থান করে, দক্ষতাবিকাশের সুযোগ তারা কম পায় এবং পরিবার ও সরকারি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের যোগ কম থাকে। তারা যৌন নির্যাতন এবং গার্হস্থ্য ও অন্যান্য ধরনের হিংসার শিকার হয়। সমাজের পুরুষ সদস্যরা নানাভাবে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল। তারা সর্বত্র পুরুষদের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হয়। ফলে সব সমাজেই লিঙ্গভিত্তিক অন্যায্য ও নির্যাতন দেখা যায়।

জনপ্রশাসন হল সেইসব কাজ যেগুলির উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত কর্তৃত্ব দ্বারা ঘোষিত জননীতির পরিপূরণ বা প্রয়োগ। এটি সরকারের এক্তিয়ারের বিষয়। এটি হল প্রধান হাতিয়ার যার সাহায্যে জাতীয় নীতি ও কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ঘটে। আদর্শগতভাবে জনপ্রশাসনকে সাম্য, নিরপেক্ষতা, দায়িত্ববোধ, সততা ও ন্যায়বিচারের নীতিসমূহের দ্বারা পরিচালিত করা প্রয়োজন; জনপালনকৃত্যক এমন একটি অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে কাজ করবে, যেখানে নারী ও পুরুষ সমভাবে অংশগ্রহণ করতে ও নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে এবং উভয়েই পরিচালনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার শামিল হতে পারে। এই আদর্শের সঙ্গে বিশ্ব বাস্তবতা মেলে না। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্য যে জনপ্রশাসন ও রাজনীতিতে ন্যূনতম ৩০% নারী নেতৃত্ব পদে থাকবে, বাস্তবে জনপ্রশাসনের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি খুবই কম। অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই জনপ্রশাসন হল প্রধানত একটি পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যা লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্য ও প্রথাসমূহকে বজায় রাখে।

১.৪ জনপ্রশাসনে পিতৃতন্ত্র

ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে যে জনপ্রশাসন ও আমলাতন্ত্র সংক্রান্ত জনগণের ভাবনাচিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে লিঙ্গ বিষয়টি জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নারী-পুরুষ বিভাজন

প্রসঙ্গটি অনুধাবন না করে জনপ্রশাসনের আলোচনা সম্ভব নয়। আজকের যুগের জনপ্রশাসনেও লিঙ্গবিবেচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও সাধারণভাবে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা ও লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানকে উদ্দেশ্য হিসাবে প্রচার করা হয়।

জনপ্রশাসন শাস্ত্রের বিভিন্ন আলোচনায় প্রথম দিকে সংখ্যালঘু দৃষ্টিকোণকে উপেক্ষা করা হত এবং যেসব লেখায় নারীদের অভিজ্ঞতা বা অবদানের কথা থাকত, সেগুলি অগ্রাহ্য করা হত। ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে লিঙ্গ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। আমেরিকার পৌর অধিকার সংক্রান্ত আইনসমূহ সরকারি বিষয়ে সম সুযোগ প্রবর্তন করে এবং পেশা সুরক্ষা আইনগুলি সকলের পেশাগত স্বার্থসংরক্ষণের ওপর জোর দেয়। ফলে তখন থেকে জনপ্রশাসনে মার্কিন সংবিধান রচয়িতাগণের বক্তব্য এবং জনপ্রশাসনকে একাডেমিক শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠাতাদের বক্তব্য ও যুক্তিসমূহকে মেনে নেওয়া হয়। তার আগে আমরা দেখেছি ১৮৬৪ সালের মার্কিন সরকারের ঘোষণা; এই ঘোষণা অনুসারে সরকারের নারী কর্মচারীরা সম কাজের জন্য পুরুষদের অর্ধেক বেতন পাবে। যদিও বেতন সংক্রান্ত সাম্যের ধারণা পরবর্তীকালে স্বীকৃত হয়েছে, তাহলেও পেশা ও বেতনগত অসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ এখনও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। অনেক পরে ১৯৬৩ সালে মার্কিন সম বেতন আইন এক্ষেত্রে সাম্য সুনিশ্চিত করে। তাহলেও বর্তমান যুগেও নারীপুরুষের সম কাজের জন্য বেতনগত অসাম্যের অস্তিত্ব মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। পুরুষদের ১ ডলার আয়ের অনুপাতে নারীদের আয় হল ৭৭.৪% মাত্র। শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন ও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াগুলি বিংশশতকের লিঙ্গ অসাম্যকে আরও জোরদার করেছে।

জনপ্রশাসনে লিঙ্গভূমিকা সংক্রান্ত দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেখা যায়—প্রথমটি দক্ষতা ও বিষয়গত দিকগুলির ওপর এবং দ্বিতীয়টি সামাজিক ন্যায়ের দিকগুলির ওপর জোর দেয়। প্রথমটি পুংলিঙ্গবাচক এবং দ্বিতীয়টি স্ত্রীলিঙ্গবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে উভয় দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—নারী ও পুরুষ মিলিতভাবে সরকারি নীতিসমূহের সুদক্ষ রূপায়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন জনপ্রশাসনে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন ঘটে। জনপ্রশাসন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পুরুষদের আধিপত্যযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে—যেমন, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের জনপ্রশাসনসংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি (Social Science Research Council's Advisory Committee of Public Administration) জনপ্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে দক্ষতার ওপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রকফেলার ফাউন্ডেশন এই সময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার জন্য দরাজ হাতে অর্থসাহায্য করতে থাকে। পুংলিঙ্গবাচক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের প্রতি মার্কিন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়। ফলে জনপ্রশাসনের ওপরও তার প্রভাব পড়ে। ১৮৯০ সালে অর্থনীতির আলোচনার ধারার পরিবর্তন ঘটে—সাধারণ প্রবণতার বদলে পরিসংখ্যান ও গণিত বা কঠোর বাস্তবতার ওপর গুরুত্ব বৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে সমাজতত্ত্ব মানবসম্পর্ক সংক্রান্ত বিমূর্ত সামান্যীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশেষ জ্ঞানের ওপর জোর দিতে থাকে এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে উৎসাহ দিতে থাকে।

এই দ্বিবিভাজনের ফলে পরবর্তীকালে নারীরা প্রধানত সমাজসংক্রান্ত বিশেষ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে আর পুরুষ অর্থনীতি, শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করতে থাকে।

১.৫ মানব মূলধন তত্ত্ব ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব

উভয় তত্ত্বই জনপ্রশাসনে ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অসম প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করে। মানব মূলধন তত্ত্ব অনুসারে সরকারে নারী ও পুরুষদের স্বতন্ত্র ভূমিকার সৃষ্টি হয় কারণ ঐতিহাসিকভাবে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক চিন্তাধারাকে স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী হিসাবে বিবেচনা করা হত। এই তত্ত্ব আরও জানায় যে নারীদের লঘু ভূমিকার কারণ হল ব্যক্তিগত মানব মূলধনের ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগ খুব কম। এই তত্ত্বের সমর্থকরা মনে করতেন যে পুরুষরা সমাজে অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করে, কারণ তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে এবং তাই উন্নত ধরনের চাকরি জোগাড় করতে পারে। তাদের কাজের অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি।

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মানব মূলধন তত্ত্বের সমালোচনার উত্তরে কিছু গবেষক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এই তত্ত্বটিও মানব মূলধন তত্ত্বের মতো নারী ও পুরুষের যোগ্যতার পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু উভয় তত্ত্বের মধ্যে তফাৎ এই যে মানব মুলধন তত্ত্বটি কিছু সমাজতাত্ত্বিক বাধ্যতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেগুলি নারীদের উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনকে বাধাদান করে। এই তত্ত্বের আরও বক্তব্য, মানসিকতার দিক থেকে সমাজ পুরুষজাতিকে আক্রমণমূলক, উচ্চাকাঙ্খী ও আত্মবিশ্বাসী প্রকৃতিযুক্ত হিসাবে, অন্যদিকে নারীজাতিকে দয়াপ্রবণ স্নেহপরায়ণ, সংবেদনশীল ও কোমলস্বভাবযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। তাই নিয়োগকর্তারা সমযোগ্যতাসম্পন্ন হলেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের ‘নিকৃষ্টতর’ হিসাবে গণ্য করে। এই তত্ত্বটি অনুসারে পুরুষদের আধিপত্যযুক্ত পেশাগুলিতে নারীদের প্রবেশ সহজ নয়, কারণ সেখানে তাদের হয় অযোগ্য বা পুরুষদের তুলনায় কম যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব অনুসারে সমাজে নারীদের স্থান সম্পর্কে দেখা যায় সামাজিকভাবে কিছু সমাজতাত্ত্বিক নির্মাণ ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে নারীদের যোগ্যতাসংক্রান্ত কিছু গতানুগতিক বাঁধা ধরা ছক। সেগুলি দ্বারা সরকারি কাজের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিদের ধরন স্থিরীকৃত হয়। সমাজতাত্ত্বিক নির্মাণ অনুসারে নারীদের এলাকা হল গার্হস্থ্য কাজ, সন্তানের জন্মদান ও সন্তান প্রতিপালন। নারীদের সম্বন্ধে এই সমাজতাত্ত্বিক নির্মাণ এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যে তা জনপ্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির অংশযুক্ত হয়ে গেছে। কাজেই নারীদের পেশাগত উন্নতির ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে।

১.৬ জনপ্রশাসনে লিঙ্গবৈচিত্র্যের সুবিধা

জনপ্রশাসন শাস্ত্রটিকে যদি দক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়—উভয় আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হয়, তাহলে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের যোগ বা লিঙ্গবৈচিত্র্য বিশেষভাবে জরুরী। জনপ্রশাসন শাস্ত্রটি প্রথমে যখন প্রায়োগিক বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যার মধ্যে দক্ষতা ও কার্যকারিতাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হত। তার ফলে সামাজিক সাম্য, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ও সুযোগের সাম্য-সংক্রান্ত নীতিসমূহকে কম গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু এখন সরকারি ক্ষেত্রে নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বকে মেনে নেওয়া হয়, যার পিছনে মৌলিক যুক্তি হল যে, সরকারি ক্ষেত্রে যদি সামাজিক সংগঠনের লিঙ্গবৈচিত্র্যের যথার্থ প্রতিফলন হয়, তাহলে সরকার অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও সংবেদনশীল হয়। অর্থাৎ সর্বব্যাপী বিকাশ ও গণতান্ত্রিক শাসন সুনিশ্চিত করার

জন্য জনপ্রশাসনে উভয় লিঙ্গের উপস্থিতি বা লিঙ্গ বৈচিত্র্যের প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা থাকলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে আসে, স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয় এবং গণনীতির প্রতি জনগণের সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। এগুলি হল উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল সব ধরনের দেশের গণনীতিরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ। জনপ্রশাসন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের পুরুষদের সমান অংশগ্রহণ থাকলে তবেই নারীস্বার্থসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ পূর্ণভাবে বিবেচিত হয় এবং সেগুলির সঠিক সুরাহা সম্ভব হয়।

১.৭ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ইউ.এন.ডি.পি. (U.N.D.P) ও অন্যান্য প্রতিবেদন

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউ.এন.ডি.পি.) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে জাতীয় উন্নয়নের জন্য জনপ্রশাসনের গুরুত্বকে স্বীকার করে এবং জনপ্রশাসনে উভয় লিঙ্গের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করে। সংস্থাটি সরকারি কাজের সামর্থ্য বৃদ্ধি ও দক্ষতা সুদৃঢ়করণের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারিগরি ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে, মহিলা সরকারি পরিচালক ও কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে এবং নতুন প্রগতিমূলক ধারণার প্রবর্তন, পুরনো প্রথাসমূহের সংস্কার, মানবসম্পদের বিকাশ ও আন্তঃমন্ত্রী স্তরে সহযোগিতার ব্যবস্থা করে।

জনপ্রশাসনে লিঙ্গ বিষয়টির বিভিন্ন ধরন বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি ২০১৪ সালে নিম্নলিখিত সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলি উল্লেখ আছে—

(১) ইউ. এন. ডি. পি. তথ্য অনুসারে **প্রায় সব দেশেই জনপ্রশাসনের উচ্চতম স্তরগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব নেই**। এই সংস্থার মতে কয়েকটি দেশে মহিলাদের উন্নয়ন ঘটেছে দ্রুতহারে—কোস্টারিকায় ৪৬%, বৎসোয়ানায় ৪৫% ও কলম্বিয়ায় ৪০%। কিন্তু মহিলাদের নিম্নতর পদে চাকরি এবং সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভ্রমণব্যবস্থা ইত্যাদি কয়েকটি লঘু ক্ষেত্রে নিয়োগ হল সাধারণভাবে সব দেশেরই স্থায়ী প্রবণতা।

(২) **পেশা বিভাজন ক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত প্রবল**। নারীরা প্রধানত সহায়তা কর্মী বা লঘু পেশায় নিযুক্ত হয়, আর পুরুষরা যুক্ত থাকে সিদ্ধান্তগ্রহণ, পরিচালনা ইত্যাদি সংক্রান্ত উচ্চ পদে।

(৩) নারীরা প্রধানত **স্বল্পস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়,** স্থায়ী চাকরিতে নয়।

(৪) স্থানীয় সরকারে মহিলাদের নিয়োগ ঘটে অনেক বেশি। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্তরের নিচের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে কাউন্সিল সদস্য বা কাউন্সিল কর্মী হিসাবে মহিলাদের দেখা যায়, কিন্তু সেখানকার **শাসনবিভাগীয় কার্যনির্বাহী সংস্থার মেয়র বা উচ্চপদে তাদের প্রবেশ কম,** কারণ তা পুরুষদের এক্তিয়ারের বিষয় বলে পরিগণিত হয়।

(৫) রাজনীতি ক্ষেত্রে মহিলাদের **কিছুটা সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে, তবে সেই সংখ্যা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়**। ২০০৫ সালে নির্বাচিত মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের সংখ্যা ছিল ৮, ২০১২ সালে তা বেড়ে হয় ১৭; নারী মন্ত্রীদের অনুপাত ২০০৫-এ ছিল ১২.২% আর ২০১২ সালে তা হয় ১৬.৭%। রাজনীতিতে নারীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা দেখা যায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে।

(৬) **বেসরকারি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ স্তরের উচ্চপদে মহিলাদের অংশগ্রহণ এক-তৃতীয়াংশের কম** দেখা গেছে এবং দশজন পুরুষের অনুপাতে একজন মাত্র মহিলার বোর্ডরুমের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল।

(৭) **সম উচ্চপদ অর্জনের জন্য পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের উচ্চতর যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।** ১৯৭৯ ¢yõœe ¢!Á¿œë þ‹ y‟ ĵþ™% ¢î î ûþ ÷ï ¡ öï Äûx î ¢yöï î ûk ˝Ä„ þöï þŸ˝ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination বা CEDAW) এর প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সেগুলি হল—নারী পাচার রোধ, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি, বলপূর্বক বিবাহ ও বাল্যবিবাহের অবসান, প্রকট লিঙ্গ ও অন্যান্য বৈষম্যের অপসারণ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকারের সুনিশ্চিতকরণ, ভোটাধিকার প্রদান, মায়েদের সহায়তা, চাকরি ও ব্যবসাসংক্রান্ত অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি। এগুলির মাধ্যমে (CEDAW) চেয়েছিল নারী পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অসাম্যের প্রতিকার। (CEDAW)-এর মতে লিঙ্গবৈষম্য বলতে লিঙ্গের ভিত্তিতে যেকোন রকম ব্যতিক্রম, সীমাবদ্ধতা ও পৃথকীকরণকে বোঝায়; এই লিঙ্গবৈষম্যের উদ্দেশ্য হল বৈবাহিক অবস্থান নির্বিশেষে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে নারীদের মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিগত, পৌর বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, ভোগ ও ব্যবহারকে সীমিত বা নাকচ করা।

বাসিলিয়া ঐক্যমত দলিল, ২০১০ (Brasilia Consensus Document, 2010) সালে ৩৩টি ল্যাটিন আমেরিকান ও ক্যারিবীয় দেশ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এই দলিলটি এই দেশগুলির সরকারদের নারীদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য উজ্জীবিত করে।

১৮৯ দেশ দ্বারা স্বীকৃত বেজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন, ১৯৯৫ (Bejing Platform for Action, 1995)-এ আছে সব রকম জনপ্রশাসন ও সরকারি কাজে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের অঙ্গীকার।

সাউথ আফ্রিকার উন্নয়ন পর্যৎ (South African Development Council or SADC)-এর লিঙ্গ ও প্রোটোকল (Gender and Protocol) ২০০৮ সালে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা করে যে দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত পদগুলির (সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র মিলিয়ে) ৫০% মহিলাদের দ্বারা অধিকৃত হবে।

মানবাধিকারের ঘোষণার ২১নং ধারায় আছে—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে বা স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে তার দেশের সরকারি কাজে যোগ দেওয়ার অধিকার ভোগ করে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি তার দেশের সরকারি কাজে যোগদানের সমসুযোগ ও ক্ষমতা ভোগ করে।

১.৮ নারী ও জনপ্রশাসন—সামাজিক-সংস্কৃতিগত বাস্তবতা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই লিঙ্গবৈষম্য দেখা যায়—অবশ্যই বিভিন্ন মাত্রায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাঁধাধরা ও গতানুগতিক কিছু ছক এবং কিছু মিথ্যা বিশ্বাস ও ধারণা এই লিঙ্গবৈষম্যের জন্য দায়ী। কোথাও কোথাও লিঙ্গ বিবেচনা প্রকাশ্যভাবে প্রতীয়মান হয়, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত কিছু কিছু বিধি বা ব্যবস্থায় নারীদের প্রতি অসংবেদনশীল ভাষার ব্যবহার থাকে এবং জনপ্রশাসনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কর্মকর্তাদের পুরুষ সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কোথাও কোথাও বিধি, নিয়ম, নীতি বা কর্মসূচিগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হলেও নারীদের পক্ষে সেগুলি অসুবিধাজনক

বা অস্বস্তিকর, কারণ সেগুলি হয় নারীদের জৈবিক বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যসমূহকে গুরুত্ব দান করে না, যেমন নারীদের গর্ভাবস্থা বা শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয় না বা লিঙ্গসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রত্যাশা সংক্রান্ত পার্থক্যকে বিবেচনা করে না। ফলে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ কিছু নীতি বা বিধি জনপ্রশাসনে নারীবিরোধি অবস্থান-যুক্ত হয়ে পড়ে। লিঙ্গ সাম্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি বা নিয়মগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক দেশের জাতীয় শ্রম আইন মাতৃকালীন ছুটির জন্য বেতনব্যবস্থা অব্যাহত রাখে এবং যৌন হয়রানির সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কোথাও কোথাও জনপালনকৃত্যকদের জন্য সেগুলি থাকে না।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিধিনিয়মগুলি লিঙ্গভূমিকাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রায়শই বিধিনিয়মগুলি লিঙ্গভিত্তিক ধারণাসমূহের নেতিবাচক অর্থ নির্মাণ করে। অনেক দেশেই বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহী, পূর্ণ সময়ের জন্য কর্মসংস্থানে নিযুক্ত এবং অব্যাহতভাবে কর্মজীবনে যুক্ত নারীদের আক্রমণাত্মক ও পুরুষালি বলে চিহ্নিত করা হয়। এই চিন্তাধারার জন্য অনেক মহিলাই আংশিক সময়ের চাকরি নেন। আংশিক সময়ের চাকরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও উন্নতির সুযোগ কম থাকে।

অনেক পুরুষ কর্মচারী নারী কর্মচারীদের গুরুত্বহীন বলে গণ্য করেন, অনেকে নারী কর্মচারীদের পুরুষ কর্মচারীদের থেকে নিম্নকৃতির বলে গণ্য করেন। অনেক পুরুষ আবার নারী কর্মচারীদের বিদ্রুপের দৃষ্টিতে দেখেন।

অনেক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা সংস্কৃতি যৌন নির্যাতনকে দন্ডনীয় বলে ঘোষণা করে না। সেইসব ক্ষেত্রের জনপ্রশাসনে যুক্ত নারীদের আত্মবিশ্বাস বিঘ্নিত হয়। কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের ঘটনা নারীদের অনেক সময়ই হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। অনেকে কিভাবে এই ঘটনার রিপোর্ট করা যায়, সে সম্বন্ধে অজ্ঞ, অনেকে আবার তা রিপোর্ট করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন। অনেক দেশেই কর্মক্ষেত্রে মহিলা নির্যাতন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই শাস্তির বাস্তবায়ন ঠিকমতো হয় না।

নারীরা ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য জীবন ও কর্মক্ষেত্র উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে বাধ্য হয়। ফলে জনপ্রশাসনে পুরুষদের মত সমঅংশগ্রহণ তাদের ক্ষেত্রে কঠিন হয়। কাজে দীর্ঘসময় থাকা বা চুক্তিবন্ধ সময়ের থেকে বেশি ঘণ্টা ধরে কাজ করে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে অনেক কাজের পুংলিঙ্গবাচক মডেল বলে গণ্য করেন। দীর্ঘসময় ধরে কাজ বা কাজের পর অতিরিক্ত সময় থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শনের ফলে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু অনেক আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সেটাই হল রেওয়াজ। নারীদের পক্ষে দীর্ঘ সময় কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা অসুবিধাজনক, কারণ তাদের ওপর পারিবারিক দায়দায়িত্বের চাপ থাকে। পুরুষদের থেকে নারীদের ওপর সময়-চাপ অনেক বেশি। ফলে নারীরা খুব উচ্চ লক্ষ্য অনুসরণ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই নিরস্ত হতে বাধ্য হয়। অনেক নারী আবার মাতৃত্ব লাভের পর কর্মক্ষেত্র থেকে ইস্তফা প্রদান করে।

শিশুদের যত্ন নেওয়ার জন্য পরিকাঠামোর অভাব অনেক সমাজেই সমস্যার সৃষ্টি করে। এজাতীয় পরিকাঠামো থাকলে জনপ্রশাসনে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে নারীরা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে এবং জনপ্রশাসনও লাভবান হবে।

এই সমস্ত বিষয়গুলির ভিত্তিতে নারী কর্মীদের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত সমাধানগুলি গুরুত্বপূর্ণ—

(ক) নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই নমনীয় কাজের সময় থাকা প্রয়োজন।

(খ) কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উভয়কেই বৃহত্তর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

(গ) যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিধান ও তাদের সঠিক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(ঘ) কর্মস্থলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

(ঙ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতানুগতিক নারীবিরোধী ধারণাসমূহের দূরীকরণ করতে হবে এবং

(চ) নারীদের সরকারি কাজের সময়ে শিশু তত্ত্বাবধান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৯ বিশ্বায়ন—সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ

জনপ্রশাসন এখন আর জাতীয় সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিংশ শতকের শেষ থেকে বিশ্ববাজার একটি নতুন যুগের অভিমুখে চলেছে, যার বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত অর্থনীতি, যেখানে উৎপাদন, ভোগ ও সামাজিক সম্পর্কের অন্যান্য দিকগুলি বহুজাতিক মাত্রাযুক্ত বা বিশ্বায়নের অংশ। বিশ্বায়নের শক্তিসমূহ বাস্তব এবং সর্বত্র তাদের প্রভাবসমূহ অনুভূত হয়। বিশ্বায়নের ফল হিসাবে এসেছে মুক্ত বাজার, মুক্ত চিন্তাধারা ও মূলধনের মুক্ত চলাফেরা, পণ্যদ্রব্যের বিস্তার, ভোগের নতুন ধরন, প্রযুক্তি ও তথ্যের বৈচিত্র্য। ফলে সরকারি নীতি-পদ্ধতিগুলি ব্যবসা এবং আর্থিক বিনিয়োগ প্রবাহের ক্ষেত্রে সরলতা ও উন্মুক্ততা, শিল্পক্ষেত্রে লঘু নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ ও শিল্পসমূহের বেসরকারিকরণ ইত্যাদির দিকে ঝোঁকে। উদারনীতিবাদ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণকে ত্বরান্বিত করে এবং জাতি-রাষ্ট্রের সাবেকি সীমানাকে ম্লান করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ বিনিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু সামাজিক সুরক্ষার জন্য নতুন ধরনের কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে না। ফলে অনেক সামাজিক গোষ্ঠীগুলি বিশ্বায়নজনিত ঝুঁকি ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইউ.এন.সি.টি.এ.ডি (UNCTAD)-এর ব্যবসা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন (Trade and Development Report)-এ এবং ইউ.এন.ডি.পি.-র মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদনে (UNDP Human Development Report), ১৯৯৭ ও ১৯৯৯ বলা হয় যে সাম্প্রতিক উদারীকরণ নীতির ফলে সংগঠিত অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটতে পারে। এশিয়ার সংকটকালীন অবস্থায় দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক বাজারের ব্যর্থতা সব দেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। বিশ্বায়নজনিত আন্তর্জাতিক সংহতি ও সংযুক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির প্রভাবও অপরিসীম। বিশ্বের জনগণ অর্থনৈতিক আদানপ্রদান এবং বিজ্ঞাপন, প্রচারমাধ্যম ও টেলিযোগাযোগ দ্বারা বস্তুগত ভোগের মাধ্যমে পরিতৃপ্তির সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত এবং পরিচয়ের রাজনীতি, বহুজাতিক হয় সমাজ, শাসনব্যবস্থার নতুন ধরন, সার্বজনীন মানবাধিকার ইত্যাদি নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করছে।

বিশ্বায়নের ভাল ও খারাপ দুটি দিকই দেখা যায়। বিশ্বায়ন নানা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসে, যেমন বৃহৎ বাজার সৃষ্টি বা বৃহৎ বাজারে যুক্ত হওয়া, প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি কিন্তু বিশ্বায়নের সঙ্গী হল বিপদ ও ঝুঁকি, অস্থায়িত্ব এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। বিদেশি বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে অনুন্নত বা উন্নয়নমূলক দেশের অর্থনীতির আধুনিকীকরণ, দক্ষতাবৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে। ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। বিশ্বায়ন আবার শ্রমিকদের জীবিকার ধ্বংসসাধন করতে পারে, দেশের শিল্প ও ব্যাংকের ক্ষতি ঘটাতে পারে এবং সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে পারে।

১.১০ বিশ্বায়ন ও নারী

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে লিঙ্গসাম্যের প্রশ্ন বিশেষভাবে যুক্ত। বেজিং +৫ কর্মশালা (১৯৯৯) (Bejing +5 Workshop, 1999) লিঙ্গ সম্পর্ক রূপান্তরের ক্ষেত্রের বিশ্বায়নের গুরুত্বকে স্বীকার করে। এই কর্মশালায় বলা হয় যে বিশ্বের সর্বত্রই লিঙ্গ অসাম্য ও লিঙ্গভিত্তিক ভেদাভেদ থাকার জন্য নারীরা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা পুরুষদের তুলনায় অধিক পরিমাণে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। তাদের আবার কিছু লাভও হয়। এই প্রসঙ্গে গুরুত্ববহ কিছু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের আলোচনা করা হল—

(ক) শ্রম বাজার

বিশ্বায়নের ফলে শ্রমবাজারের সম্প্রসারণ ঘটে, যার কিছু ইতিবাচক প্রভাব আছে। বিশ্বায়নের ফলে অ-পরম্পরাগত (non-traditional) ক্ষেত্রে নারীদের জন্য চাকরির কিছু সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তার ফলে নারীদের আয়বৃদ্ধি ঘটে, যা পরিবারের মধ্যে ও সমাজের মধ্যে নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটায় এবং তাদের ভূমিকা ও মর্যাদা সংক্রান্ত আপোষ মীমাংসার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে।

গত দু দশকে উন্নত বাজার অর্থনীতির শ্রমশক্তিপ্রধান শিল্পগুলি মধ্য আয় উৎপাদনকারী উন্নয়নমূলক দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে শেষোক্ত দেশগুলির নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বায়ন আবার শোষণের মাত্রার ঊর্ধ্বগতি এবং বাজারের ওপর প্রত্যক্ষ নির্ভরতা বৃদ্ধি ও বাজারের খামখেয়ালের প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে। দেখে গেছে যে নারীদের চাকরির সুযোগ প্রধানত কম দক্ষতাযুক্ত ক্ষেত্রে সীমিত হয়েছে এবং নারী-পুরুষের পারিশ্রমিকের পার্থক্য থেকে গেছে। তাহলেও নারী শ্রমিকের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নারীদের কিছু কল্যাণ ঘটেছে এবং তার ফলে তাদের পরিবারগুলির ওপর বিশ্বায়নের যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তবে যে দুরবস্থাজনক পরিকাঠামোর মধ্যে অনেক নারী শ্রমবাজারে প্রবেশ করে বা করতে বাধ্য হয়, তার প্রতিকার প্রয়োজন।

সস্তায় শ্রমিক নিয়োগ ও উৎপাদনের সুবিধার জন্য উন্নত দেশগুলির শ্রমিক চাহিদা ও উৎপাদনপ্রক্রিয়া অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ফলে উন্নত দেশগুলির শ্রমিক চাহিদা উচ্চ দক্ষতাযুক্ত উৎপাদন শিল্পে বেশি হচ্ছে, আর সেখানে নিম্ন দক্ষতাযুক্ত ক্ষেত্র, যেখানে নারীদের প্রাধান্য বেশি, সেগুলির সাধারণ শ্রমিক চাহিদা কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাধারণ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(খ) সেবাসংক্রান্ত বাণিজ্য

বাণিজ্য হল শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নের সুফল প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম। চাকরি বা কর্মক্ষেত্র, উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ধরণ, সংস্কৃতিগত মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক, পরিবেশ ইত্যাদিকে বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিসমূহ প্রভাবিত করে। সেগুলি আবার নারী ও পুরুষ উভয়কেই নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিশ্ববাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন কাজ ও পেশার সঙ্গে বিশেষত সেবামূলক ক্ষেত্রের সঙ্গে নারীদের সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সেবামূলক ও পেশাগত ক্ষেত্র, যেমন আইন, ব্যাঙ্ক, হিসাবসংরক্ষণ, কম্পিউটারভিত্তিক কাজ, পর্যটন শিল্প, তথ্যসেবা, ডাক ব্যবসা, ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা, টেলিফোন অপারেটিং, প্রকাশকদের জন্য শব্দ প্রক্রিয়াকরণ (word processing), বিমান বুকিং

ইত্যাদির কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, ওষুধ ও সার্জারী ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সব দেশেই, বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে বয়স্ক লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। তাছাড়াও বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্রীয় কল্যাণকর ও সেবামূলক কাজ অনেক কমে গেছে। ফলে অনুন্নত বা দরিদ্র দেশ থেকে শুশ্রূষাকারী বা নার্স হিসাবে মহিলা শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) শাসন প্রক্রিয়া

বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির সংযুক্তির ফলে সরকারি নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের কেন্দ্র জাতীয় স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে স্থানান্তরিত হয়েছে। শাসনপ্রক্রিয়ার কেন্দ্র পরিবর্তনের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতার ফলে নাগরিকতাসংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। বহুকাল ধরেই নারী আন্দোলনগুলির মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার অর্জনের দাবিগুলি এবং সামাজিক পরিচিতিসংক্রান্ত বক্তব্যসমূহ সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রকে ঘিরেই পরিচালিত হত। এখন নতুন একক হিসাবে জাতি, রাষ্ট্রের ঊর্দ্ধস্থ বিশ্ব একক এবং নিম্নস্থ স্থানীয় একক গুরুত্ব লাভ করেছে। এগুলি নারীদের জন্য বিকল্প পরিচিতি ও ভূমিকা দাবি করে। ফলে নারীদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

বিশ্বায়নের ফলে এক অভূতপূর্ব বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয়েছে—অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার অংশ হয়ে পড়েছে। তাছাড়াও আন্তঃসরকারি প্রক্রিয়াগুলির ওপর আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে একদিকে নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক নারী সংস্থাগুলি জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে জায়গা করে নিচ্ছে।

(ঘ) দারিদ্র্য

শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্রীয় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, মানব মূলধন সংক্রান্ত বিনিয়োগ বা মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজের ক্ষেত্র হ্রাস পেয়েছে। তার ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি, সমাজের দুর্বল অংশ, বিশেষত নারী ও শিশুদের প্রয়োজন পূর্ণ করা বা তাদের জন্য ন্যূনতম সেবামূলক ব্যবস্থা বা তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আধুনিককালে কল্যাণকর রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ও বেসরকারি সামাজিক সেবামূলক কাজের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে উন্নত, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল সব দেশের মহিলাদের জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক পরিবারেই অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে। পারিবারিক আর্থিক বোঝা মেটানোর জন্য নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে ও গৃহের বাইরে কাজ করতে বের হচ্ছে এবং গৃহপরিচালনার সঙ্গে বাইরের চাকরির সমন্বয় করতে বাধ্য হচ্ছে। শিশুশ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটছে একই কারণে।

(ঙ) দেশান্তরগমন (Migration)

বিশ্বায়নের আধুনিক প্রবণতার ফলে শ্রমের আন্তঃসীমান্ত প্রবাহের ধরন এবং শ্রমিকের চাহিদার ধরন পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন স্বল্পস্থায়ী ও সাময়িক কর্মসংস্থানের পক্ষপাতী। তাই বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পস্থায়ী চুক্তিবন্ধ শ্রমিক পরিযান বৃদ্ধি পাচ্ছে যার মধ্যে দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ পার্থক্যের সুস্পষ্ট প্রবণতা। নারীরা বেশি সংখ্যায় বড় বড় শহরে যাত্রা করছে এবং নতুন নতুন কাজের জন্য শ্রমচুক্তিতে আবন্ধ হচ্ছে। পরিযানের ফলে তাদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বের কোন কোন অংশে পরিযায়ী মহিলারা পাচার ও যৌন

নির্যাতনের শিকারে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় সীমানা পারাপারকারী শ্রমিক অধিকার রক্ষার জন্য কার্যকর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অভাবহেতু বৈধ ও অবৈধ উভয় ধরনের পরিযায়ী নারীরাই পুরুষদের দ্বারা নির্যাতনের বস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

(চ) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন

আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তৃতি ও প্রসারণের ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা ইন্টারনেট, ইমেল, নেটওয়ার্কিং, তথ্যের আদানপ্রদান ও প্রচার, স্থানীয় কারিগর ও উৎপাদকের পণ্যসমূহ বিশ্বব্যাপী বাজারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সৃষ্ট সৃজনশীল ইকমার্স ইত্যাদি উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নারী ও পুরুষ ইন্টারনেটের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। এগুলি প্রশিক্ষণের জন্য খরচ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবস্থান ও সময়গত সীমাবদ্ধতা তাদের সামনে বাধার সৃষ্টি করছে। আধুনিক সমাজে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজ, বিশেষত পরিসেবামূলক কাজ উন্নয়নশীল দেশের পুরুষ ও নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের অভিনব সুযোগ সৃষ্টি করেছে। গৃহভিত্তিক টেলিকম কাজ, টেলিসেন্টারে কাজ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজের সময়, অবস্থান ইত্যাদি ব্যাপারে নমনীয়তার সুযোগ আছে। ফলে এইসব কাজে যুক্ত হলে নারীরা তাদের গার্হস্থ্য সীমাবদ্ধতা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারে। বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সংখ্যায় নারীদের কর্মী হিসাবে যোগদান এবং নারীদের রাজনৈতিক সমাবেশ, সংহতি ও বিভিন্ন ধরনের নারীসংস্থাসমূহের সম্প্রসারণ একই সময়ে হয়েছে। সব ধরনের বৈষম্য দুরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women বা CEDAW) এবং বেজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন (Bejing Platform for Action) নারীদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তির বোধকে স্বীকার করেছে। উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা সংক্রান্ত বিশ্ব সার্ভে (World Survey on the Role of Women in Development) মন্তব্য করে যে জাতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে অবিরত সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে, নতুবা বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করা যাবে না। বেজিং +৫ প্রক্রিয়া (Bejing +5 process) মনে করে যে লিঙ্গ সাম্য বিকাশের প্রবক্তাদের এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে শান্তিকামীদের সমান চ্যালেঞ্জ হল নতুন ধরনের মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা এবং সর্বব্যাপী উন্নয়ন ও সামগ্রিক বিশ্বসমাজ গঠনের নতুন ধরনের বিধিনিয়মের বিকাশ ঘটানো।

২০০৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জেনারেল সেক্রেটারী নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা বন্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধতা প্রচারকার্য (Unite to End Violence against Women Campaign) এর সূচনা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সর্বত্র নারী ও বালিকাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের হিংসার প্রতিরোধ ও যাবতীয় বৈষম্যের অবলুপ্তির জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এজন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সম্পদ বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে প্রচারের মাধ্যমে এই উদ্যোগ বিভিন্ন ব্যক্তি ও জনসমাজ, বিভিন্ন নারী সংগঠন ও সুশীল সমাজগোষ্ঠী, পুরুষসমাজ, যুব গোষ্ঠী, বিখ্যাত ব্যক্তি, শিল্পী, ক্রীড়াবিদ, বেসরকারি ক্ষেত্র—সকলকে একত্রিত করে এই উদ্দেশ্য অর্জন করার ওপর তিনি জোর দেন।

জনপ্রশাসনে লিঙ্গ সাম্যসংক্রান্ত ইউ.এন.ডি.পি.-র বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ (UNDP Global Initiative on Gender Equality in Public Administration বা GEPA), ২০১৪ নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দান করে—

(১) নারীর ক্ষমতায়ন এবং রাষ্ট্রের শাসনবিভাগে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি,

(২) জনপ্রশাসনে লিঙ্গ সাম্যসংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্যের সহজলভ্যতা,

(৩) কেসস্টাডির জন্য ১৩টি দেশকে গুরুত্ব দান—বাংলাদেশ, বৎসোয়ানা, বুরুন্ডি, কম্বোডিয়া, কলম্বিয়া, জর্ডন, কিরঘিজস্থান, মালি, মরক্কো, মেক্সিকো, রুমানিয়া, সোমানিয়া ও উগান্ডা।

আমরা আগেই দেখেছি যে উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তর্মুখী রাষ্ট্র নির্দেশিত অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থা থেকে বহির্মুখী মুক্ত বাজার, উদারনীতিকরণ ও বিশ্বায়নের খোলামেলা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে যাত্রা করে, যা অল্প কিছু সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সকলের জন্য নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে, বিশেষত নারীদের জন্য।

ভারতীয় অর্থনীতির ঋণ সংকটকালে ভারত সরকার ১৯৯১ সালে মুক্ত অর্থনৈতিক নীতি চালু করে, যা ছিল IMF দ্বারা নির্দেশিত কাঠামোগত নীতির (Structural Adjustment Policy) অপরিহার্য অঙ্গ। এজন্য IMF যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করে। এই নীতিই ভারতে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন নীতির সূচনা করে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নীতি অস্বীকার করে এবং অর্থনীতিতে বাজারীকরণের ব্যবস্থা করে। এগুলির ফলে একদিকে প্রযুক্তিগত উন্নতি, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ ঘটলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে অসাম্য বৃদ্ধি ঘটেছে, নারীপুরুষের অসাম্য বেড়ে গেছে এবং দারিদ্র্যের মহিলাকরণ (feminisation of poverty) ঘটেছে।

১.১১ সরকারি অফিসে লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধ বা তার সমাপ্তিসংক্রান্ত আইনসমূহ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)

সরকারি অফিসে লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন আইনের সংখ্যা বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এজাতীয় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কিছু আইন হল—

(১) এমপ্লয়মেন্ট নন-ডিসক্রিমিনেশন অ্যাক্ট (Employment Non-discrimination Act) (আমেরিকা)—এই আইনটি যে কোন ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

(২) দ্য সিভিল রাইটস অ্যাক্ট (The Civil Rights Act), ১৯৬৪ (আমেরিকা)—এই আইনটি যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জাতি, গায়ের রং, ধর্ম, জাতীয় পরিচয় বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যকে বেআইনী ঘোষণা করে।

(৩) হাউস্টন ইক্যুয়াল রাইট্স্ অর্ডিন্যান্স (Houston Equal Rights Ordinance)—এই অর্ডিন্যান্সটি লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, জাতীয় পরিচয়, বয়স ধর্ম, বিকলাঙ্গতা, গর্ভাবস্থা, জেনেটিক তথ্য এবং পরিবার, বৈবাহিক বা সামরিক মর্যাদার ভিত্তিতে অসাম্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

(৪) সম বেতন আইন (Equal Pay Act), ১৯৬৩ (আমেরিকা)—এই আইনটি সম কাজের জন্য সম বেতনের কথা বলে।

(৫) ফেয়ার এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট (Fair Employment Act), ১৯৪১ (আমেরিকা) এই আইনটি চাকরিক্ষেত্রে সাম্যনীতিকে জোর দেয়।

(৬) এম্প্লয়মেন্ট ইকুইটি অ্যাক্ট (Employment Equity Act), ১৯৯৮ (সাউথ আফ্রিকা) এই আইনটিও চাকরিক্ষেত্রে সাম্যের ওপর জোর দেয়।

(৭) প্রভিশন অফ ইকুয়ালিটি অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যাক্ট (Provision of Equality and Prevention of Discrimination Act), ২০০০ (সাউথ আফ্রিকা)।

(৮) সাউথ আফ্রিকার সংবিধানের ৯নং অধ্যায়।

(৯) ইক্যুয়াল পে অ্যাক্ট (Equal Pay Act), ১৯৭০ (ব্রিটেন)।

(১০) ইকুয়ালিটি অ্যাক্টস্ (Equality Acts), ২০০৬ ও ২০১০ (ব্রিটেন)।

(১১) এম্প্লয়মেন্ট ইকুয়ালিটি রেগুলেশনস্ (Employment Equality Regulations), (ব্রিটেন)।

(১২) ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং ধারা।

(১৩) জাতিগত অক্ষমতা দূরীকরণ আইন (Caste Disabilities Removal Act), ১৮৫০ (ভারতবর্ষ)।

(১৪) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (Hindu Succession Act), ১৯৫৬ (ভারতবর্ষ)।

(১৫) তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি (নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইন) (The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act), ১৯৮৯ (ভারতবর্ষ)।

(১৬) ক্যানাডিয়ান এমপ্লয়মেন্ট ইক্যুইটি অ্যাক্ট (Canadian Employment Equity Act), ১৯৮৬।

(১৭) ক্যানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস্ অ্যাক্ট (Canadian Human Rights Act), ১৯৭৭।

(১৮) এমপ্লয়মেন্ট ইকুয়াল অপরচ্যুনিটি ল (Employment Equal Opportunity law), ১৯৮৮ (ইস্রায়েল)।

(১৯) সমবেতন কনভেনশন (Equal Remuneration Convention), ১৯৫১ (আন্তর্জাতিক)।

(২০) বৈষম্য (কর্মসংস্থান ও পেশা) কনভেনশন (Discrimination (Employment and Occupation) Convention), ১৯৫৮ (আন্তর্জাতিক)।

(২১) কনভেনশন অন দি এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিশনস্ এগেনস্ট উইমেন (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women), ১৯৬৫ (আন্তর্জাতিক)।

(২২) মাইগ্রেশনস্ ইন অ্যাবিউসিভ কনডিশন্স্ অ্যান্ড দ্য প্রোমোশন অফ ইক্যুয়ালিটি অফ অপরচ্যুনিটি অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অ্যাক্ট অফ মাইগ্র্যান্ট ওয়ারকার্স (Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment Act of Migrant Workers), ১৯৭৫ (আন্তর্জাতিক)।

১.১২ জনপ্রশাসনে প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কেসস্টাডি

গবেষকরা ১৫৫টি স্পনীয় মিউনিসিপ্যালিটির ওপর অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে জনপ্রশাসনের অধিকাংশ বিভাগই মূলত পুরুষ ব্যক্তিদের পছন্দ করে। গবেষণার এলাকাগুলির মধ্যে ১৪টিতে লিঙ্গগত পার্থক্য ছিল ১০% এবং দুটিতে লিঙ্গ পার্থক্য ছিল ৫০% এর বেশি। যেসব এলাকায় কিছুটা সাম্য দেখা গেছে, সেখানেও পুরুষরা ব্যবস্থার উচ্চস্তরে আধিপত্য করত—মেয়র বা সমজাতীয় পদে পুরুষদের সংখ্যা বেশি ছিল; আর নারীরা ছিল প্রধানত পরিষদের সাধারণ কাজে। অর্থনীতি ও অর্থসংক্রান্ত ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুরুষপ্রাধান্য, নারীরা ছিল প্রধানত সামাজিক ন্যায়সংক্রান্ত ক্ষেত্রে। গবেষণার উপসংহারে বলা হয়েছে যে নারীরা অধিক পরিমাণে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলেও পুরুষপ্রাধান্য যুক্ত ও পুরুষালি ব্যবস্থার মধ্যে তারা প্রধানত মেয়েলি কাজের মধ্যেই সীমিত থাকতে বাধ্য হয়।

১.১৩ বৃহত্তর লিঙ্গ সমতার জন্য একটি চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

জনপ্রশাসনের লিথুয়ানিয়ান ইনস্টিটিউট **(Lithuanian Institute of Public Administration)** সম সুযোগ সংক্রান্ত ওম্বুড্‌সম্যান অফিস **(Office of the Equal Opportunities Ombudsman)**-এর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ২০০৪ সালে একটি চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীটিকে ‘‘নারী ও পুরুষের সম সুযোগ’’ নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক তিন মাস অন্তর প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়—২০ জন সরকারি অফিসার—প্রধানত বিভাগের প্রধান বা সহপ্রধানদের নিয়ে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে যেসব বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হত, সেগুলির কয়েকটি হল—

(১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে লিঙ্গ সাম্যসংক্রান্ত আইন ও নির্দেশসমূহ।

(২) লিথুয়ানিয়ায় নারী ও পুরুষদের সম অধিকার বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত ব্যবস্থাসমূহ, যার মধ্যে ছিল সংসদীয়, সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় স্তরের অন্তর্ভুক্তি।

(৩) সম সুযোগসংক্রান্ত অম্বুডস্‌ম্যান অফিসের কার্যধারাসমূহ, বিশেষত লিঙ্গসমতাসংক্রান্ত আইনগত বিষয়সমূহ।

(৪) ইউরোপীয় ইউনিয়নে সম অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা।

(৫) শ্রমবাজারে, বিশেষত জনপ্রশাসনে নারী ও পুরুষসংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

(৬) রাজনীতিতে ও বাস্তব জীবনে নারী ও পুরুষের অবস্থান সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ।

(৭) সি.ই.ডি.এ.ডব্লিউ. (CEDAW)-এর কার্যাবলি।

(৮) মিউনিসিপ্যাল স্তরে লিঙ্গসাম্য সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ।

কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীরা লিঙ্গসাম্য সংক্রান্ত সরকারি কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় তথ্য এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে পরিচিত হয় এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত প্রাত্যহিক সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করার উপযোগী দক্ষতালাভ করে—যেমন গার্হস্থ্য হিংসা বা কর্মস্থলে যৌন নির্যাতনে সমস্যা ইত্যাদি।

আমরা যদি লিঙ্গ সমতাসংক্রান্ত কাজকে উন্নততর করতে চাই, তাহলে সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের লিঙ্গ সমস্যার বিভিন্ন দিক, লিঙ্গসমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন আর এজন্য ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যা তাদের ভবিষ্যতে জনপ্রশাসনে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে।

১.১৪ উপসংহার

লিঙ্গ সাম্য একদিকে উন্নয়নের অপরিহার্য লক্ষ্য এবং অন্যদিকে ভবিষ্যতের মানব উন্নয়নের চালিকাশক্তি। জনপ্রশাসনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আদর্শগত মান অর্জনের জন্য লিঙ্গগত বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন। নারী ও পুরুষ উভয়কেই শ্রমশক্তি হিসাবে কার্যক্ষেত্রে সংযুক্ত করলে উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকৃত হবে। আন্তর্জাতিক আইনসমূহ দেশের সরকারি কাজে প্রত্যেকের অংশগ্রহণের অধিকারকে স্বীকার করে। কিন্তু জনপ্রশাসনে বিশেষত সিদ্ধান্তগ্রহণ স্তরে নারীদের ও পুরুষদের সমান সুযোগ ও অধিকার এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। নারী জনপ্রশাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি না ঘটলে জনপ্রশাসন দেশের শ্রমশক্তির পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারবে না। নারীরা জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশ। তাদের সামর্থ্য ও সৃজনশীলতা দ্বারা তারা দেশের উন্নয়নের কাজে পুরুষদের সঙ্গে সমভাবে যুক্ত হলে তবেই দেশের পূর্ণ উন্নতি সম্ভব হবে এবং জননীতি ও জনপ্রশাসন সমৃদ্ধ হবে।

১.১৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসন ও লিঙ্গ সংক্রান্ত মানব মূলধন তত্ত্ব ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের বক্তব্যগুলি লিখুন।

(২) লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনগুলির বক্তব্য আলোচনা করুন।

(৩) লিঙ্গ-সাম্য বা অসাম্যের ওপর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব আলোচনা করুন।

(৪) লিঙ্গ সমতার জন্য লিথুয়ানিয়ার চাকরীকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি লিখুন।

(৫) সরকারি অফিসে লিঙ্গ-বৈষম্য প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনগুলি কী কী?

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসনে লিঙ্গ বৈষম্যের সুবিধাগুলি কী কী?

(২) বিশ্বায়নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লিখুন।

(৩) সরকারি অফিসে লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধ সংক্রান্ত কয়েকটি আন্তর্জাতিক আইনের উল্লেখ করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) লিঙ্গ বলতে কী বোঝানো হয়?

(২) জনপ্রশাসন শব্দটির অর্থ কী?

(৩) জনপ্রশাসনে পিতৃতন্ত্র বলতে কী বোঝানো হয়?

(৪) লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ইউ.এন.ডি.পি. প্রতিবেদনে উল্লিখিত তিনটি প্রবণতার উল্লেখ করুন।

(৫) লিঙ্গ ও জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কৃতিগত বাস্তবতা বলতে কী বোঝানো হয়?

১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

Commilla Stivers, *Gender Images in Public Administration*, 2002.

Maria J. Agostino and Helisse Levine, *Women in Public Administration: Theory and Practice*, 2011.

UN, Report of Economic and Social Council for 1997.

একক-২ ❑ জনপ্রশাসন ও সুশীল সমাজ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন-ধারণা দুটির পরিবর্তনশীল দৃষ্টিকোণ বা পরিপ্রেক্ষিত

২.৪ সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন—উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব

২.৫ সুশীল সমাজের অবদান

২.৬ ভারতবর্ষে সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন

২.৭ উপসংহার

২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে যেসব বিষয় সম্বন্ধে জানা যাবে, সেগুলি হল :

- সুশীল সমাজের অর্থ ও সুশীল সমাজের ধারণার বিবর্তন।
- সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন—উভয় ধারণার পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিত।
- সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন—উভয়ের মিথস্ক্রিয়া এবং উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব।
- ভারতে সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসনের সম্পর্ক।

২.২ ভূমিকা

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নসংক্রান্ত কাজে যেসব সংস্থা ও ব্যক্তি যুক্ত থাকেন, তাঁদের কাছে জনপ্রশাসন ও সুশীল সমাজ হল দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ধারণা। কিন্তু ধারণা দুটি সম্পর্কে কোন ঐক্যমত্য বা স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। তাছাড়াও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধারণা দুটির অর্থও পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

আলোচনার প্রথমে ধারণা দুটিকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সুশীল সমাজ বলতে বোঝায় বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টিকে, যেগুলি নাগরিকদের স্বার্থ ও নাগরিকদের বক্তব্যসমূহকে প্রকাশ করে। সুশীল সমাজ হল রাষ্ট্রীয় এলাকা ও ব্যবসার বাইরে অবস্থিত বিশাল ক্ষেত্র, যেখানে জনগণ সংযুক্ত হয় এবং মিলিতভাবে তাদের স্বার্থ ও কণ্ঠস্বর ব্যক্ত করে। সুশীল সমাজকে অনেকে সমাজের তৃতীয় ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেন,

কারণ এটি সরকার ও ব্যবসায় এলাকা থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানযুক্ত। সুশীল সমাজ গঠনকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশিষ্ট্য হল স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ।

জনপ্রশাসন হল সরকারি কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এককের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরের সরকারি সংস্থাসমূহের কাজকারবার বা সরকারি কর্মসূচির পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও তদারকি এবং শাসন, আইন ও বিচারবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ হল জনপ্রশাসনের কাজ। জনপ্রশাসনের সরকারি সংস্থাগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য সরকারি নীতি নির্ধারণ করে, আইনপ্রণয়ন করে, আইনের ভিত্তিতে মামলার বিচার করে, জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করে। তাদের কাজ হল দেশের জনগণের জন্য পণ্য ও সেবা উৎপাদন, সেই উদ্দেশ্যে সংগঠন নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ। তারা হয় বিনামূল্যে নয় স্বল্পমূল্যে জনগণকে পণ্য ও সেবা প্রদান করে।

২.৩ সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন-ধারণা দুটির পরিবর্তনশীল দৃষ্টিকোণ বা পরিপ্রেক্ষিত

সুশীল সমাজ ধারণাটির উদ্ভব ঘটে প্রাচীন গ্রীকসমাজে। অ্যারিস্টটল তাঁর পলিটিক্স (Politics) গ্রন্থে সুশীল সমাজ বলতে গ্রীক নগর-রাষ্ট্র বা পলিস্-এর সমবিস্তারযুক্ত সমগ্র সমাজকে নির্দেশ করতেন। সুশীল সমাজ ও নগর-রাষ্ট্র উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণ বা সাধারণ কল্যাণ। গ্রীক আদর্শ রাষ্ট্র ছিল ন্যায়ভিত্তিক সুশীল সমাজ, যেখানে জনগণ সাধারণ কল্যাণের জন্য নিজেদের সমর্পণ করে এবং জ্ঞান, সাহস, সংযম, ন্যায় ইত্যাদি নাগরিক গুণের চর্চা করে। রোমান লেখক সিসেরো-প্রবর্তিত সুশীল সমাজের অর্থ ছিল উত্তম সমাজ, যা জনগণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। গ্রীক ও রোমান চিন্তাবিদ্রা রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি। তাঁরা মনে করতেন যে রাষ্ট্র সুশীল সমাজ বা সমাজের নাগরিক রূপ বা ফর্মের প্রতিনিধিত্ব করে আর সমাজের নাগরিক রূপ বা ফর্ম বলতে তখন বোঝাত উত্তম নাগরিকের বৈশিষ্ট্যসমূহকে। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের অভিনব ব্যবস্থার জন্য সুশীল সমাজের ধারণাটি মূলধারার আলোচনা থেকে কার্যত বিদায় নেয়। তখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ন্যায় যুদ্ধের ধারণা। রেনেশাঁস যুগের শেষ পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল। তিরিশ বছরের যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ওয়েস্টফলিয়া চুক্তি সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। রাষ্ট্রসমূহ ভুখণ্ডভিত্তিক সার্বভৌম রাজনৈতিক এককে পরিণত হয় এবং রাজা রাষ্ট্রের শাসক হিসাবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সামন্তপ্রভুদের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। সামন্তপ্রভুদের দ্বারা প্রদত্ত বাহিনীর বদলে রাজা নিজস্ব জাতীয় সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনের সুবিধার জন্য রাজা পেশাদারি আমলাতন্ত্রের সূত্রপাত করেন, অর্থসংক্রান্ত বিভাগসমূহও গঠন করেন। ফলে রাজা প্রজাদের ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজা সমগ্র অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এগুলির ফলে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে সামগ্রিকতাবাদী স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

জ্ঞানদীপ্তির যুগে (Enlightenment era) স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। রাজা বা শাসকের রাজনৈতিক বৈধতা ও নৈতিক কর্তৃত্বের দাবিকে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বিভিন্নভাবে বিচার করেন। হবসের মতে মানুষ পরস্পর-বিরোধী প্রকৃতিযুক্ত আত্মস্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। তাই প্রকৃতির রাজ্য, তাঁর মতে, সকলের সঙ্গে সকলের যুদ্ধের অবস্থায় পরিণত হয়, যা সাধারণভাবে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। যুক্তিবাদ এবং আত্মস্বার্থের

তাগিদই আবার জনগণকে নিজেদের দ্বারা সৃষ্ট নৈরাশ্য থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাই তারা নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা একটি চুক্তির মাধ্যমে একটি সাধারণ কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করে, যা ছিল রাষ্ট্র। হবস সমাজের শৃঙ্খলা ও শিষ্টতা রক্ষার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের কথা বলেন।

লকের সময় ছিল গৌরবময় বিপ্লবের যুগ। এই সময়ে দেখা যায় রাজার শাসনের অধিকারের সঙ্গে পার্লামেন্টের রাজনৈতিক অধিকারের বিরোধ। তাই লকের সামাজিক চুক্তি সীমাবদ্ধ রাষ্ট্র ও শক্তিশালী সুশীল সমাজের কথা বলে। লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন প্রথমে শান্তিপূর্ণ হলেও পরে তা অরাজক অবস্থায় পরিণত হয়। তাই জনগণ একত্রিত হয়ে দুটি চুক্তি সম্পাদন করে। তারা প্রথম চুক্তিটি দ্বারা একটি সাধারণ সামাজিক কর্তৃত্ব স্থাপন করে। কিন্তু এই সাধারণ কর্তৃত্বের আইন প্রণয়ন বা আইন প্রয়োগের কোন ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা তারা রাষ্ট্রগঠন করে—কিন্তু জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার কোনো ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় চুক্তিটি রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমাও নির্দেশ করে দেয়। রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হলে তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবের অধিকারকেও সমর্থন করেন। তবে হবস ও লক রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র সুশীল সমাজের অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি। তাঁরা উভয়ের সহ-অবস্থানকে সমর্থন করেন।

হেগেল সুশীল সমাজের ধারণাকে পরিবর্তিত করেন। তিনি সুশীল সমাজ সম্পর্কে আধুনিক উদারনীতিবাদী ধারণার সূত্রপাত করেন। তাঁর মতে সুশীল সমাজ হল আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র ধারণা, যা বাজার সমাজের দ্যোতক। মার্ক্সের মতে সুশীল সমাজ হল ভিত্তি, যেখানে উৎপাদিকা শক্তি ও সামাজিক সম্পর্ক ঘটে এবং রাজনৈতিক সমাজ হল সুশীল সমাজের ভিত্তির উপর নির্মিত কাঠামো বা উপরিকাঠামো। তিনি সুশীল সমাজের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংযোগের কথা বলেন। তাঁর মতে, সুশীল সমাজ বুর্জোয়া শিল্প মালিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং উপরিকাঠামো হিসাবে রাষ্ট্র বুর্জোয়া মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। তিনি রাষ্ট্রের কোন ইতিবাচক ভূমিকা আছে বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল বুর্জোয়া শিল্প মালিকদের শাসনবিভাগীয় হাত। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে শ্রমজীবী শ্রেণি সমাজের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করলে রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে। গ্রামসি সুশীল সমাজকে মার্ক্সের মত রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ভিত্তির সমার্থক বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে সুশীল সমাজ হল বুর্জোয়া নেতৃত্বের মাধ্যম। তিনি রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর মধ্যে তার অবস্থানের কথা বলেন। নব্য বামপন্থীরা মনে করেন যে রাষ্ট্র ও ব্যবসা ক্ষেত্রের খামখেয়ালির বিরুদ্ধে জনগণকে রক্ষা করার ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মত প্রতিষ্ঠার জন্য সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নব্য উদারনীতিবাদীরা সুশীল সমাজকে এমন একটি সংগ্রামক্ষেত্র হিসাবে মনে করেন, যা কমিউনিস্ট ও কর্তৃত্ববাদী শাসকদের উচ্ছেদ করতে পারে।

জনকল্যাণকর ব্যবস্থাসমূহের পুনর্গঠন তত্ত্ব অনুসারে সুশীল সমাজের ধারণাটি নব্য উদারনীতিবাদী মতাদর্শ হিসাবে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের পরিবর্ত ধারণা, গণতান্ত্রিকীকরণের আদর্শের পরিবর্ত নয়। ১৯৮০ থেকে বিভিন্ন অসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (NGO) আবির্ভাব এবং বিশ্বব্যাপী নব্য সামাজিক আন্দোলনের বিস্তৃতির ফলে সুশীল সমাজের ধারণাটি সামাজিক বিশ্বব্যবস্থার যুদ্ধকৌশল পরিচালনার উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পে পরিণত হয়েছে। জিলান সোয়েডারের মতে, সুশীল সমাজের তখনই উদ্ভব ঘটে, যখন শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বা সামাজিক প্রয়োজনসমূহের সমাধানের জন্য সরকারী উত্তর দাবি করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহ রাষ্ট্রের অনুমোদিত কাজের সীমাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

আধুনিক কালে অসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি দ্রুতহারে স্থানীয় ও জাতীয় পটভূমি থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী নানা পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আন্তর্জাতিক কারক ও সংস্থা হিসাবে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থ ও বাণিজ্যসংস্থা, আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও তার বিভিন্ন সংস্থা, বহুজাতিক কর্পোরেশন, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইত্যাদি। এগুলি বিশ্বস্তরে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্রুতহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (NGO) বিশ্বস্তরে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে দেরীতে এসেছে, কিন্তু তারাও উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করছে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপ হিসাবে জনপ্রশাসনের প্রচলন দেখা যায় অনাদিকাল থেকেই। রোমের সম্রাট বিস্তৃত এলাকা শাসন করতেন এবং বিস্তারিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটান। ব্যক্তিজীবনের প্রতি স্তরে জনপ্রশাসন তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে পরে ধীরে ধীরে কল্যাণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। শিক্ষণীয় বিষয় বা শাস্ত্র হিসাবে জনপ্রশাসন হল সাম্প্রতিক ব্যাপার। উড্রো উইলসনের হাতে জনপ্রশাসন শাস্ত্রের সূত্রপাত ঘটে। তিনি ১৮৮৭ সালে জনপ্রশাসনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিকাশের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি রাজনীতি ও প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তাঁকে অনুসরণ করে শুভনাউ বলেন যে রাজনীতির বিষয় হল রাষ্ট্রীয় নীতি বা ইচ্ছার প্রকাশ আর জনপ্রশাসনের এক্তিয়ার হল রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের প্রয়োগ ও তাদের কার্যকর করা। তাঁদের অনুবর্তী হয়ে অন্যান্য লেখক—লুথার গালিফ, হেনরি ফয়েল, হোয়াইট—ইত্যাদিরা রাজনীতি-প্রশাসন দ্বিবিভাজনের ওপর জোর দেন, যার মূল বক্তব্য হল নীতি প্রণয়ন বনাম নীতি প্রয়োগ।

পরবর্ত্তীকালে রাজনীতি-প্রশাসন দ্বিবিভাজনকে অবাস্তব ও অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা হয়, কারণ প্রশাসন হল বাস্তব জগতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের উপায় আর তাই রাজনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও তাদের প্রশাসনিক প্রয়োগ সর্বত্রই মিশ্রিত থাকে।

জনপ্রশাসন ক্রমে ক্রমে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে এবং দাবি করে যে তার সিদ্ধান্তসমূহ সব সংগঠনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জনপ্রশাসনের তিনটি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়—বৈজ্ঞানিক পরিচালনা, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ পরিচালনা।

১৯৪০ থেকে আচরণবাদী, তুলনামুলক, পরিবেশগত এবং ওয়েবারীয় বিশ্লেষণ—প্রসারলাভ করেছে এবং জনপ্রশাসন ও রাজনীতির যোগসূত্রকে পুনঃসমর্থন প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়াও আছে উত্তর-আচরণবাদী, আন্তঃশাস্ত্রবিষয়ক এবং মূল্যবোধভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিমসূহ। বিংশ শতক (১৯৬০) থেকে উন্নয়ন প্রশাসন ও নব্য জনপ্রশাসন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে। প্রশাসনের নব্য জন উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলি লিঙ্গসাম্য, পরিবেশগতভাবে নিরাপদ উন্নয়ন, শিশুর বিকাশ, স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্ভব, তৃণমুল স্তরের জনগণকে প্রশাসনের অংশীদার করা ইত্যাদির মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের ধারণার জন্ম দিচ্ছে। অর্থাৎ আধুনিক জনপ্রশাসন নানাভাবে সুশীল সমাজের সঙ্গে আরও বেশি সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ছে।

২.৪ সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন—উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব

সরকার ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এই মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ থেকে কিছু ধারণা ও প্রকল্প উদ্ভূত হয় এবং সেগুলি রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের কাছে প্রেরিত হয়। জনগণ নাগরিক হিসাবে একত্রিত হয়ে তাদের স্বাধীন মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে চায়। সুশীল সমাজ হল এইসব মতামতের সংগঠিত প্রকাশ এবং রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক হল যে কোন গণতন্ত্রের ভিত্তি। বৈচিত্র্যময় ধারণা ও পরস্পরবিরোধী স্বার্থকে কেন্দ্র করে নাগরিক বিতর্কসমূহকে সুশীল সমাজ দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে না পারলে রাষ্ট্র নাগরিকদের থেকে দূরে সরে যায়। তখন রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের মিথস্ক্রিয়া শুধুমাত্র নির্বাচনী সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত হয়। নির্বাচনী সময়টি আবার স্থিরীকৃত হয় রাজনীতিবিদ্‌দের দ্বারা। সুশীল সমাজ হল সংগঠিত সামাজিক জীবনের ক্ষেত্র, বা স্বেচ্ছামূলক ও স্বনিয়ন্ত্রিত, বহুল পরিমাণে স্বাবলম্বী, রাষ্ট্রের এলাকা থেকে স্বাধীন এবং আইনগত শৃঙ্খলা বা সরকারি নিয়মের জাল দ্বারা আবদ্ধ। সুশীল সমাজ বলতে বোঝায় বিশাল সংখ্যক আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিক সংগঠন, স্বার্থগোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নাগরিক ও পৌর উন্নয়ন সংস্থা, ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন, প্রচারমাধ্যম, গবেষণামূলক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সম ধরনের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে। সুশীল সমাজের অন্তর্গত হল সমাজস্থ অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আত্মীয়তাভিত্তিক ও রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ এবং তাদের নেতা ও প্রতিনিধিসমূহ। সুশীল সমাজ হল রাষ্ট্রের আওতা থেকে স্বাধীন স্ব-সংগঠিত গোষ্ঠী, আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের সমষ্টি, এমন কি বিক্ষোভকারী ও উচ্ছৃঙ্খল জনতাও এর অন্তর্গত।

সুশীল সমাজ বলতে যে ক্ষেত্র বা যে এলাকায় মিথস্ক্রিয়া ঘটে, তাদেরকে এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়। প্রতিবেশীদের সংগঠন, নারীদের সংগঠন, ধর্মীয় গোষ্ঠী, বৌদ্ধিক ধারার সংগঠন এবং সব শ্রেণী ও পেশাগত ব্যক্তি, যেমন আইনজীবি, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায় উদ্যোগ ইত্যাদি দ্বারা গঠিত নাগরিক ও পৌর সংগঠনসমূহ হল সুশীল সমাজের বিষয়। তারা সকলে মিলিতভাবে সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় যুক্ত থেকে নিজেদের মতো প্রকাশ করতে এবং নিজেদের স্বার্থ পূরণ করতে চায়। পরম্পরাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক সংস্থা, জনমত প্রকাশের অ-আনুষ্ঠানিক মাধ্যম ইত্যাদি সুশীল সমাজের ক্ষেত্র বা এলাকা হিসাবে পরিচিত ছিল। আজকের ডিজিটাল যুগে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, ইন্টারনেট, বেতার যোগাযোগ, মোবাইল ইত্যাদি সুশীল সমাজের এলাকা বা সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এগুলি আবার মূল্যবোধ ও প্রকল্পসমূহের সাংস্কৃতিক সংগ্রহস্থলের কেন্দ্র, যা পাবলিক বিতর্কের জন্ম দেয়।

আমরা সুশীল সমাজের কাজের সঙ্গে সঙ্গে কাঠামোগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। এর ফলে সুশীল সমাজ কী, তার বদলে সুশীল সমাজের কাজ কী সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে সুশীল সমাজকে অনুধাবন করতে পারি।

সুশীল সমাজের বিভিন্ন কাজগুলি সদস্যদের নিম্নোক্ত ক্ষমতাগুলি প্রদান করে—

(১) সদস্যদের নিজ বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে এবং দাবি উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

(২) সদস্যরা রাষ্ট্রের সামনে তাদের অধিকারগুলিকে পেশ করতে পারে।

(৩) সদস্যরা রাষ্ট্রীয় সংস্থার ওপর নির্ভর না করে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে।

জনগণের স্বার্থ, অধিকার ও প্রয়োজনসমুহ যাতে দমিত রাখা না হয়, বরং পরিপুর্ণ করা হয় তা সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠনসমূহ। এই কাজগুলি রাষ্ট্রও সম্পাদন করে থাকে। সুতরাং রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজ পরস্পরবিরোধী অবস্থানযুক্ত নয়। সুশীল সমাজের কাজ সম্পাদনের ধরন নির্ভর করে সমাজের মধ্যে কিছু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্বের ওপর। এইসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুকূল পরিবেশে নীতি, পদ্ধতি, পূর্ববর্তী নজির ইত্যাদির ভিত্তিতে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। সমর্থনসূচক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি এইসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈধতা দান করে। ফলে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ সম্পাদন, আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিসংক্রান্ত নিরাপত্তা উপভোগ করতে পারে।

সুশীল সমাজের যথাযথ কাজের জন্য সাংস্কৃতিক মুল্যবোধ খুবই গুরুত্বপুর্ণ। মূল্যবোধ নাগরিকদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করে। জনগণের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও স্বাধীনভাবে কাজের সামর্থ্য সুশীল সমাজকে সুদক্ষভাবে কাজের শক্তি ও সুযোগ প্রদান করে। বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সুশীল সমাজের কাজের সামর্থ্য সৃষ্ট হয় এবং সেই সামর্থ্যের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয় সুশীল সমাজের কাজের সামর্থ্য—জানা যায় একটি নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে সুশীল সমাজ কতটা ভালভাবে কাজ করতে পারে। একটি সামগ্রিকতাবাদী বা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিজের মধ্যেই সুশীল সমাজের যাবতীয় অনুমোদনযোগ্য কাজ কেন্দ্রীভূত করতে পারে এবং অ-অনুমোদনযোগ্য কাজগুলিকে অপরাধমূলক বা বেআইনী ঘোষণা করতে পারে। সেই পরিবেশে সুশীল সমাজ খুবই কম শক্তিসম্পন্ন ও কার্যকর হতে পারে। বিপরীত পরিবেশে যেখানে রাষ্ট্র সংগঠিত নাগরিকদের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিধ স্বাধীন কাজকে মেনে নেয়, উৎসাহ দেয় এবং স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে দেয়, সেখানে সুশীল সমাজ অনেক বেশী শক্তিশালী ও কার্যকর হয়। অর্থাৎ সুশীল সমাজের শক্তি নির্ভর করে রাষ্ট্র কি প্রকৃতির এবং সুশীল সমাজকে কতটা স্বাধীনভাবে চলতে দেয় তার ওপর। সুশীল সমাজকে শক্তিশালী করতে হলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুশীল সমাজের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রকে নাগরিকদের জীবনের রক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রের এই ভূমিকা থাকলে রাষ্ট্রীয় সমর্থনের ভিত্তিতে সুশীল সমাজের গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। সুশীল সমাজের ক্রিয়াকলাপ ও কাজের ধরন নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা, সমর্থন ও অনুমোদনের ওপর। সুশীল সমাজের সামর্থ্য এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা একইসঙ্গে ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পেতে বা নেতিবাচকভাবে হ্রাস পেতে পারে। রাষ্ট্রের নীতিপ্রণয়ন ও প্রশাসন সংক্রান্ত যোগ্যতা এবং সুশীল সমাজের স্বাধীনভাবে স্বনির্বাচিত ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার সামর্থ্যের ওপর প্রকৃত ফলাফল নির্ভর করে। অর্থাৎ উভয়ের সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী নয়। গণতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যায়অবিচার বন্ধ করার জন্য সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়কেই শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক আন্দোলনসমূহ উভয় দিককে প্রভাবিত করেই অগ্রসর হতে পারে। তাই তাদের উভয় দিকের সঙ্গেই সংযোগ সাধন করতে হবে। সুশীল সমাজ রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যেসব সংগঠন ও সংস্থা সুশীল সমাজের উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবায়িত করে তাদের অনেকেই অবশ্য রাষ্ট্রের আওতা থেকে স্বাধীন, কিন্তু সব সংগঠন ও সংস্থা অবশ্যই নয়।

যদি আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ এবং জাতীয় স্তরের নিম্নবর্তী সরকারি সংস্থাসমূহ (যেগুলি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত)-কে কার্যকর করতে হয় তাহলে তাদের সকলকে অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। অন্যদিকে সুশীল সমাজের অন্তর্গত স্বশাসিত এককগুলির নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণের সামর্থ্য

বা নাগরিকদের অনুকূল শর্তে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করার ক্ষমতা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত সংস্থাগুলির পছন্দ-অপছন্দ-পক্ষপাতের ওপর। অরাষ্ট্রীয় কারক বা সুশীল সমাজের সংস্থাগুলি খালি নিজেরা নিজেদের মধ্যে কাজ করে—এ কথা মনে করা ঠিক নয়, কারণ তাদের অস্তিত্ব ও কাজের সঙ্গে তা মেলে না। যে কোন সমাজে সুশীল সমাজের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও শক্তি হল সেখানকার রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রসমূহের সংযোগ ও সম্পর্কেরই প্রতিচ্ছবি।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল। তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সৃষ্টি করে, যদিও তাদের সংগঠন ও ক্ষমতা বিভিন্ন রাষ্ট্রে একরকম নয়।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো :

(১) শাসন বিভাগ : এই বিভাগটি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ও ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। এই বিভাগটিকে অনেক ক্ষেত্রেই শাসক হিসাবে গণ্য করা হয়। ব্রিটেনে এর নাম হল সরকার, আমেরিকায় একে প্রশাসন বলা হয়। শাসনবিভাগের অন্তর্গত ব্যক্তিদের সুশীল সমাজের অংশ বলা হয় না। তারা যদি নাগরিক স্বার্থ ও প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হয় আর সুশীল সমাজের কাছে দায়িত্বশীল থাকে, তাহলে সুশীল সমাজ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়।

(২) প্রশাসন : সরকারের উচ্চপদে নিযুক্ত স্থায়ী কর্মচারী বা জনপালনকৃত্যক, যা সাধারণভাবে আমলাতন্ত্র নামে পরিচিত তাকেই প্রশাসনের দায়িত্বে দেখা যায়। এই বিভাগ মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ করে। সরকার সব প্রশাসনিক বিষয়ে, বিশেষত অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে এই বিভাগের ওপর নির্ভর করে। সরকারি নীতিসমূহকে এই বিভাগই বাস্তবে রূপায়িত করে। এই বিভাগ সরকারি নীতি প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ করে, শাসন পরিচালনার জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করে। সরকারের প্রশাসন অংশ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। এই বিভাগ নাগরিকদের নাগরিক স্বার্থ রক্ষা করতে এবং নাগরিকদের অধিকার বাস্তবায়িত করতে পারে। এই বিভাগ দক্ষতার সঙ্গে যথাযথভাবে কাজ করলে সুশীল সমাজের সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাফল্যলাভ করতে পারে। আর তা না করলে বিভাগটি সুশীল সমাজের চাপ ও বিরোধীতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

(৩) সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ : এই বিভাগের অন্তর্গত হল সেই সব ব্যক্তি যারা রাষ্ট্রের বকলমে বল বা শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করে। এর অন্তর্গত হল গোয়েন্দা সংস্থা এবং নিরাপত্তা বাহিনী। যেখানে বেসামরিক কর্তৃত্ব বেশি শক্তিশালী, সেখানে এই বিভাগ শাসনবিভাগ, প্রশাসন ও আইনবিভাগের অধীন হয় আর সেখানকার সুশীল সমাজ শক্তিশালী হয়। কিন্তু যেখানে এই বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে বা যেখানে শাসকরা এই বিভাগের পুতুলে পরিণত হয়, সেখানে সুশীল সমাজের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সেখানকার সুশীল সমাজের সংগঠিত মতপ্রকাশ ও ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত হতে পারে।

(৪) আইনসভা : নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে এই বিভাগ গঠিত হয়। এই বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, বাজেট অনুমোদন করে এবং কোন কোন দেশে সরকার বা শাসনবিভাগকে গঠন করে। কোন কোন দেশে আবার আইন বিভাগ সামরিক বাহিনী বা শাসনবিভাগের রবার স্ট্যাম্প হিসাবে কাজ করে। যেসব দেশের আইন বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে, সেখানে এই বিভাগ সুশীল সমাজের স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর বা মাধ্যম হিসাবে কাজ করে এবং সেখানে সুশীল সমাজ শক্তিশালী হয়। অন্যরকম হলে সুশীল সমাজ দুর্বল হয়।

(৫) বিচার বিভাগ : অধিকাংশ দেশেই বিচারবিভাগের বিচারকরা শাসনবিভাগ দ্বারা নিযুক্ত হন, কোথাও কোথাও তাঁরা আবার আইনবিভাগ দ্বারা নির্বাচিত হন। তাঁরা অর্থসংস্থান ও বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত রূপায়ন—এই দুটি ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও প্রশাসনের ওপর নির্ভর করেন, কিন্তু তাঁরা সরকারের এই বিভাগগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার বা তাদের ক্ষমতাসমূহ সীমাবন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও বৈধতা ভোগ করেন। বিচারবিভাগীয় সংস্থাগুলি হল ক্রমস্তর বিন্যস্ত। সর্বোচ্চ স্তরে আছে জাতীয় স্তরের সর্বোচ্চ বিচারালয়। দেশের জনগণ বিচারবিভাগীয় সংস্থাগুলির কাছ থেকে ন্যায়বিচার পেতে পারে—বিচারবিভাগ সকলের নাগালের মধ্যে। বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ সুশীল সমাজকে শক্তিশালী করে।

(৬) জাতীয় স্তরের অধস্তন সরকারসমূহ : প্রাদেশিক, আঞ্চলিক বা রাজ্য স্তরের সরকারগুলি জাতীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির আওতা থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তারা নিজ সাংবিধানিক এলাকায় আঞ্চলিক স্বার্থ ও প্রয়োজন অনুসারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তাদের যদি কর আরোপের নিজস্ব ক্ষমতা থাকে, তাহলে তারা নিজ এলাকার জনগণের ভালভাবে সেবা করতে পারে। ফলে সুশীল সমাজের কার্যসম্পাদন সুচারু হতে পারে।

সুশীল সমাজের কাঠামো :

সব দেশেই সুশীল সমাজের স্বার্থ রক্ষাকারী কিছু সাংগঠনিক কাঠামো দেখা যায়। চারধারে সীমারেখা টেনে সুশীল সমাজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাচীরবন্ধ এলাকায় পরিণত করা যায় না। যেসব বিভিন্ন সংগঠন সুশীল সমাজের কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে সেগুলি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—সামাজিক কাঠামোর সেইসব অংশ যারা কোন না কোনভাবে রাষ্ট্রের সংস্থাসমূহের যুক্ত সেগুলি থেকে সেই সব অংশ যারা কার্যত স্বাধীন সেগুলিও হতে পারে। বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, তাদের নেতৃত্ব ও পরিবেশের তারতম্যের ভিত্তিতে, ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির দরকষাকষির সামর্থ্য বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে। অরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির শুধুমাত্র স্বাধীনতা থাকলেই হবে না, বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে এবং রাষ্ট্র ও বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্কও থাকা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি হল—

(১) রাজনৈতিক দল : সমস্ত রাজনৈতিক দলই জনগণের স্বার্থ ও প্রয়োজনের প্রতিনিধিত্ব করে—কখনও কখনও প্রবলভাবে। রাজনৈতিক দল যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উচ্চস্তরে আঞ্চলিক, পেশাগত, মতাদর্শগত বা অন্যান্য স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন সেগুলি সুশীল সমাজের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। ইতিহাসে দেখা গেছে যে এক-দলীয় কাঠামো সাধারণত রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হাতকেই জোরদার করে। তবে যদি দলটির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গণতন্ত্র থাকে তাহলে অবস্থা অন্যরকম হতে পারে। ইতিহাসে আরও দেখা গেছে যে বহুদল ব্যবস্থা রাজনৈতিকভাবে আধিপত্যযুক্ত অভিজাত শ্রেণীর গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করে, সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থ নয়, তাই বহুদল ব্যবস্থাযুক্ত রাষ্ট্রও শক্তিশালী সুশীল সমাজের অস্তিত্বের কোন নিশ্চয়তা দেয় না। নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কার্যকর আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে দলগুলির ভূমিকা ও অবদান বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(২) গণমাধ্যম : অনেক দেশেই গণমাধ্যম—দুরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্র—রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে সর্বত্র তা হয় না। অনেক সময় সাংবাদিকরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অসদাচরণ বা দুর্নীতি প্রকাশ করে দেন এবং অ-রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পক্ষে কাজ করেন। তাদেরকে সুশীল সমাজের অংশ বলা যায়। আধুনিক কালে ডিজিটাল বিপ্লবের পর ইন্টারনেট ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশীল সমাজের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে।

(৩) স্থানীয় সরকার : জেলা, অঞ্চল বা গ্রামের স্থানীয় স্তরের সরকারসমূহ সুশীল সমাজের অংশ হিসাবে কাজ করে; তবে তাদের আর্থিক সংস্থান ও আইনগত স্বাধীনতার অস্তিত্বের ওপর তাদের ভূমিকা নির্ভর করে। তারা যদি কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চলার সামর্থযুক্ত হয় এবং নাগরিকদের পছন্দমত কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তাদের পক্ষে অ-রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব হয়, কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রসারণ হিসাবে তাদের দেখা যায়, তাহলে তারা সুশীল সমাজের অংশ হতে পারে না।

(৪) ব্যবসা ক্ষেত্র : ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্যোগের যে অংশ শুধুমাত্র পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন ও ব্যক্তিগত মুনাফার সঙ্গে যুক্ত, সেই অংশটি সুশীল সমাজের অংশ নয়। কিন্তু কোন কোন ব্যবসার ক্ষেত্র নীতিসংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং জনসেবায় নিয়োজিত; সেই ক্ষেত্রগুলি সুশীল সমাজের অংশ। বিভিন্ন ব্যবসায় উদ্যোগের নিজস্ব আয় ও নিজস্ব অর্থের উৎস আছে। তারা সুশীল সমাজের অন্যান্য অংশগুলির তুলনায় রাষ্ট্রের আওতা থেকে অনেক বেশি স্বাধীন। অনেক দেশের রাষ্ট্রই করের অর্থের জন্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ব্যবসায় উদ্যোগগুলির ওপর নির্ভরশীল থাকে। এটাও আবার দেখা গেছে যে ব্যবসাক্ষেত্রের বিশাল অংশই সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধে চলে। ব্যবসা শুরুর জন্য সরকারি অনুমোদন লাগে এবং অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে কর ছাড় বা অন্যান্য সুযোগসুবিধা ভোগ করে। সেইসব ব্যবসামালিকদের সঙ্গে সরকারের যোগসাজস প্রবল হয়। সেক্ষেত্রে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুশীল সমাজের কোন যোগ থাকে না। ফলে সুশীল সমাজ সংক্রান্ত কোন ভূমিকাও তাদের থাকে না। এশিয়ার অনেক দেশেই বর্তমানে লেজুর পুঁজিবাদ (Crony capitalism)-এর প্রভাব দেখা গেছে। সেসব দেশে নানা বিপদও ঘটেছে। তবে ফিলিপাইসে ফার্ডিনান্ড মার্কোসের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সময় সামাজিক প্রগতির জন্য ফিলিপাইন ব্যবসায়ীগণ (Philipine Businessmen for Social Progress) নামক গোষ্ঠী বলপূর্বক গণতান্ত্রিক শাসন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

(৫) ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ : অনেক ধর্মগোষ্ঠী ও তাদের নেতারা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার জন্য জোর করে, অনেকে আবার রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে চার্চ, মন্দির বা মসজিদ হল সুশীল সমাজের অঙ্গ। ফিলিপাইনে কার্ডিনাল সিনের নেতৃত্বে ক্যাথলিক চার্চ ১৯৮০ থেকে সুশীল সমাজের সক্রিয় অংশে পরিণত হয়। ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রূপান্তর প্রধানত দুটি জাতীয় মুসলমান সংস্থা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়; তারা শাসকদের কাজকে সমালোচনার চোখে দেখত।

কোন কোন দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ এত ব্যাপক যে ধর্মীয় নেতারা পুরোপুরি অপার্থিব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তাঁরা কখনোই সর্বসাধারণের বিষয়ে মাথা ঘামান না এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অসাংবিধানিকভাবে পরিচালিত হলেও রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করেন না (উদাহরণ নাইজেরিয়া)। সেখানকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সুশীল সমাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন। যখন চার্চ বা অন্যান্য ধর্ম প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করে চলে, তখন তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশীদার হয়ে পড়ে। ফলে সেখানকার সুশীল সমাজের শক্তি হ্রাস পায়। দেশের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা রাষ্ট্রের সঙ্গে জোটযুক্ত বা কতটা স্বাধীন সেই প্রশ্ন প্রয়োগিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) ফাউন্ডেশনসমূহ : এগুলি হল অলাভজনক ও মানবতাবাদী বিভিন্ন ধরনের সংগঠন। এগুলি আকারে ছোট, কিন্তু এরা এদের নিজস্ব মতে চলে। অনেকে রাষ্ট্র থেকে স্বাধীন হয়, অনেকে আবার রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগী হয়ে চলে। তাদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরা যা যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে তারা সেই সব বিষয় ও সমস্যাসমূহের মোকাবিলায় যুক্ত থাকে। রাষ্ট্রের এলাকা থেকে স্বতন্ত্র কিছু বাছাই করা ক্রিয়াকলাপের জন্য তারা অর্থ ও বিশেষ জ্ঞান সরবরাহ করে।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয় : যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও আর্থিকভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেগুলি সরকারের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। সরকারি কাজের সমালোচনা বা মূল্যায়নের সুযোগ তাদের হয়ে থাকে না, নতুবা কম থাকে। কিন্তু এক গুচ্ছ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র দেখা যায়, যারা স্বাধীনভাবে চলে; তারা এমন কি সরকারের বিরোধিতাও করে থাকে। ১৯৭৫ সালে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা বিপ্লবের মাধ্যমে থাইল্যান্ডের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটায়। ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক শক্তি হতে পারে। আদর্শ ও জ্ঞান উভয়কে যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ একীভূত করে ফেলতে পারে, তখন সেটি সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

(৮) ট্রেড ইউনিয়ন : ট্রেড ইউনিয়ন হল একটি সংগঠিত ব্যবস্থা, যার মাধ্যম বিশালসংখ্যক নাগরিকদের স্বার্থ প্রকাশিত, একত্রিত ও উন্নীত করা যায়—তাদের নিজ নিজ জীবিকা অর্জনের শর্তাবলির নিরিখে। কোন কোন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে এই ব্যবস্থা থাকে, সেখানে তারা সুশীল সমাজের অংশ নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা সুশীল সমাজের অংশ হিসাবে ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থসমূহের প্রধান সংরক্ষক। গোষ্ঠী হিসাবে কর্মচারীদের মজুরী ও কাজের পরিবেশ ও শর্তাবলিসংক্রান্ত যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্মচারীদের ক্ষমতায়ন ঘটায়। যদি নিয়োগকর্তা বা মালিকের সঙ্গে কোন চুক্তিতে পৌঁছন সম্ভব না হয়, তাহলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্মচারীদের শ্রমদান থেকে বিরত থাকার ব্যবস্থা বা ধর্মঘটের ব্যবস্থা করে।

(৯) পেশাদারী সংগঠনসমূহ : আধুনিককালে বিভিন্ন পেশাদারী সংগঠনসমূহের সম্প্রসারণ ঘটেছে। তারা জনগণ ও সরকার উভয়ের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠিত গোষ্ঠী হিসাবে আইনজীবিরা বিচারব্যবস্থার মধ্যে কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিচারব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে এবং বিচারব্যবস্থা যাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উচ্চ আদর্শ অনুসরণ এবং আইনের চোখে সাম্য সুনিশ্চিত করতে পারে তার জন্য সচেষ্ট থাকে। চিকিৎসক সমিতিগুলি শুধুমাত্র তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থই নয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনসমূহকে সোচ্চারে ব্যক্ত করতে পারে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তারা বৈধতা, মর্যাদা ও তথ্যের অধিকার ভোগ করে। তাই রাষ্ট্রের দাবি বা নীতিসমূহের বিরোধিতা করেও তারা জনগণের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। এইভাবে চিকিৎসক সমিতিগুলি পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাণী সংরক্ষণ, বাঁধ নির্মাণ, অরণ্য নির্মূল করার বিপদ সম্বন্ধে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে জনমত গঠন করতে পারে।

শৈল্পিক সমাজ—লেখক, কবি, গায়ক, চিত্রশিল্পী ইত্যাদিরা তাদের গদ্য বা পদ্যরচনা, নতুন ধ্যানধারণা, সুর ইত্যাদি দ্বারা জনগণের মনকে প্রভাবিত করতে পারে। এইসব সৃজনশীল ব্যক্তিরা সাধারণত প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীনচেতা হন। অনেকে আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কাজের সমালোচনাও করে থাকেন। তাঁরা একটি শক্তিশালী সুশীল সমাজ গঠন করেন; তাঁরা সুশীল সমাজের অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন এবং জনসাধারণকে লেখা, গান, শিল্পকর্ম ইত্যাদি দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। লোকগীতির মাধ্যমেই মার্কিন গণ-অধিকার আন্দোলন ও ভিয়েৎনামের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল।

(১০) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বা এন.জি.ও. সংগঠন : এগুলি হল সুশীল সমাজের প্রধান সংগঠন। এই সংগঠনগুলি স্বাধীনভাবে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকে। তাদের সকলের আকার বা কার্যকারিতা সমান নয়। এগুলি হল বেসরকারি ক্ষেত্রের অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ। প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও অর্থপ্রদানকারীদের প্রতি দায়বন্ধ। তারা জাতীয়, রাজ্য বা স্থানীয় যে কোন স্তরেই সংগঠিত হতে পারে। স্থানীয় স্তরের এন.জি.ও.গুলিকে পরবর্তী প্রতিষ্ঠান (তৃণমূল স্তরের প্রতিষ্ঠান) হিসাবে গণ্য করা হল। এন.জি.ও.গুলি কতটা দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারবে, তা নির্ভর করে তাদের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের যোগাযোগ ও সম্পর্কের ওপর।

(১১) তৃণমূল স্তরের সংগঠন : এগুলি হল স্থানীয় স্তরের সংগঠন। কিন্তু এগুলি স্থানীয় ভিত্তিকে বজায় রেখে রাজ্য বা জাতীয় স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সবসময় দ্বন্দ্বমূলক হয় না, রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক থাকতে পারে। যেমন, কৃষকদের সংগঠন সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ সেবা বিভাগের সঙ্গে বা জল ব্যবহারকারী সংগঠন সরকারের সেচ বিভাগের সঙ্গে একসঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে।

তৃণমূল স্তরের সংগঠনগুলির মধ্যে আনুভূমিক (horizontal) সংযোগ এবং সুশীল সমাজের অন্যান্য সংস্থাসমূহের সঙ্গে উল্লম্ব (Vertical) সংযোগ থাকলে তৃণমূল স্তরের সংগঠনগুলি সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সুশীল সমাজের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।

সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শিত হল—

অ-রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠাসমূহের সঙ্গে সুশীল সমাজের মিথষ্ক্রিয়ার ধরন				
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ		সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ		
মূল সংস্থা	মধ্যবর্তী সংস্থা	মধবর্তী সংস্থা	আধাস্বাধীন সংস্থা	স্বাধীন সংস্থা
১. শাসনবিভাগ ২. প্রশাসন ৩. সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ	৪. আইনসভা ৫. বিচারবিভাগ ৬. জাতীয় স্তরের অধস্তন সরকারসমূহ	১. রাজনৈতিক দল ২. প্রচারমাধ্যম ৩. স্থানীয় সরকার	৪. ব্যবসায় ক্ষেত্র ৫. ধর্মীয় গোষ্ঠী-সমূহ ৬. ফাউন্ডেশন-সমূহ ৭. বিশ্ববিদ্যালয়	৮. ট্রেড ইউনিয়ন ৯. পেশাদারী সংগঠন-সমূহ ১০. এন.জি.ও. সংগঠন ১১. তৃণমূল স্তরের সংগঠন

২.৪ সুশীল সমাজের অবদান

সুশাসনের জন্য সুশীল সমাজের বিভিন্ন কাজগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলি সমাজস্থ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের উপকারসাধন করে। (১) মানবাধিকার লঙ্ঘন ও শাসন-সংক্রান্ত ত্রুটিবিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রহরীর কাজ করে সুশীল সমাজ। (২) সুশীল সমাজ নাগরিকদের অধিকার, পাওনা, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করে এবং সরকারকে নাগরিকদের বক্তব্য জানায়। (৩) সুশীল সমাজ সমাজের দুর্বলতর অংশের স্বার্থ ও বক্তব্য তুলে ধরে এবং

সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। (৪) সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে যেসব অঞ্চল বা যেসব ব্যক্তির কাছে পৌঁছন অসম্ভব হয়, সুশীল সমাজ তাদের জন্য জনসেবামূলক কাজে যুক্ত থাকে। (৫) কোন নির্দিষ্ট নীতি বা কর্মসূচির পক্ষে বা বিপক্ষে সুশীল সমাজ জনমত সংগ্রহ করে। (৬) সামাজিক মূলধনের মাধ্যমে সুশীলসমাজ কাজ সম্পাদনে যুক্ত থাকে। সমজাতীয় ও সাম্যভিত্তিক সমাজে সামাজিক মূলধনের শক্তি বেশি হয়। সেখানে জনগণ স্বেচ্ছায় দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ স্বার্থগুলি পরিপূর্ণ করার কাজে ব্যাপৃত থাকে।

২.৬ ভারতবর্ষে সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন

ভারতবর্ষ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে; সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার কাছে যুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থা জনগণের দ্বারা সরকারে পরিণত হতে পারত, কিন্তু বাস্তবে ব্যবস্থাটি জনগণ ছাড়া সরকারে পরিণত হয়েছে। সাবেকি সরকারি পরিষেবামূলক কাজসমূহের ক্রমবর্ধমান বাজারীকরণের ফলে জনগণ ও সরকারের মধ্যেকার দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে শাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণের যোগ কম দেখা যায়। জনগণ নিজেদের পরিচালনা করে না। অথচ সুশাসনের মৌলিক শর্ত হল জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ, সাম্যব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, সকলের অন্তর্ভুক্তি, আইনের অনুশাসন, দায়িত্ববোধ, কৌশলগত দূরদর্শিতা ইত্যাদি। ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনেক প্রশাসনিক কমিশন নিযুক্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের কোনটাই প্রশাসনের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। ইদানিং কালে তথ্য অধিকার আইন (Right to Information Act), গ্রাহক সুরক্ষা আইন (Consumer Protection Act) নাগরিকদের সনদ (Citizens Charter), তথ্যফাঁসকারীদের সুরক্ষা (Whistleblowers’ Protection), বৈদ্যুতিন প্রশাসন (e-governance), গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (democratic decentralisation), জনস্বার্থ মামলা (public interest litigation) ইত্যাদির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য নাগরিকদের সুরক্ষা বা নাগরিকদের কাছ থেকে অভিযোগ (বাইরের চাপ)-কে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

আধুনিক কালের ভারতীয় সুশীল সমাজ রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টির যথাসাধ্য উদ্যোগ নিচ্ছে, কিন্তু ভারতে সুশাসন জোরদার করার ক্ষেত্রে এখনও তাদের ভূমিকা পালন পুরোপুরি সফল হয়নি। শুধুমাত্র যেসব ক্ষেত্রে সব শ্রেণীর মানুষের সমান আগ্রহ ও স্বার্থযুক্ত থাকে, সেই সব ক্ষেত্রসংক্রান্ত বিষয়ে সুশীল সমাজ কিছুটা সফল হতে পেরেছে। ভারতের সুশীলসমাজ সংকীর্ণ গোষ্ঠী আনুগত্য ও স্বার্থের ভিত্তিতে বিভক্ত। তাই সরকার নামক বিশাল রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের সঙ্গে মোকাবিলা করার সামর্থ্য ভারতীয় সুশীল সমাজ এখনও অর্জন করতে পারেনি।

২০০৬-এর স্বেচ্ছামূলক ক্ষেত্রসংক্রান্ত ভারত সরকারের জাতীয় নীতি (National Policy on the Voluntary Sector)টি ভারতের স্বাধীন, সৃজনশীল ও ও কার্যকর স্বেচ্ছামূলক ক্ষেত্রকে কিছুটা উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু তাদের প্রতি অন্ধ ও আবেগমূলক সরকারি সমর্থন সঠিক নয়। সরকারকে তাদের সামর্থ্য, কার্যকারিতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে এবং তাদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে হবে। আবার যদি রাজনৈতিক শাসকের যোগ্যতা ও সামর্থ্য সন্তোষজনক না হয় তাহলে শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ভারতের সুশীল সমাজকে বর্তমান ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মান, সততা ও অঙ্গীকারবদ্ধতার অবনয়ন এবং রাজনীতির

দুর্বৃত্তায়ন সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। রাষ্ট্রকে নির্বাচনী সংস্কার ও ভোটদাতাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সুশীল সমাজকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্মক্ষমতা ও কর্মক্ষমতার অভাবকে মাঝে মাঝে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সুশীল সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে তবেই ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র ভবিষ্যতে অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারবে।

২.৭ উপসংহার

সুশীল সমাজের বিভিন্ন কাজ ও প্রকল্পসমূহ নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, নাগরিক স্বার্থ সম্প্রসারণ বা নাগরিক প্রয়োজন পূর্ণ করা সংক্রান্ত গণবিতর্ককে উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন ধরনের সুশীল সমাজ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ চূড়ান্ত স্তরে রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে গণবিতর্কের বিষয়গুলিকে আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ করার উদ্যোগ নিতে পারে। রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক নিয়ম চালু করে, যেগুলির ভিত্তিতে গণবিতর্ক সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূ হতে পারে। নাগরিক, সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া একদিকে স্থায়িত্ব এবং অন্যদিকে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করে। যদি যোগদানকারীরা মিথষ্ক্রিয়ার শর্তগুলি পূরণ করতে না পারে, কিংবা যদি তাদের মধ্যে যোগাযোগের পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে সিদ্ধান্তগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। তখন বৈধতার সংকট দেখা দেয়। নাগরিকরা সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিজেদের খুঁজে পায় না। ফলে দেখা দিতে পারে কর্তৃত্বের সংকট, যা আবার রাষ্ট্রের মধ্যেকার ক্ষমতা সম্পর্কের নতুন বিন্যাস ঘটাতে পারে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাস সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ দ্বারা নির্মিত হয় আর সেই আর্থসামাজিক উপাদানগুলি সৃষ্ট হয় এককভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা নতুবা রাষ্ট্রের আধিপত্যযুক্ত সুশীল সমাজ দ্বারা নতুবা ব্যক্তি, স্বার্থগোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের সহযোগিতার দ্বারা। দেশের আর্থসামাজিক- রাজনৈতিক বিন্যাস কিভাবে গঠিত হয় এবং কিভাবে তা কাজ করে তার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের কাঠামো নির্ধারিত হয়।

যেসব সংগঠন ও সংস্থাসমূহ নাগরিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যেগুলি সব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বা সব সময়ে এক রকম নয়। কোন কোন দেশে সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গণমাধ্যম, ল্যাটিন আমেরিকায় তা ছিল ধর্ম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আবার তা ছিল ছাত্র আন্দোলন। এখন নারী গোষ্ঠীসমূহ, পরিবেশ সংরক্ষণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী, শিক্ষা উন্নয়ন সংগঠন ও গোষ্ঠীসমূহ ইত্যাদি সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের ভিত্তিতে এই সব গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়নের প্রয়োজন আর প্রয়োজন হল সুশীল সমাজের গোষ্ঠীসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ। এগুলি বাস্তবায়িত হলেই এই গোষ্ঠীগুলি দক্ষতার সঙ্গে এবং কার্যকরভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করতে পারবে।

২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসন ও সুশীল সমাজের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিততটি ব্যাখ্যা করুন।

(২) সুশীল সমাজের অর্থ কী? সুশীল সমাজের ধারণার বিবর্তনের ওপর আলোকপাত করুন।

(৩) সুশীলসমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পারস্পরিক প্রভাবের ওপর একটি টীকা লিখুন।

(৪) ভারতবর্ষে সুশীল সমাজও জনপ্রশাসনের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ছয়টি বিভাগের কাজ সম্বন্ধে লিখুন।

(২) সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ আলোচনা করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) সুশীল সমাজের অর্থ কী?

(২) রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ছয়টি বিভাগ কী?

(৩) সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি চিহ্নিত করুন।

(৪) সুশীল সমাজের কী উপকারিতা আছে?

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Edwards Michael, *Civil Society*, Polity Press, Cambridge, England 2004.

Ehrchberg, John, *Civil Society*, New York University Press, New York, 1999.

Frank, Arechiarico, Administrative Culture and Civil Society, *Sage journals*.

Hayden, Robert, Dictatorships of Virtue, *Hervard International Review*, Summer, 2002.

Holloway, John, *Challenging the world without taking power*, Pluto Press, London, 2002.

Putnam, R. D., *Making Democracy Work*, Princeton University Press, New Jersy, 1993.

World Bank, Governance and Development, Washingtone D. C., 1992.

একক-৩ ❑ বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ বিশ্বায়নের অর্থ ও সংজ্ঞা
৩.৪ বিশ্বায়নের ইতিহাস
৩.৫ বিশ্বায়নের প্রভাবসমূহ
৩.৬ বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
৩.৭ বিশ্বায়ন—সুবিধা ও অসুবিধা
৩.৮ বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন
৩.৯ জনপ্রশাসনে পরিবর্তন
৩.১০ উপসংহার
৩.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী
৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবগত হবেন এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন :

- বিশ্বায়নের অর্থ ও তার ইতিহাস।
- বিশ্বায়নের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব এবং বিশ্বায়নের উপকারিতা ও অপকারিতা।
- বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিশ্বায়নের সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করার জন্য জনপ্রশাসন দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন ধরনের কৌশলসমূহ।

৩.২ ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ প্রবণতা হল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া। কখন তার উদ্ভব হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা যায় না, কারণ একশো বছর আগেও সীমিতভাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব ছিল। তখন উন্নত দেশের পুঁজিপতিরা

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বাজার স্থাপন করেছিলেন। বস্তুত, পুঁজিবাদের উদ্ভব থেকেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের আট-এর দশকে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি কৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভৌগোলিক ও আইনগত সীমারেখা প্রায় মুছে গেছে আর এই সময় থেকেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে বলা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দ্রুতগতি লাভ করেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলির আবির্ভাব বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে জনপ্রিয় পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য হল বিশ্বগ্রাম (Global Village) প্রতিষ্ঠা, যার মধ্যে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, ব্যবসাসংক্রান্ত, বৈদ্যুতিন (electronic) ইত্যাদি ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতিগত, মতাদর্শগত, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আদান-প্রদান ঘটে এবং একটি বিশ্বসমাজ, বিশ্ব শাসন ও বিশ্ব প্রশাসনের বিশেষ ধারা উদ্ভব হয়। বিশ্বায়নের ফলে সরকারি বিষয়সংক্রান্ত সব আলোচনা ও নজরের কেন্দ্র জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে স্থানান্তরিত হয়। ক্রমবর্ধিত হারে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের জটিল নেটওয়ার্কটিকে ঘিরে এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করে। পরিবর্তনশীল বিশ্বায়ন এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবর্ধমান চাপও চ্যালেঞ্জসমূহের সামনে জনপ্রশাসনের এখন হিমসিম অবস্থা ঘটেছে।

৩.৩ বিশ্বায়নের অর্থ ও সংজ্ঞা

রোল্যান্ড রবার্টসনের মতে বিশ্বায়ন হল বিশ্বের সংহতিকরণ প্রক্রিয়া এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্ববোধের অনুভূতি। মার্টিন আলব্রো মনে করেন যে বিশ্বায়ন হল বিশ্বের সমস্ত জনগণকে একটি সামগ্রিক বিশ্ব এককে পরিণত করা। বিশ্বের বিভিন্ন ধ্যানধারণা, পণ্য, দর্শন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের আদানপ্রদান থেকে আন্তর্জাতিক একীকরণ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে এবং পরিবহন ব্যবস্থা ও টেলিকমিউনিকেশন পরিকাঠামো (যার অন্তর্গত হল ইন্টারনেট, টেলিগ্রাফ, বেতার যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি) আন্তর্জাতিক একীকরণকে আরও জোরদার করে। এইসব প্রযুক্তিগত সুবিধাসমূহ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আগের থেকে বেশি পরস্পর-নির্ভরতার সৃষ্টি করে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF)-এর দ্বারা প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে বিশ্বায়ন হল অধিক পরিমাণে এবং অধিক সংখ্যায় পণ্য পরিষেবার আন্তঃসীমান্ত লেনদেন, মুক্ত আন্তর্জাতিক পুঁজি-প্রবাহ এবং প্রযুক্তির আরও দ্রুত ও আরও ব্যাপকতর প্রসারের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান পরস্পর-নির্ভরশীলতা। বিশ্বায়নের ওপর আন্তর্জাতিক ফোরামের মতে বিশ্বায়ন হল বিশ্বব্যাপী অতিজাতীয় কর্পোরেট ব্যবসায় ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা জাতীয় সরকারের কাছে দায়িত্বশীল নয়, তাদের আধিপত্যযুক্ত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাম্প্রতিক উদ্যম বা প্রবণতা। ওয়ালারস্টাইন বলেছেন যে ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশকে বাদ দিয়ে আলাদাভাবে বিশ্বায়নকে অনুধাবন করা যায় না। চমস্কির মতে, বিশ্বায়ন হল একটি আন্তর্জাতিক সংহতিকরণ প্রক্রিয়া, যা বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যেসব পার্থক্য আছে, তাদেরকে যথাসম্ভব মুছে ফেলে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণ করে।

বিশ্বায়নের বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলি বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণকে সর্বোচ্চ পরিমাণে উন্নীত করার জন্য ব্যক্তি, কর্পোরেশন ও সরকারের সম্পর্ক এবং ভূমিকাসমূহকে তুলে ধরে। পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে যে

বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত দিকগুলি পরস্পর-সংযুক্ত। এই দিকগুলি আবার ব্যক্তির জীবনের বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাত্রার ধরনের সঙ্গে যুক্ত আর তাই বিশ্বায়ন দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ জোরদার বিতর্কের সূচনা করে।

অর্থনৈতিকভাবে ব্যবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগ, দেশান্তরগমন ইত্যাদি দ্বারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় এবং অর্থনৈতিক পণ্য ও পরিষেবা প্রবাহের সঙ্গে তা যুক্ত থাকে। ব্যবসাবাণিজ্যের বিশ্বায়নের ফলে মানুষ নানা ধরনের পণ্য ও পরিষেবা ভোগের সুবিধা লাভ করে, যা মানুষের ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি। জার্মান গাড়ি থেকে কলম্বোর কফি, চীনের খেলনা থেকে ইজিপ্টের তুলো, জাপানের সুশী থেকে আমেরিকার স্টারবাক্স—বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষ বিচিত্র ধরনের পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় করতে পারে। এফ. ডি. আই. বা প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment)-এর মাধ্যমে বিনিয়োগের বিশ্বায়ন ঘটে। ফলে অতিজাতিক সংস্থাগুলি তাদের সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী রাষ্ট্রে বিনিয়োগ করতে পারে কিংবা অন্য রাষ্ট্র থেকে অর্থসংক্রান্ত সম্পদ ক্রয় করতে পারে কিংবা অন্য রাষ্ট্রে পরোক্ষ বিনিয়োগ দ্বারা তাদের সম্পদ বিক্রী করতে পারে। দেশান্তরগমনের সুযোগের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিকরা অন্য রাষ্ট্রে, যেখানে শ্রমিকের ঘাটতি আছে, সেখানে চাকরি খুঁজে নিতে পারে।

অতিজাতিক (transnational) অভিজাত গোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার অবনয়ন হল **বিশ্বায়নের রাজনৈতিক দিক**। এর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক নানা নিয়ম ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসূমহ, যারা ব্যবসাবাণিজ্য, মানবাধিকার ও পরিবেশসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে। বিশ্বায়নের ফলে এই জাতীয় যেসব নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেগুলির কয়েকটি হল আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation), বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) ও তার বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাসমূহ ইত্যাদি। কোন সরকার সচেতনভাবে আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগের জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করবে কি করবে না কিংবা কতটা করবে তা হল বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সমাজকর্মীরা এবং অলাভজনক বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন গ্রীনপিস (Greenpeace), অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল (Amnesty International) ইত্যাদিও আন্তর্জাতিক প্রকৃতিযুক্ত হয়ে পড়েছে। এই জাতীয় অনেক সংগঠন বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কিছু কিছু দিক নিয়ে চিন্তিত, কারণ তাদের আশঙ্কা হল যে অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য জাতিরাষ্ট্র হয় তার নাগরিককে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে রক্ষা করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলতে পারে কিংবা যেসব রাষ্ট্র নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তাদেরকে সমর্থন করতে পারে।

বিশ্বায়নের ফলে **সংস্কৃতিগত দিকে** আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ব্যবসাবাণিজ্য, ভ্রমণ, প্রচারযন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্য পরিষেবা, নতুন ধ্যানধারণা, আদর্শ, গান, কবিতা ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে এবং সেগুলি তড়িৎগতিতে বিশ্বময় প্রসারিত হয়। আন্তর্জাতিক নামী সংস্থা, যেমন কোকা কোলা, নাইকি বা সোনি বিশ্বব্যাপী উপভোক্তাদের কাছে সমভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতে বসবাসকারী এক ব্যক্তি আর আমেরিকায় থাকা এক ব্যক্তি একইভাবে সেগুলি উপভোগ করে।

প্রযুক্তিবিদ্যার বৈপ্লবিক পরিবর্তন (বিশেষত **পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে** এবং তথ্য প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের এলাকায়) বর্তমানে একটি বৈশ্বিক গ্রাম (Global village) সৃষ্টি করেছে বলে দাবী করা হয়। ১৯৫০

সালে জলপথে বিশ্বভ্রমণে এক বছর সময় লেগেছিল। এখন আকাশপথে একদিনেই বিশ্বভ্রমণ করা যায়। তাছাড়া বিশ্বের যে কোন প্রান্তে এক মুহূর্তের মধ্যে ইমেলে বক্তব্য জানানো যায়, এক বিলিয়ন দর্শকের সঙ্গে দূরদর্শন বা কম্পিউটারের সামনে বসে বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে একসঙ্গে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচের ফাইনালের খেলা উপভোগ করা যায়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে পরিবহনের জন্য ব্যয় অনেক কমে যাওয়ায় দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিভিন্ন দেশের বিদেশী বাজার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। সস্তায় টেলিকম ও ভ্রমণ সম্ভব হওয়ায় আন্তর্জাতিক লেনদেন ও মিথষ্ক্রিয়া অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পেয়েছে—ইতিহাসে যা নজিরবিহীন বলা যায়। উত্তর আটলান্টিকের টুনা মাছ ধরে পরের দিনই তা এশিয়া বা আফ্রিকার কোন রেস্তোরাঁয় পরিবেশন করা যায়। প্রতিদিন প্রায় কোন খরচ ছাড়াই বৈদ্যুতিন উপায়ে লক্ষ লক্ষ ডলারের (সম্পদ ও মুদ্রায়) আদান প্রদান হয়। বিশ্বায়ন সর্বক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করছে—অর্থনীতি, প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক বিষয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক, পরিবেশও মতাদর্শগত উপাদান ইত্যাদি।

বিশ্বায়ন, যা অনেক সমস্যা ও পরিবর্তনের কারণ, তাকে আবার পরিবর্তনের সমার্থক মনে করা হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে মূলধন প্রবাহের চারটি মৌলিক রূপই বিশ্বায়নের সৃষ্টি করে—

(১) মানব মূলধন (অভিবাসন বা immigration, দেশান্তরগমন বা migration, প্রবাস, নির্বাসন, আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ইত্যাদি)

(২) আর্থিক মূলধন (সাহায্য, বিনিয়োগ, ঋণ, ইকুইটি ফান্ড, আমানত)

(৩) সম্পদ মূলধন বা resource capital (ব্যক্তি, ধাতু, খনিজ আকরিক)

(৪) ক্ষমতা মূলধন বা power capital (নিরাপত্তাবাহিনী, জোটবন্ধন, সশস্ত্র বাহিনী)

চার ধরনের পরস্পর সংযুক্ত পেশাগোষ্ঠী—(i) সাংবাদিক, (ii) গ্রন্থাগারিক, (iii) শিক্ষক ও গবেষক এবং (iv) প্রকাশক ও সম্পাদকদের সম্মিলনের ফলে বিশ্বায়নের ধারণার উদ্ভব ঘটে। ২০০০ সালে আই.এম.এফ. (IMF) বিশ্বায়নের চারটি দিকের কথা বলে—ব্যবসা ও বাণিজ্য, মূলধন ও বিনিয়োগ প্রবাহ, দেশান্তরগমন ও জনগণের যাতায়াত এবং জ্ঞানের বিতরণ ও প্রচার। পরিবেশসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, যেমন বিশ্ব উষ্ণায়ন, আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ, জলদূষণ, সমুদ্রে অতিরিক্ত মৎসশিকার ইত্যাদি বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া একদিকে ব্যবসা সংগঠন, অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে সেগুলি দ্বারা আবার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া প্রভাবিতও হয়।

বিশ্বায়ন হল একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যা জনগণ, প্রতিবেশী গোষ্ঠী, শহর, অঞ্চল, দেশ ইত্যাদিকে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ করে—যা আগে দেখা যায়নি। আধুনিক মানুষের জীবন বিশ্বের অন্যান্য মানুষের জীবনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত, কারণ যে খাদ্য তারা খায়, যে সঙ্গীত তারা উপভোগ করে, যে তথ্য তারা সংগ্রহ করে এবং যেসব ধারণা ও আদর্শ তারা পোষণ করে, সেগুলি বিশ্বের সর্বত্রই একরকম। বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ফলে এখন জাতীয় রাষ্ট্রের সীমারেখার গুরুত্ব অনেক কমে গেছে এবং বিশ্ব একটি সমজাতীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে দাবী রাখে।

৩.৪ বিশ্বায়নের ইতিহাস

বিশ্বায়নকে সাধারণভাবে সাম্প্রতিক ঘটনা বলে মনে করা হয় এবং অষ্টাদশ শতক বা জ্ঞানদীপ্তির যুগ থেকে

এর সূচনা ঘটেছিল বলে মেনে নেওয়া হয়। এই সময়েই আধুনিকতার ধারণারও উদ্ভব ঘটে। কিন্তু হঠাৎ করে বিশ্বায়নের সৃষ্টি হয়নি। বিশ্বায়নের সুদীর্ঘ ও ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। হাজার বছর ধরে মানুষ বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করেছে। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে মেলামেশা বেড়ে গেছে। সিল্ক রোড স্থলপথে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপকে বহুদিন আগেই যুক্ত করেছিল। এই ব্যবস্থাটি হল আন্তঃসীমান্ত ভ্রমণের অন্যতম উদাহরণ এবং প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত স্থানীয় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন যোগাযোগের ভিত্তিতে সামাজিক রূপান্তরের নজির। এই যোগাযোগের ফলে ভাষা, ধর্ম, দর্শন, শিল্পকর্ম এবং সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলি প্রসারলাভ করে এবং তা মিশ্রিত রূপ ধারণ করে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়রা তাদের সহযোগের অভিযানের সময়, বিশেষত অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকার নতুন বিশ্বে ভ্রমণের সময় গুরুত্বপূর্ণ নানা আবিষ্কার করে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়—প্রথমে পর্তুগীজ ও স্পেনীয় এবং পরে ব্রিটিশ ও ডাচ সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্যের উন্নয়ন, মানুষের বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ এবং পণ্যদ্রব্য ও ভাব বা ধ্যানধারণাসমূহের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ ঘটে। অষ্টাদশ শতকে হয় শিল্প বিপ্লব আর ঊনবিংশ শতকে দেখা যায় শিল্পে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন এবং নতুন ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা—রেলপথ, বাষ্পচালিত ট্রেন ও জাহাজ এবং টেলিকম ব্যবস্থা—টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন। এগুলি ক্রমবর্ধিতভাবে এবং দ্রুত গতিতে বিশ্বব্যাপী আদানপ্রদান সম্ভব করে। ফলে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ও বিংশ শতকে বিশ্ব অর্থনীতি ও সংস্কৃতি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে পড়ে। উন্নত রাস্তা, যানবাহন, আকাশ পথের জন্য এরোপ্লেন, জলপথের জন্য জাহাজ, স্থলপথের জন্য ট্রেন, ভ্যান, গাড়ি ইত্যাদি এবং ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, মোবাইল, ইন্টারনেট, ইমেল ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। বিংশ শতকের শেষ দিকে এগুলি ব্যবসা, বাণিজ্য ও সম্পর্কসূত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একীভূত করে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন হল নিরন্তর ও ধারাবাহিকভাবে বিকশিত প্রক্রিয়া।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্ট হয় উদারীকরণ, যার বৈশিষ্ট্য হল নব্যধ্রুপদী অর্থনৈতিক মডেল। এই মডেলের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার অবাধ প্রবাহ। এর ফলে দেখা যায় বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রে রপ্তানি ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ প্রবণতা এবং সংরক্ষণমূলক শুল্ক ও বাণিজ্যের অন্যান্য বাধাসমূহ অপসারণের জন্য প্রবল চাপ। ঊনবিংশ শতকের উদারীকরণ ছিল বিশ্বায়নের প্রথম ধাপ, যা শিল্পায়নের জন্ম দেয়। এই যুগের তত্ত্বগত ভিত্তি স্থাপন করে ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধা ও সাধারণ ভারসাম্যের নিয়ম সংক্রান্ত কাজ। বলা হয় যে জাতিরাষ্ট্রগুলি স্বাধীন পরিবেশে কার্যকরভাবে ব্যবসা করবে এবং যোগান বা চাহিদার ক্ষেত্রে সাময়িক ব্যাঘাত ঘটলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেদের সংশোধন করে নেবে। ১৮৫০ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে মুখ্য শিল্পপ্রধান জাতিরাষ্ট্রগুলিতে স্বর্ণমান ধাপে ধাপে প্রবর্তিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুততর গতিতে বিশ্বায়নের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। এই যুগের বিশ্বায়ন GATT বা গ্যাটের আওতাধীনে বাণিজ্য আপস চক্র দ্বারা চালিত হয়, যার ফলে অবাধ বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণের অপসারণের জন্য বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদিত হয়। জাতিসমূহের অর্থবৃদ্ধির অনুকূলে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আই.এম.এফ. সৃষ্ট হয়। উরুগুয়ে আলোচনার পর ১৯৭০ সালে চুক্তি দ্বারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠন করা হয় বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য। অবাধ বাণিজ্যের সমর্থনে অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়; ইউরোপের মাসট্রিক্ট চুক্তি ও উত্তর আমেরিকার অবাধ বাণিজ্য চুক্তি দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ধীরে ধীরে বহুজাতি সংস্থাসমূহ বা MNC-দের আবির্ভাব হয়। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল জেনারেল মোটরস, ফোর্ড মোটর, টয়োটা, ইত্যাদি যানবাহন উৎপাদনকারী কোম্পানী, সামসুং, এল.জি., সোনি ইত্যাদি ইলেকট্রনিক কোম্পানি এবং ম্যাকডোনাল্ড, কাফে কফিডে ইত্যাদি ফাস্ট ফুড কোম্পানি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতা কমতে থাকে। অতিজাতিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ঘটে—যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), জি-৮, ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট (EEC), নাফটা (NAFTA)। তাছাড়াও আবির্ভাব ঘটে এক ঝাঁক অসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (NGO), যেগুলি জাতীয় আইন ও নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ হলেও আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করতে থাকে। আন্তর্জাতিক মানচিত্র কয়েকটি সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র থেকে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ জগতে পরিণত হয়।

৩.৫ বিশ্বায়নের প্রভাবসমূহ

বিশ্বায়নের প্রভাব একদিকে আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে এবং অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের সব দেশগুলিতেই অনুভূত হয়। তাদের মধ্যে অনেকগুলি বৃদ্ধি ও বিকাশের সহায়ক, অনেকগুলি আবার নয়।

(i) ইউরোপ ও আমেরিকার ওপর প্রভাব

বিশ্বায়নের ফলে আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থনীতিতে, বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক বাজার রাজনীতিতে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এইসব পরিবর্তনগুলি আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি এখন বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে নতুন ধরনের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও বিন্যাস দেখা দিয়েছে, যাদের কয়েকটি হল—

(১) অবাধ বাণিজ্য এলাকা :

এটি হল কিছু দেশের মধ্যে চুক্তি যা আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা ও নিয়ন্ত্রণসমূহ অপসারণের কথা বলে।

(২) কাস্টমস্ ইউনিয়ন :

এর সদস্যরাষ্ট্ররা নিজেদের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বাধা বা প্রতিবন্ধকতাসমূহকে দূর করে অভিন্ন বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করে।

(৩) ইউরোপীয় কমন মার্কেট :

১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী ফ্রান্স, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় রিপাবলিক, ইটালী, বেলজিয়াম, নেদ্যারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ—এই ছটি দেশকে নিয়ে এটি গঠিত হয়। পরে এর সদস্য সংখ্যা হয় পনেরো। এর সব সদস্যই হল ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং সকলেই গণতান্ত্রিক প্রকৃতিসম্পন্ন। এই সংস্থার কাজগুলি হল—

(ক) পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টম ডিউটি ও পণ্যদ্রব্যের পরিমাণের নিয়ন্ত্রণকে অপসারিত করা।

(খ) সাধারণ পরিবহন নীতিরচনা।

(গ) সাধারণ কৃষিসংক্রান্ত নীতি পরিকল্পনা।

(ঘ) ঋণ পরিশোধের হিসাবের (balance of payment) ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতার নিয়ন্ত্রণ।

(ঙ) সাধারণ বাণিজ্য নীতির বিকাশ।

(৪) উত্তর আমেরিকার অবাধ বাণিজ্য চুক্তি (NAFTA) :

এই চুক্তিটি ১৯৯৪ সালে সম্পাদিত হয়। এর সদস্য হল দুটি উন্নত রাষ্ট্র—আমেরিকা ও কানাডা এবং একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র—মেক্সিকো। এর কাজগুলি হল—

(ক) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধাসমূহের অপসারণ।

(খ) শিল্প বিকাশের গতি বৃদ্ধি করা।

(গ) প্রতিযোগিতার সুযোগ বাড়ানো।

(ঘ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন।

(ঙ) মেক্সিকোর শিল্পায়নের গতির বিকাশ ঘটানো।

(৫) ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংস্থা (European Free Trade Association) :

১৯৫৯ সালে এটির উদ্ভব হয়। এর সদস্য-রাষ্ট্রগুলি হল অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেন। এর কাজগুলি হল—

(ক) বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধার দূরীকরণ।

(খ) শুল্কসমূহের অপসারণ।

(গ) অবাধ বাণিজ্যকে উৎসাহপ্রদান।

(ঘ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি।

(ii) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর প্রভাব

আধুনিক পটভূমিতে তৃতীয় বিশ্ব শব্দটির কোন গুরুত্ব নেই। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব নামে পরিচিত ছিল। উভয়েই বৃহৎ শক্তি হিসাবে পরিগণিত হত। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই তাদের যেকোন একজনের সঙ্গে জোটবদ্ধ ছিল। উভয়ের মধ্যে কারো সঙ্গেই কোন জোট যুক্ত ছিল না, এমন সব জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলা হত। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিশ্ব অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তাও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে এখনও তৃতীয় বিশ্ব নামে অভিহিত করা হয়।

তৃতীয় বিশ্বের ওপর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবজনিত পরিবর্তনগুলি হল—

(১) সার্ক : এশিয়ার বাণিজ্য ব্লক হিসাবে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য দক্ষিণ এশীয় প্রতিষ্ঠান (South Asian Association for Regional Cooperation বা SAARC) ১৮৮৩ সালে গঠিত হয়। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ ছিল এর সদস্য। পরে আফগানিস্তান ও নেপাল এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

এর উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপগুলি হল—

(ক) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানো।

(খ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির জনগণের জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি।

(গ) অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

(ঘ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(ঙ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত উদারীকরণ নীতি গ্রহণ।

(২) চীনের বাজার : প্রথমে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রবর্তন করলেও পরে কমিউনিষ্ট চীন অনেক অর্থনৈতিক সংস্কার গ্রহণ করে এবং ১৯৮৪ সালে বেসরকারিকরণ নীতিকে সমর্থন জানায়। চীন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zones) গঠন করেছে এবং বিশাল পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করেছে। চীনের প্রতি শহরে এবং প্রতি নগরে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অঞ্চল গঠিত হয়েছে। এই অঞ্চলগুলি স্বাধীন এবং সেখানে দ্রুতগতিতে ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করা হয়।

(৩) জাপানী বাজার : গত পঞ্চাশ বছরে জাপানের অর্থনীতির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রক জাপানের কর্পোরেট ক্ষেত্রগুলির নীতি ও কৌশলসমূহকে নির্দেশিত করে।

(৪) ভারতের ওপর প্রভাব : ভারতীয় অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভারত সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে এবং ভারতের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক আদানপ্রদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বায়ন-উত্তর ভারত টেলিকম, তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা, উৎপাদনশীলতার বিকাশ, অবাধ বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগসুবিধা প্রদান করে। ভারত এখন WTO-র সদস্য আর এই WTO হল বিশ্ববাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক। উদারীকৃত অর্থনীতির শর্ত ও প্রয়োজন যাতে পূর্ণ হয়, সেজন্য ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়সংক্রান্ত আইনসমূহের সংশোধনও করা হচ্ছে, যেমন ফেমা (FEMA)। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

৩.৬ বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিশ্বায়ন হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংহতিসাধন, আর্থিক আদানপ্রদান, বাণিজ্যিক সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া। অনেকে অবশ্য বিশ্বায়নকে অর্থনৈতিক ধারণা হিসাবেই দেখেন। তাঁদের মতে, বিশ্বায়ন হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বা পুঁজি ও প্রযুক্তির আদানপ্রদান। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। বিশ্বায়ন হল আজকের পরস্পর-নির্ভরশীল বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের মূল ভিত্তি। এখন তথ্য ও অর্থ আগের থেকে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়। দেশের এক অংশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও পরিষেবা এখন বিশ্বের অন্যান্য অংশে ত্বড়িৎগতিতে পৌঁছে যায়। আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এখন প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যসামগ্রী, অর্থ, তথ্য, মানুষ

ইত্যাদির যাতায়াত, যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া ক্রমবর্দ্ধমান আর সেই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্য প্রযুক্তিগত সংস্থা, আইনি সংগঠন ও নানা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে।

প্রথমত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্ট হয়েছে ওপেক (OPEC), ডব্লিউ.টি.ও (WTO), আই.এম.এফ. (IMF) ইত্যাদি সংস্থাসমূহ। তাদের ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক বহুজাতিক সংস্থা (MNC)ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান, বহু-সাংস্কৃতিকতার প্রসার, সাংস্কৃতির বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিতির সুযোগ ইত্যাদি অনেক বেড়ে গেছে। হলিউড ও বলিউড সিনেমার রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আশংকা থাকছে যে, আমদানিকৃত বিদেশী পশ্চিমী সংস্কৃতি উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশের স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং সংস্কৃতির পশ্চিমীকরণ সৃষ্টি করতে পারে। অধিকসংখ্যায় বিদেশভ্রমণ এবং ভ্রমণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অভিবাসন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেআইনি অভিবাসনও বৃদ্ধি পেতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পশ্চিমী খাবার, যেমন পিজা, চীনা চাওমিন ইত্যাদি এবং পশিচমী পপসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়সমূহ প্রসারিত হলে সেই দেশগুলির অধিবাসীদের চিরকালীন অভ্যাস ও জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদেশী বুলির, বিশেষত ইংরেজীর ব্যবহার ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। ফলে এখন ওই সব দেশের বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবলভাবে সেগুলির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। অনেকে আবার ভালভাবে সেই ভাষা না জেনেই সেগুলি ব্যবহার করে।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে এবং আন্তঃসীমান্ত তথ্যপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কপিরাইট ও পেটেন্ট আইন এখন আন্তর্জাতিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, বৌদ্ধিক সম্পত্তিসংক্রান্ত আইনও একইভাবে কার্যকর হয়। সন্ত্রাসবাদেরও বিশ্বায়ন ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে। গ্যাট অবাধ বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে, শুল্ক কমিয়ে দেয় বা অপসারিত করে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল নির্মাণ করে, যেখানে শুল্ক হয় খুব কম থাকে নতুবা আদৌ তা থাকে না। বিভিন্ন ধরনের অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলগুলি হল—

(১) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone বা SEZ) : এই সব অঞ্চলে কর সংক্রান্ত আইন বা কাস্টম ডিউটি সংক্রান্ত নিয়ম জাতীয় আইনের তুলনায় অনেক বেশি সহজ ও উদার। এর মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েক ধরনের অঞ্চল থাকতে পারে—

(i) স্বাধীন বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Zones বা FTZ) : এইসব অঞ্চলে পণ্য দ্রব্য নামাতে, উৎপাদন করতে বা পুনরায় রপ্তানি করতে কোন বাধা নেই। সংশ্লিষ্ট জাতীয় রাষ্ট্র কোন হস্তপেক্ষ করতে পারে না। এই অঞ্চলগুলি থেকে পণ্যদ্রব্য যখন অন্য অঞ্চলে যায় তখন তা শুল্ক ও কাস্টম ডিউটির অধীন হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলগুলি সাধারণ ভৌগোলিক দিক থেকে সুবিধাজনক স্থান, যেমন নদী বা সমুদ্র তীরস্থ বন্দর বা বিমানবন্দরে কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হল এমন একটি অঞ্চল, যেখানে কিছু দেশ বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধা কমানো বা দূরীকরণের জন্য একত্রিত হয়।

(ii) স্বাধীন অঞ্চল বা মুক্ত সীমান্ত : এগুলি হল ট্রেড ব্লক অঞ্চল, যেখানে বাণিজ্য চুক্তির ভিত্তিতে কিছু রাষ্ট্র শুল্ক বা আমদানি কোটা তুলে দেয়। লোকেরা যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, তখন সেই অঞ্চলকে মুক্ত সীমান্ত বলা হয়—যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

(iii) শিল্প পার্ক বা বৈশিষ্ট্যযুক্ত শিল্প অঞ্চল : জর্ডন বা ইজিপ্টে অবস্থিত শিল্প পার্কগুলি ব্যবসায়ীদের আমেরিকা ও ইস্রায়েলের অবাধ বাণিজ্য চুক্তির সুবিধাগ্রহণকে অনুমোদন করে।

(২) এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (Asia Pacific Economic Cooperation) : এটি হল বিশ্বের সবথেকে সুসংহত বাণিজ্য অঞ্চল। এই অঞ্চলের সমস্ত আমদানি ও রপ্তানির ৫০% থেকে ৬০% আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য এখানে সম্পাদিত হয়।

(৩) ট্যাক্স হাভেন : এটি হল একটি দেশ বা এলাকা, যেখানে নির্দিষ্ট কিছু কর বা শুল্ক কম হারে ধার্য্য করা হয় কিংবা আদৌ ধার্য্য করা হয় না। এর আইনসমূহ কর বা নিয়ম বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার এড়িয়ে চলতে বা তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সব ট্যাক্স হাভেনে অনেক সময় অলস নগদ অর্থের পুঞ্জিভবন ঘটে। এই নগদ অর্থ বিভিন্ন সংস্থার পক্ষে ব্যয়বহুল বা অকার্যকর বলে পরিগণিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এগুলির সঙ্গে জালিয়াতি, অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসবাদের সংযোগ থাকে।

(৪) কালোবাজার ও বহুজাতিক সংস্থাসমূহ : এগুলি বহুজাতিক সংযোগের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং প্রায়শই অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ২০১০ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ড্রাগ ও অপরাধ অফিস (UN Office on Drugs and Crime) জানায় যে আন্তর্জাতিক ড্রাগ ব্যবসা থেকে প্রতিবছর ৩২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব হিসাবে আয় হয় এবং হিরোইন, কোকেন ইত্যাদিতে আসক্ত ৫০ লক্ষ ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চোরাচালান কারবার দেখা যায়। সিন্ধু ঘোটক বা গন্ডারের শিঙ বা বাঘের হাড় বা কনুই বা কৃষ্ণসার হরিণের শিঙ ইত্যাদি নিয়ে শিকারীদের চোরাচালান ব্যবসা চলে।

বিশ্বায়নের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল জাতিরাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস ও অতিজাতিয়তার গুরুত্ব বৃদ্ধি :

বিশ্বায়ন জাতীয় রাষ্ট্রের গুরুত্ব হ্রাস করছে এবং অতিজাতীয় সংস্থাসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি করছে, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জি-৮, আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ইত্যাদি, যেগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তির সহায়ক। জাতি-রাষ্ট্রের ভূমিকা এখন সামান্য হয়ে গেছে। মানবিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির (NGO) গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বপ্রেম বা মানবপ্রীতির বিকাশের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলি গুরুত্ববহ হয়ে পড়েছে। তারা বাণিজ্য মডেলের সঙ্গে মানবপ্রেমকে যুক্ত করছে। ব্যবসার মডেলে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ব মানবপ্রেম ফোরাম (Global Philanthrophy Forum) বা গোষ্ঠীসমূহ মানবপ্রীতির কাজকর্ম পরিচালনা করছে। তবে কোন কোন দেশ আবার বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের নীতি গ্রহণ করে চলেছে। তারা আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা ফোরামসমূহের বেসরকারি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত নয়।

বিশ্বায়ন-বিরোধিতা

অনেক জায়গায় আন্তর্জাতিকতা বিরোধী কিছু কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। অনেক দেশেই বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে, প্রচারমাধ্যমে তাদের বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে, তারা অসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO), ফেসবুক, টুইটার

ইত্যাদির মাধ্যমসমূহের সাহায্য নিচ্ছে এবং বিক্ষোভ সমাবেশ করছে। এ জাতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল সিয়াটলের যুদ্ধ (Battle of Seatle), ১৯৯৯, যা জনগণকে বিশ্বায়নের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সচেতন করে এবং WTO, IMF, G-8 বা বিশ্ব ব্যাংকের অফিসের সামনে বিশ্বায়ন-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তবে এইসব দুর্বল প্রতিবাদ আন্দোলন সত্ত্বেও বিশ্বায়ন এখনও পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

৩.৭ বিশ্বায়ন—সুবিধা ও অসুবিধা

বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ইত্যাদির অভুতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরস্পর-নির্ভরশীল বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলি পণ্যদ্রব্যের গুণগত ও পরিমাণগত মানের অভুতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অপসারিত করেছে এবং বিভিন্ন দেশের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাকে উন্নততর করেছে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে মানের উন্নতি করেছে আর জাতিরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে যুক্ত করেছে। এখন বাণিজ্যসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ ও আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও শিক্ষক-অধ্যাপকগোষ্ঠী বিশ্বজুড়ে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে। বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির আদানপ্রদান ঘটেছে এবং একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে বিবিধের মধ্যে এই মিলন স্বাভাবিকভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে বিশ্বায়নের কিছু সমস্যা ও ত্রুটি অবশ্যই আছে। বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধি করেছে। উন্নত দেশগুলির পক্ষে বিশ্বায়নের প্রভাব অনুকূল ছিল, কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ, যেমন চীনেরও অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সব উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। অনেকেই ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বায়ন অনেক নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেনি। উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষকরা কৃষিশিল্পসমৃদ্ধ সংস্থাসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছে। উন্নত দেশগুলির সস্তায় উৎপন্ন কৃষিপণ্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জড় করা হচ্ছে। পৃথিবী ব্যাপী মানুষের ভ্রমণ, পণ্যদ্রব্যের যাতায়াত বৃদ্ধি, নানারকম যানবাহন ও গাড়ীর চলাচলের গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশগুলি নানাভাবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আর্থিক দিক থেকে শোষণ করে চলেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত কোন কোন প্রকল্প অনেক উন্নয়নশীল দেশের পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে—পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। বিশ্বায়নের পিছনে প্রধান শক্তি হল বহুজাতিক অসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বা MNCগুলি। তারা বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থনীতির বিশেষ কোন দিকে উন্নয়নের জন্য বাধ্য করছে। তারা কর্পোরেট সংস্থা হিসাবে অসম্ভব শক্তি অর্জন করেছে এবং অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদকে হয় শোষণ করছে, নয় ধ্বংস করছে। বিশ্বায়ন জাতীয় সার্বভৌমিকতার ক্ষেত্রে বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের হাত থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে সংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, কারণ এখন সব দেশের সরকারি নীতিসমূহই বিশ্বায়নের অনুকূলে আন্তর্জাতিকভাবে স্থিরীকৃত হয়।

বিশ্বায়নের তাৎক্ষণিক প্রভাব হল উদারীকরণ, যার অর্থ অবাধ বাণিজ্য। উদারীকরণ অবাধ বাণিজ্যের ওপর যাবতীয় বিধিনিষেধের অপসারণের প্রস্তাব করে। এর ফলে আসে বেসরকারিকরণ, যার সমর্থক হল সরকারি সংস্থাগুলির মালিকানা বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরকরণ, যা হল IMF দ্বারা নির্দেশিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির অনিবার্য ফল। বিশ্বায়ন অনেক সময় অস্থায়িত্ব নিয়ে আসে। বিশ্বায়ন দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ববাজার হল যুক্তিবর্জিত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা যে কোন সময়ে মুদ্রার বিনিময় হার, সুদের হার, বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অস্থায়িত্ব এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক অংশের জনগণের দুর্বলতা ও অসহায়তা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বায়নকে তাই অনেকে দরিদ্রদের স্বার্থবিরোধী ব্যবস্থা বলে মনে করেন। বিশ্বায়নের প্রথম পর্বে ১৯৮৭-৮৯ সালের মধ্যে আফ্রিকার সাবসাহারা অঞ্চলে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে দরিদ্র ব্যক্তিদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে আমেরিকা ও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সম্পদ ও পুঁজির বহুগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের মাধ্যমে ধনী দেশগুলি আরও ধনী এবং দরিদ্র দেশগুলি আরও দরিদ্র হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিকে বিশ্বায়নের আওতায় এনে উন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করছে আর চোখধাঁধানো প্রচারের ফাঁদে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি অসহায়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দেশগুলির ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পগুলি আগে উন্নত ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের বাজারে টিকে থাকতে না পেরে তারা হারিয়ে যাচ্ছে আর উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিশ্বায়নের ফলে শুধু বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পদবৈষম্য যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, অপরাধ প্রবণতাও বেড়ে গেছে। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন, অপরাধমূলক কাজে যোগদান, মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য নেশার ব্যবহার বৃদ্ধি, বেআইনি দ্রব্য পাচার, জাল নোট ছাপানো, আন্তঃসীমান্ত চোরাচালান ইত্যাদিও এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশ করছে। তা ছাড়াও সন্ত্রাসমূলক কাজের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সন্ত্রাসবাদ এখন কোন দেশের সীমানায় বন্দী নয়। সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে গেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ অনেক সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে।

বিশ্বায়ন শব্দটির অর্থ ব্যাপক ব্যঞ্জনযুক্ত। কিন্তু অনেকে বিশ্বায়নের বদলে আন্তর্জাতিকীকরণ শব্দটি পছন্দ করেন, কারণ আন্তর্জাতিকীকরণ শব্দটির মধ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও জাতির গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয় না, কিন্তু বিশ্বায়ন শব্দটি রাষ্ট্র ও জাতি উভয়কেই অপসারিত করে। আজকের বিশ্বে যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, তাঁদের মতে, রাষ্ট্র এখনও অদৃশ্য হয়নি। অনেকে আবার বিশ্বায়নকে প্রকৃত ঘটনার বদলে বিশ্লেষণের জন্য সৃষ্ট অতিকথা বলে গণ্য করেন।

তবে তর্কের খাতিরে যাই বলা যাক না কেন, আমাদের মানতেই হবে যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিশ্বের বাণিজ্যের ধরন এবং সেই সঙ্গে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বায়ন আজকের যুগের অপরিহার্য ও অপ্রতিরোধ্য। বিশ্বায়ন শুধু আজকের রীতি নয়, ভবিষ্যতেরও প্রবণতা।

৩.৮ বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন

বিশ্বায়নের ফলে সরকার, রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসন, জনপ্রশাসন, সুশীল সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্ক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। পরিচালনা সংক্রান্ত দর্শন, প্রশাসনিক বিষয়, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক পুরনো ও সনাতন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। প্রশাসনের সনাতন

কাঠামোগত রূপ ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বলা যায় যে আধুনিককালের নতুন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় প্রচলিত শিল্পসমাজের দ্রুত পতনের সময় থেকে আর এই নতুন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বিশ্বের অনেক দেশই প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে চলেছে। কয়েকটি দেশের অগ্রগতি ও বৃদ্ধি ঘটেছে দ্রুতগতিতে, কিন্তু অধিকাংশ দেশই বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রামে রত থাকছে। বিশ্বব্যাপী সংগঠিত এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সমস্ত সমাজ, জনগণ সরকার, জনপ্রশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে।

পরিবর্তন যে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সকলেই তা মানেন। কিন্তু বিশৃঙ্খলাযুক্ত পরিবর্তন কখনোই কাম্য নয়। তাছাড়াও সমাজ, সরকার ও মানবতার পক্ষে পরিমাণগত পরিবর্তনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু গুণগত পরিবর্তন মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বা বহুকাল ধরে প্রচলিত বৈশিষ্ট্যসমূহের নবরূপ নিয়ে আসে। বর্তমান বিশ্বে বিশ্বায়নের নামে ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন ঘটছে—ফলে জাতীয় সমাজ ও সম্প্রদায় এবং বিশ্ব নবরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

বিশ্বায়ন কিছু পরিমাণে আন্তঃরাষ্ট্র পারস্পরিক-নির্ভরশীলতার সৃষ্টি করে, যা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সহজ সরল ব্যাপার নয়। অতীতে জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণ বলতে তাই বোঝাতো। এখন বিশ্বায়ন বলতে জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সীমারেখা পার হয়ে উৎপাদনের একত্রীভবন ও বহুজাতিক সংস্থাসমূহ দ্বারা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে বোঝায়। গত একশ' বছর ধরে উৎপাদন জাতীয় সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তা আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে, যেখানে একডজন বা তার বেশি জাতিরাষ্ট্র থেকে বহুসংখ্যক সরবরাহকারী কোম্পানি আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের সমাবেশ করে উৎপাদন চালায়। সরবরাহকারী সংস্থাসমূহের জটিল ও ব্যাপক নেটওয়ার্ক হল বিশ্বায়নের অন্যতম দিক। বিশ্বায়ন শুধু উৎপাদন ও যোগানের সম্পর্কের পরিবর্তন নয়, বিশ্বায়ন সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবার বণ্টন ও বিক্রয়কেও প্রভাবিত করে—যেগুলি স্থানীয় বাজারের প্রয়োজন পূর্ণ করে, সেগুলিকেও। স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় অনেক পণ্যদ্রব্যই প্রধানত বহুজাতিক সংস্থাগুলি থেকে আসে। বিশ্বায়ন হল মূলধনের ব্যাপক ও নজিরবিহীন চলাচল বা প্রবাহ। এই প্রবাহ আবার কিছু নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির সঙ্গে এবং স্বাধীন বাজার মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত।

বিশ্বায়নের প্রচণ্ড রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। বিশ্বায়ন বেকারত্বের সমস্যা, মজুরী ও আয়সংক্রান্ত অসাম্য ইত্যাদি সৃষ্টি করে এবং শুধুমাত্র জাতীয় ভিত্তির ওপর অর্থনৈতিক নীতি ও কর্পোরেট আচরণের মোকাবিলাকে অসম্ভব করে তোলে। বিশ্বায়ন উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণও অনেকটা হ্রাস করে। গত কয়েক বছরে শিল্পপ্রধান দেশগুলির সাধারণ আয়যুক্ত লোকদের তুলনায় উচ্চ আয়যুক্ত ব্যক্তিদের প্রচুর উন্নতি হয়েছে আর অনেক বেশি সংখ্যক পরিবার নিরাপত্তাহীন স্বল্প বেতনযুক্ত পেশার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্বায়নের সামনে চ্যালেঞ্জ হল সমাজকাঠামোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিবর্তনকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি জনগণের ইচ্ছাধীন হয়, মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষিত হয় এবং যতবেশি সম্ভব তত বেশি সংখ্যক লোকের সমৃদ্ধি ঘটতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজ হল আন্তর্জাতিক স্তরে নীতিকে প্রভাবিত করা, সরকার এবং বিভিন্ন উদ্যোগকর্তাদের বিশ্বায়ন দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাসমূহের জন্য দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং বাস্তব ও কার্যকর ঐক্য স্থাপন করা।

বিশ্বায়নের নিজস্ব প্রকৃতি এবং দেশের মধ্যে শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থার অস্তিত্বের জন্য উন্নত দেশসমূহ (পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ) অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা অনেক পরিমাণে উপকৃত হয়েছে। অন্যদিকে উন্নয়নহীল দেশগুলির অনেক কম সুবিধা হয়েছে, কারণ আন্তর্জাতিক বাজার এলাকায় তাদের অসুবিধাজনক অবস্থান এবং দুর্বল জনপ্রশাসন ব্যবস্থা। বিশ্বায়নের প্রকৃতি এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার অবস্থান হল জনপ্রশাসনের আওতার বাইরে।

বিশ্বায়ন প্রধানত ধনতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতি দ্বারা সৃষ্ট, জনপ্রশাসন, রাজনীতি বা গণতন্ত্র দ্বারা নয়। যখন জাতীয় ধনতন্ত্র আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রে উন্নীত হয়, তখন ধনতন্ত্র ও বাজারের নীতিসমূহ গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের ওপর আধিপত্য করতে থাকে। ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধির জন্য সুস্থির পরিবেশ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজন। বাজারের ব্যর্থতার ওপর উপযুক্ত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজার চলতে পারে না। বাজারের ব্যর্থতা ঘটলে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দক্ষ ক্রিয়াকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক বাজার এলাকায় অন্যায্য বাণিজ্য, অসমীচীন মূল্য, অসাধু নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক প্রবাহের সুনিপুণ ব্যবহার দেখা যায়। কিছু কিছু এশীয় দেশ (সাউথ কোরিয়া থেকে তাইওয়ান) ১৯৯০-এর দশকে আর্থিক ব্যাপারে বৃহৎ আন্তর্জাতিক এজেন্টদের কাছ থেকে অনিয়ন্ত্রিত আর্থিক ও নগদ প্রবাহের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ কর্মচারিরা কর্মচ্যুত হয়েছিল এবং সামাজিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সমাধানে দেশগুলি কার্যকর কিছু করে উঠতে পারেনি, কারণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ জনপ্রশাসনের আওতার বাইরে অবস্থান করে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর-নির্ভরশীলতার প্রয়োজন। জাতীয় সীমারেখার মধ্যে সাম্প্রতিককালের অনেক বিষয়, যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ, নদীর জলের ব্যবহার, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা ইত্যাদির সমাধান করা যায় না। এগুলি সার্বজনীন এবং সমগ্র বিশ্বে এক ধরনের সাধারণ উৎস থেকে এদের উদ্ভব ঘটে।

সুদৃঢ় ও শক্তিশালী জনপ্রশাসন ব্যবস্থা বিশ্বায়ন থেকে যেকোন দেশকে অন্যান্য দেশসমূহ থেকে অনেক বেশি সুবিধা পেতে সাহায্য করে; আর বহুত্ববাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা জনপ্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকাকে সাধারণত খর্ব করে থাকে। পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনেক দেশ বাজেট, কর্মীবিভাগ ও সমগ্র সংগঠন সমেত বহু এলাকাকে বেসরকারিকরণ, আউটসোর্সিং, বিনিয়ন্ত্রণ, সরকারি পরিষেবা ও কাজের পুনর্গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে আরো কার্যকর করেছে। তারা অনেক বেশি দক্ষতা, কার্যকারিতা, উৎপাদনশীলতা, সংবেদনশীলতা ও স্বচ্ছতা অর্জন করেছে। এই বিষয়গুলি ওই সব দেশগুলিকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক লেনদেন ও বাণিজ্য ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। ফলে বহুজাতিক বা অতিজাতিক কর্পোরেশন বা বিশ্বব্যাপী পরিব্যপ্ত বেসরকারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে।

দুর্বল প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বায়ন থেকে অন্যদের তুলনায় অনেক কম সুবিধা ভোগ করে থাকে কিনা তার হল বিতর্কের বিষয়; তবে কারণ ওই সব দেশের জনপ্রশাসন, শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসন নির্ধারিত ও প্রভাবিত হয় দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো ও আচরণ, অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সস্তার ত্রুটিপূর্ণ প্রযুক্তি, দুর্বল পরিকাঠামো এবং কম শিক্ষা দ্বারা। দরিদ্র দেশগুলি তাদের সম্পদের স্বল্পতা, দক্ষ কর্মীবৃন্দের অভাব, প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, তথ্যের স্বল্পতা ইত্যাদির জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

তাছাড়াও দরিদ্র দেশগুলি সাধারণভাবে সম্পদশালী দেশগুলির প্রভাবাধীন। আর সম্পদশালী দেশগুলি তাদের জাতীয় ও কর্পোরেট স্বার্থ পূরণের জন্য অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে শোষণ করে থাকে।

উন্নত ও অনুন্নত সব দেশই জনপ্রশাসন ও সরকারি আমলাতন্ত্রকে দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য বেসরকারিকরণ, সরকারি কাজের বিনিয়ন্ত্রণ ও সংকোচন, তথ্যপ্রযুক্তির সংহতিকরণ ইত্যাদির প্রচেষ্টা করছে।

৩.৯ জনপ্রশাসনে পরিবর্তন

বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণ বর্তমানে ক্রমবর্ধিত হারে রাষ্ট্রের চরিত্র ও জনপ্রশাসনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সেই সব পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ হল জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। পণ্ডিত ও পেশাদারী ব্যক্তিরা এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কয়েকটি কৌশলের কথা বলেন—

(১) পাবলিক সার্ভিস সংস্কার : পাবলিক সার্ভিস সংস্কারের অন্যতম একটি কারণ হল ১৯৮০ সালে ইংলন্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে এবং ১৯৯০ সালে ভারতে অবাধ বাণিজ্য অর্থনীতির প্রবর্তন। নব অর্থনৈতিক নীতি, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি, বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি হল পাবলিক সার্ভিস সংস্কারের বিভিন্ন নাম। সরকার এবং সরকারি বাণিজ্যের বাজার সংস্কার নীতির ফলগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে নানা নামে অভিহিত করা হয়—নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থা, বাজার পরিচালিত সরকার, নব সরকারি পরিচালনা, ক্ষমতা বিভাজন, রাষ্ট্রকে হালকাতর করা, রাষ্ট্রের ক্ষমতার সংকোচন ইত্যাদি। সরকারের ধারণা, সরকারের গঠন, শাসনের পদ্ধতির ওপর অবাধ বাণিজ্য অর্থনীতির এইসব প্রভাব হল বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আলোচনা ও বিতর্কের সাম্প্রতিক ধারা ও এজেন্ডা।

(২) সরকারের পুনঃসৃজন : জনপ্রশাসনের পুনঃসৃজন বা পুনর্নির্মাণ দ্বারা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার উপযোগী করার ক্ষেত্রে নব জনপ্রশাসন বা নতুন সরকারি পরিচালনার ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবযুক্ত। উন্নত বা অনুন্নত দেশগুলির নীতিসমূহ ক্রমাগত নব জনপ্রশাসন ও সরকারের পুনঃসৃজন বা পুনর্নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সেই ব্যবস্থাগুলি হল বেসরকারিকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ, বাজার প্রক্রিয়া, বিকেন্দ্রীকরণ ও বেআমলাতান্ত্রিকীকরণ। এখন বলা হয় যে সরকারি ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসাসংক্রান্ত নীতিসমূহকে প্রবর্তন করতে এবং কার্যকরভাবে যেগুলি মেনে চলতে হবে। নতুন বা নব জনপ্রশাসন ও সরকারের পুনর্নির্মাণ নীতির বিধান অনুসারে সরকার শুধু যে ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশাসনের কৌশলগুলি গ্রহণ করবে, তাই নয়, ব্যবসায়িক কারবারের মূল্যবোধকেও অর্জন করবে—হস্তচালিত নৌকাচালনার বদলে যন্ত্রচালিত নৌকাচালনার শক্তি অর্জন করবে এবং পরিষেবার বদলে ক্ষমতায়নের নীতি গ্রহণ করবে; আর উপভোক্তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা, বাজারের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানো, পণ্যবণ্টন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করবে। নব জনপ্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হল পরিচালনা, কাজের মূল্যায়ন ও দক্ষতা। নব জনপ্রশাসন সরকারি আমলাতন্ত্রকে কয়েকটি এজেন্সিতে রূপান্তরিত করে, যারা প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, বাজারের ওপর নির্ভর করে এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে। এই পরিচালনার ধরন হল সামগ্রিকভাবে খরচ কমানো, সরকারি ব্যয়ের সংকোচন এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিকভাবে অনুপ্রেরণা প্রদান।

(৩) উদ্যোক্তা হিসাবে সরকার : সরকারি অফিস বলতে সাধারণত ধুলিমলিন, নোংরা, কাগজপত্র-ভরা জায়গাকে বোঝায়, যেখানে বাবুরা সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন। ক্রমস্তরবিন্যস্ত কাঠামো, জটিল পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের পরীক্ষা নিরীক্ষার দীর্ঘসূত্রী ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষ সরকারি কর্মচারীদের শোষক হিসাবে দেখতেন, সহায়ক বন্ধু হিসাবে নয়। এখন প্রশাসনিক অস্থিরতা ও সমস্যাসমূহ মোকাবিলার উপায় হল উদ্যোক্তা হিসাবে সরকারের ভূমিকা। সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নের চাপের ফলে উদ্যোক্তা হিসাবে সরকারের দুটি বৈশিষ্ট্য—দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারি ক্ষেত্রের সংস্থাসমূহ এখন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতার উন্নতির জন্য বিশ্বব্যাপী চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। তাই সরকারি আমলাতন্ত্র বর্তমানে অপচয় কমানো, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো এবং দ্রব্য ও পরিষেবার উন্নততর বন্টন ব্যবস্থার চেষ্টা করছে।

(৪) আমলাতন্ত্রের পরিবর্তনশীল ভূমিকা : মূল ধারণাগত ব্যাখ্যা হিসাবে অর্থনৈতিক উদারীকরণ প্রক্রিয়া অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপের সংকোচনের কথা বলে। ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি আমলাতন্ত্রের ভূমিকার অবনয়ন ঘটে। তবে এটা জানা প্রয়োজন যে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের ফলে আমলাতন্ত্র অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে—সে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ক, গতিবৃদ্ধিকারী ও মান-বৃদ্ধিকারীর ভূমিকা পালন করে।

(৫) শাসন প্রক্রিয়া : শাসন-প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় সরকারের নীতি পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন ও নীতি প্রয়োগের সামর্থ্যকে। সুশাসনের অর্থ হল দক্ষ জনপ্রশাসন, যা হল কার্যকর ও জনমুখী প্রশাসনিক কৌশল দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ব্রীজ নির্মাণ প্রক্রিয়া। সুশাসনের ধারণাটি ১৯৮৯ সাল থেকে দেখা দেয় এবং সাব-সাহরান আফ্রিকা সংক্রান্ত বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়। এই প্রতিবেদন অনুসারে সুশাসন হল দক্ষ শাসন ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য বিচারব্যবস্থা এবং জনগণের কাছে দায়িত্বশীল প্রশাসন। সুশাসন হল উদ্দেশ্যমূলক, উন্নয়নমুখী এবং জনগণের জীবনের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এর জন্য প্রয়োজন হল উচ্চস্তরের সংগঠনগত দক্ষতা ও কার্যকারিতা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্তি। সুশাসন হল নাগরিকদের প্রতি যত্নবান, নাগরিক-সহায়ক এবং নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রশাসন ব্যবস্থার প্রয়োগ।

(৬) ই-শাসন : ই-শাসন হল সরকারি কাজে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রয়োগ, যা সরল, নীতিভিত্তিক, দায়িত্বশীল, সহানুভূতিমূলক ও স্বচ্ছ সরকার সুনিশ্চিত করে। ই-শাসনের গতি ও স্বচ্ছতার জন্য জনপ্রশাসন জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দক্ষ গণভিত্তিক প্রশাসনে পরিণত হয়।

(৭) রাষ্ট্রের পুনরাগমন : বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় সার্বজনীনভাবে উদারীকরণের প্রসারকে আর উদারীকরণ হল প্রধানত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া—অর্থনীতিকে বাজারের শক্তিসমূহ দ্বারা পরিচালিত করা, রাষ্ট্রের দ্বারা রচিত নিয়ম ও আইনের ভিত্তিতে নয়। বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্র অর্থনীতির বিভিন্ন এলাকা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত বা প্রত্যাহার করে বা সরিয়ে নেয় বা পশ্চাদপসরণ করে। একটি উদারীকৃত রাষ্ট্র যেসব মূল এলাকাগুলির প্রতি মনঃসংযোগ করে, সেগুলি হল প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র বা বৈদেশিক দপ্তর ইত্যাদি। বাকি সব এলাকাগুলিকে (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) রাষ্ট্র বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে ছেড়ে দেয়। যখনই রাষ্ট্র এগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, তখন উন্নত দেশগুলিতে বেসরকারি উদ্যোগ বা অরাষ্ট্রীয় কারক, যেমন স্বেচ্ছামূলক

সংস্থাসমূহ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন ইত্যাদি রাষ্ট্রের শূন্যস্থান পূর্ণ করে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাষ্ট্র বনাম বাজার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা যাতে বুর্জোয়া-সামন্ততান্ত্রিক- আমলাতন্ত্রের সংযোগ থেকে জনগণের জন্য প্রকৃত গণতন্ত্রে পৌঁছানো যায়। উন্নত বাজারভিত্তিক রাষ্ট্রগুলিতে বাজার অর্থনীতির প্রবর্তন স্বাভাবিকভাবে ধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে সম্পূর্ণ আলাদা উন্নয়ন মডেলের প্রয়োজন—এমন একটি মডেল বা জনগণের সাধারণ কল্যাণ সুনিশ্চিত করে, যা ধনতান্ত্রিক শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত। বিশ্বব্যাঙ্ক স্পন্সরকৃত "রাষ্ট্রের পুনর্বিবেচনা" ("Rethinking the state") মডেল এখন জনপ্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের যৎসামান্য ভূমিকা এবং অবাধ বাণিজ্য নীতি তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে বিপজ্জনক; সেখানে সরকারের কাজ হল সামাজিক প্রচেষ্টাসমূহকে সমন্বিত করে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, রুগ্ন স্বাস্থ্য এবং সামন্ততান্ত্রিক- ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ফলে তৃতীয় বিশ্বের বাস্তব প্রয়োজন হল সম্প্রসারিত এজেন্ডা বা কর্মসূচিসহ শক্তিশালী রাষ্ট্র। রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণমূলক কাজগুলি থেকেও বঞ্চিত হবে না। রাষ্ট্র অর্থনীতির অপ্রয়োজনীয় এলাকাগুলি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারে, কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের লক্ষণীয় উপস্থিতি থাকবে।

(৮) নাগরিকদের ক্ষমতায়ন : বিশ্বায়নের ফলে তৃণমূল স্তরের নাগরিকদের উত্থান ঘটেছে—নারীদের ক্ষমতায়ন, সকলের জন্য শিক্ষা, মানবিক অধিকার, উপভোক্তা অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। জনপ্রশাসনকে ঘিরে সাম্প্রতিককালের সংস্কার প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম অংশ হল নাগরিকদের ক্ষমতায়ন।

৩.১০ উপসংহার

গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্বায়ন প্রচেষ্টার আধিপত্য দেখা যাচ্ছে। এই প্রবণতা বাজার-অর্থনীতির ওপর নির্ভরতা, ব্যক্তিগত মূলধন ও সম্পদের ওপর বিশ্বাস এবং কাঠামোগত সমন্বয় প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা বৃদ্ধি করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্বায়ন নতুন ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উন্নত দেশগুলির বাজারের উন্মুক্তকরণ এবং প্রযুক্তির হস্তান্তরকরণ তাদেরকে উন্নততর জীবনযাত্রা ও উন্নততর উৎপাদনশীলতা সুনিশ্চিত করেছে। তবে বিশ্বায়ন কিছু নতুন চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে, যেমন একদিকে দেশের মধ্যে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি, আর্থিক বাজারের অনিশ্চয়তা, পরিবেশ দূষণের সমস্যা ইত্যাদি। বিশ্বায়নের আর একটি অসুবিধা হল যে অনেক উন্নয়নশীল দেশই এই প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে গেছে। তবে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের তাৎপর্য খুব বেশি। এর ফলে বিশ্ববাজারের বিভিন্ন জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে একদিকে প্রতিযোগিতা এবং অন্যদিকে পরস্পর-নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত বাণিজ্য এবং মূলধনের গতিবিধির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর শুধুমাত্র দেশীয় বা জাতীয় নীতি ও বাজার দ্বারা নির্ধারিত হয় না; এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা উভয়ের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ যে কোন বিশ্বায়িত অর্থনীতি তার নিজের আভ্যন্তরীণ নীতি স্থির করার সময় বিশ্বের অন্যান্য অংশের নীতিসমূহের সম্ভাব্য ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করতে পারে না। ফলে জাতীয় স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নীতিগত স্বাতন্ত্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

বিশ্ব এখন অনেকাংশে জাতীয় সীমানাবিহীন হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমহ্রাসমান। আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগমূলক সংস্থাগুলির ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শক্তিশালী নানা প্রযুক্তি, যেমন কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল, টেলিকম ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়াই রাষ্ট্র ও ব্যক্তিসমূহের নিজেদের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ সম্ভব করেছে। বর্তমানে দ্রুতগতিতে আন্তঃসীমান্ত একীকরণ দেখা যাচ্ছে, বিশেষত অর্থনৈতিক ও ব্যবসা ক্ষেত্রে। তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নতি সমগ্র বিশ্বকে পরস্পর-সংযুক্ত করেছে এবং পণ্য ও পরিষেবার বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতের উদ্ভব ঘটিয়েছে। বিশ্বায়ন স্থানীয় পরিচয় ও স্থানীয় যোগাযোগকে দুর্বল করে বিশ্ব সমাজ ও বিশ্ব সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটিয়েছে। জনপ্রশাসন, এখন নাগরিক অধিকার, নৈতিক মূল্যবোধ, দায়িত্ব, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিকে গুরুত্ব প্রদান করছে এবং প্রশাসনিক বিশ্লেষণের কাঠামো হিসাবে সুশাসন, ই-শাসন ও কর্পোরেট শাসনকে গুরুত্ব দিচ্ছে। রাষ্ট্রের ভূমিকা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ইত্যাদি এখন কমে যাচ্ছে, আর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বিকেন্দ্রিকতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়সমূহকে। বিশ্বায়ন থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠনের সমস্যাগুলির প্রতি জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞদের নজর দিতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাধ্য করছে।

৩.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) বিশ্বায়নের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত দিকে যেসব পরিবর্তন ঘটছে, সেগুলি পর্যালোচনা করুন।

(২) বিশ্বায়নের ইতিহাস আলোচনা করুন।

(৩) ইউরোপ ও আমেরিকা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করুন।

(৪) বিশ্বায়নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) বিশ্বায়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

(২) বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করুন।

(৩) বিশ্বায়নের সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করার জন্য জনপ্রশাসন দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন কৌশলগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝানো হয়?

(২) বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক দিকে কী পরিবর্তন ঘটে?

(৩) বিশ্বায়নের রাজনৈতিক প্রভাব কী?

(৪) বিশ্বায়নের ফলে কী সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে?

(৫) বিশ্বায়নের প্রযুক্তিগত প্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করুন।

(৬) বিভিন্ন অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করুন।

(৭) বিশ্বায়ন বিরোধিতা বলতে কী বোঝানো হয়?

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

Aseem Prakash and Jeffery A. Hart (ed.)—*Globalisation and Governance*, Routledge, London, 1999.

Box, Richard (et.al.)—"New Poulic Management and Substantive Democracy", *Public Administration Review*, (61) (5) pp 606-619.

Kette, D. F.—"The Transformation of Governance, Devolution and the Role of Government", *Public Administration Review* 60 (6) pp 488-497.

একক-৪ ❑ উদারিকরণের যুগে ভারতীয় প্রশাসন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ উদারনীতিবাদ একটি পরিবর্তনশীল দর্শন

৪.৪ ভারতীয় অর্থনীতি—সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন—প্রথম পর্যায়

৪.৫ ভারতীয় অর্থনীতি—উদারনীতিবাদী বা উদারিকরণ প্রবণতা—দ্বিতীয় অধ্যায়

৪.৬ উদারনীতিকরণের নতুন অর্থনৈতিক নীতি এবং এই সংক্রান্ত কিছু আইন

৪.৭ ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারিকরণের প্রভাব

৪.৮ উদারিকরণের অসুবিধাসমূহ

৪.৯ উদারিকরণের সুবিধাসমূহ

৪.১০ উপসংহার

৪.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি আপনাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং আপনি সেগুলিকে আপনার গবেষণা বা উচ্চতর একাডেমিক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন :

- উদারনীতিবাদের ধারণা এবং উদারনীতিবাদের পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিত।
- স্বাধীন ভারতে সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের প্রবর্তন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্যালান্স অফ পেমেন্ট সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য উদারীকরণের পথে ভারত সরকারের যাত্রা (প্রথমে ১৯৬৬ এবং পরে ১৮৮৫ সালে), অবশ্য মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমসহ।
- ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত নতুন অর্থনৈতিক নীতি (১৯৯১)-এর উদ্দেশ্যসমূহ এবং সেজন্য কিছু আইন গ্রহণ।
- ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে উদারীকরণ নীতির কিছু সুবিধা ও অসুবিধা।

৪.২ ভূমিকা

উদারিকরণ হল বিশ্বায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি প্রক্রিয়া, যা আবার বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণ—এই তিনটি পরস্পর সংযুক্ত প্রক্রিয়া আধুনিক জীবনের সব স্তরকে স্পর্শ এবং প্রভাবিত করে। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি, রাজনীতি, সরকার, প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক বিষয় এবং সামাজিক দিকসমূহ এই প্রক্রিয়াত্রয়ের আওতাধীন। এই তিনটি প্রক্রিয়া সব ধরনের সরকারের নীতি ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। উদারিকরণের যুগে ভারতীয় প্রশাসনের আলোচনা শুরু করার আগে এই তিনটি প্রক্রিয়ার অর্থ পরিষ্কারভাবে জানা প্রয়োজন।

বিশ্বায়ন হল বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কসমূহের তীব্র প্রকাশ, যা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহকে এমনভাবে সংযুক্ত করে যাতে বহু মাইল দূরে সংগঠিত ঘটনাসমূহ দ্বারা স্থানীয় এলাকার যাবতীয় ঘটনাবলি প্রভাবিত হয়। অতীতে ঘটা যাবতীয় আদান-প্রদানের থেকে অনেক বেশি ব্যাপকভাবে এবং ব্যাপকতর স্তরে আদানপ্রদান ঘটে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বিশ্বায়ন শব্দটি আন্তর্জাতিক শব্দটি থেকে স্বতন্ত্র একটি ধারণা প্রকাশ করে। বিশ্বায়ন জাতীয় সীমানার গুরুত্ব হ্রাস করে। বিশ্বায়নের জন্যই মানুষ, পণ্যদ্রব্য, পরিষেবা, অর্থ, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, ধারণাসমূহ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান এমনকি মহামারী, সন্ত্রাসবাদ ও পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি অবাধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে।

উদারিকরণ, যা সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্য হিসাবে অর্থনীতির জগতে পরিচিত তার অর্থ হল বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমস্ত রকম বাণিজ্যসংক্রান্ত বাধা ও নিয়ন্ত্রণের অপসারণ। রাজনৈতিক জগতে উদারিকরণ বলতে বোঝায় পৌর স্বাধীনতা, সীমাবদ্ধ সরকার এবং গণতান্ত্রিক ও সাম্যভিত্তিক সমাজের অস্তিত্বকে। এই উদারিকৃত সমাজের সমস্ত ব্যক্তি তাদের গুণগত ক্ষমতাসমূহকে বাস্তবায়িত করার সম সুযোগ ভোগ করে এবং সেখানে লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

বেসরকারিকরণ হল আজকের সমাজের বৈশিষ্ট্য, যার বক্তব্য হল সরকারি ক্ষেত্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণকে বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরকরণ।

৪.৩ উদারনীতিবাদ একটি পরিবর্তনশীল দর্শন

বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণ—তিনটি প্রক্রিয়াই উদারনীতিবাদী দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত, যা প্রধানত ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিগত অধিকারের দর্শন হিসাবে পরিচিত এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানযুক্ত। তবে উদারনীতিবাদী দর্শন বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের উদ্ভব ঘটে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে। ষোড়শ শতকে বিশ্ব সম্বন্ধে উদারনীতিবাদী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় পরিবেশ ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতা দেখা যায়। সপ্তদশ শতকে উদারনীতিবাদ একটি রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক তত্ত্ব হিসাবে লক দ্বারা বিকশিত হয়। লককে তাই উদারনীতিবাদের

প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৬৮৮ সালের ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব উদারনীতিবাদের ভিত্তি স্থাপন করে। এই সময় রাজার ক্ষমতার সীমাবদ্ধকরণ, রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার ঘোষণা, অধিকারের বিল প্রণয়ন এবং শাসিতদের সম্মতির ভিত্তিতে সরকার গঠন নীতি স্বীকৃত হয়। ১৭৭৭ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (Declaration of Independence) দ্বারা আমেরিকা একটি প্রজাতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার সরকার বংশানুক্রমিক কোন রাজপদ বা অভিজাততন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়নি, বরং সমস্ত মানুষের সাম্যনীতিকে গুরুত্ব দেয়। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে হঠিয়ে দিয়ে 'স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বে'র শ্লোগানের জন্ম দেয় এবং পুরুষদের জন্য সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্সের সংবিধানের মানুষ ও নাগরিকদের অধিকারের ঘোষণা পরবর্তীকালে অনেক শক্তিশালী বৈপ্লবিক আন্দোলনকে প্রেরণা দান করে আর বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অভিজাততান্ত্রিক প্রাচীন শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাচ্যুত হয়। এইভাবে উদারনীতিবাদ বৈপ্লবিক রাজনৈতিক তত্ত্বের মর্যাদা লাভ করে।

ধ্রুপদী বা সাবেকি উদারনীতিবাদ বাক্ স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, অবাধ বাণিজ্য ও অবাধ বাজার নীতি, সীমাবদ্ধ সরকার, ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ইত্যাদির ওপর জোর দেয়। এই সাবেকি উদারনীতিবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও নেতিবাচক রাষ্ট্রের ধারণার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের বদলে দেখা দেয় সামাজিক উদারনীতিবাদ, যাকে উদারনীতিবাদের নব আকারে প্রকাশ বলা যায়। এই নতুন উদারনীতিবাদ রাষ্ট্র সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণার বদলে ইতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়, কারণ ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে এই সময় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা যায়, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ফলে রাষ্ট্র দ্বারা সুনিশ্চিত অনুকূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন চাহিদার সৃষ্টি হয়। তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নির্দেশিত সংস্কারমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। তখন বোঝা যায় যে বাজার অর্থনীতির ওপর নির্ভরতা অধিকাংশ জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত ন্যূনতম প্রয়োজনকে উপেক্ষার কারণ হতে পারে। ফলে সব কিছুই সরকারি নীতি দ্বারা নির্দেশিত হতে থাকে। এই সময়ের উদারনীতিবাদের অন্যতম প্রবক্তা গ্রীণ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণার ওপর জোর দেন, যে রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে তার কাজের পরিধি বিস্তৃত করে—যে রাষ্ট্র সাবেকি উদারনীতিবাদের প্রবক্তাদের দ্বারা ঘোষিত নেতিবাচক রাষ্ট্র নয়। কিন্স বলেন যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণ করবে।

উভয় ধরনের উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়—সাবেকি উদারনীতিবাদ সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আর নতুন সামাজিক উদারনীতিবাদ ধনতন্ত্রের ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে। উভয়েই ব্যক্তির উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু প্রথমটি নেতিবাচক আর দ্বিতীয়টি ইতিবাচক রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অবস্থার আবার পরিবর্তন ঘটে, কারণ দেখা যায় যে সরকার জনগণের আশাআকাঙ্খা রূপায়নে ব্যর্থ হয়েছে; সরকারের আর্থিক স্বল্পতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বিকশিত হয় নয়া উদারনীতিবাদ, যাকে প্রধানত ধ্রুপদী বা সাবেকি উদারনীতিবাদের পুনরুত্থান বলা যায়। নয়া

উদারনীতিবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকলাপ, মুক্ত অর্থনীতি, অবাধ বাণিজ্য ইত্যাদির ওপর জোর দেয়। এফ. এ. হায়েক, জন রলস্, রবার্ট নজিক ইত্যাদিরা হলেন নয়া উদারনীতিবাদের কয়েকজন প্রবক্তা।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে উদারনীতিবাদের বিবর্তন ঘটেছে তিনটি স্তরের মাধ্যমে—

(i) ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ (ষোড়শ ও সপ্তদশ থেকে)

(ii) সামাজিক বা নতুন বা নব উদারনীতিবাদ (ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে)

(iii) নয়া উদারনীতিবাদ বা ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের পুনরুত্থান (১৯৬০—৭০ সাল থেকে)

১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার সামাজিক উদারনীতিবাদ নীতি গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্র-নির্দেশিত সমাজকল্যাণমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে উন্নয়ন ও বিকাশের পথে তার যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১৯৯১ সালে ভারত সরকার নয়া উদারনীতিবাদের দিকে ঝোঁকে এবং মুক্ত অর্থনীতি, রাষ্ট্র দ্বারা সমাজের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, অবাধ বাণিজ্য ইত্যাদি সমর্থন করে এবং বিশ্বায়ন ও বেসরকারিকরণের পথ পছন্দ করে।

৪.৪ ভারতীয় অর্থনীতি—সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন—প্রথম পর্যায়

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতিসমূহ একদিকে ভারতের ঔপনিবেশিক অতীত, যা প্রধানত শোষণমূলক প্রকৃতিযুক্ত ছিল এবং অন্যদিকে কিছু ভারতীয় নেতাদের দ্বারা স্বীকৃত তৎকালীন দেশীয় সমাজবাদের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রভাবিত হয়েছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রকে উন্নয়নের পথে স্থাপন করার জন্য সেই সময়ের ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণাকে গ্রহণ করেন। তাঁরা দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্য এবং বন্টনমূলক ন্যায়ের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তাঁদের মনে হয় যে শুধুমাত্র আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণই যথেষ্ট নয়; তাই তখনকার সরকারি নীতির ঝোঁক ছিল সংরক্ষণবাদ, আমদানির বিকল্পের সন্ধান, রাষ্ট্র নির্দেশিত শিল্পায়ন, সমস্ত ব্যবসায়, বিশেষত শ্রম ও অর্থনৈতিক বাজারের সমষ্টিগত স্তরে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, একটি বৃহৎ সরকারি ক্ষেত্র ও তার পাশাপাশি একটি দুর্বল বেসরকারি ক্ষেত্র, ব্যবসাক্ষেত্রে নানা নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মিল পাওয়া যায়। ইস্পাত, খনি, জল, টেলিকম, ইনসিওরেন্স বা জীবনবীমা, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পগুলি ১৯৫০ এর মাঝামাঝি কার্যকরভাবে রাষ্ট্রীয়করণের আওতাধীন হয়। জটিল লাইসেন্স প্রথা, নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি, লাল ফিতের ফাঁস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণগুলি 'লাইসেন্স রাজ' নামে পরিচিত লাভ করে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৯০—এই বিপুল সময়ের মধ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করার জন্য লাইসেন্স রাজ্যের প্রয়োজন হত। এই সময় ভারত সরকার ভারতীয় অর্থনীতিকে বাইরের জগতের কাছে বন্ধ করে দেয়। উচ্চহারে রাজস্ব এবং আমদানির জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থার ফলে বাইরে থেকে পণ্যদ্রব্য ভারতীয় বাজারে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ভারতীয় অর্থনৈতিক নীতিসমূহের মূল ভিত্তি ছিল আমদানি বিকল্পের খোঁজ আর সরকার দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের ওপর নির্ভরতাকে গুরুত্ব দেয়—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নয়। মুক্ত বাজার ও অবাধ বাণিজ্য নীতির বদলে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্র-নির্দেশিত পরিকল্পনার শরণাপন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কত পরিমাণ জোর প্রয়োজন হবে, কি কি উৎপাদিত হবে, কতটা উৎপাদিত হবে, তাদের মূল্য কি হবে ইত্যাদি সব কিছুই

রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত হতে থাকে। আর আমলাতন্ত্র প্রায়শই অযৌক্তিক বিধিনিষেধের বোঝা আরোপ করে—উৎপাদনসংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদানের জন্য কোম্পানিকে অনেক ক্ষেত্রে ৮০টি সংস্থার সন্তুষ্টি বিধান করতে হয়।

উন্নয়ন ও কল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ রূপায়ন এবং বন্টনমূলক ন্যায় ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করতে থাকে। সিদ্ধান্ত করা হয় যে রাষ্ট্র স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং বিশাল সংখ্যক গ্রামীণ অধিবাসী ও সমাজের দুর্বলতর অংশের উন্নয়ন ও বিকাশকে গুরুত্ব প্রদান করবে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচকে বেছে নেন এবং উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নীতিকে উৎসাহিত করেন। ১৯৫০-এর দশকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়—একটি হল পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) এবং অন্যটি হল জাতীয় উন্নয়ন পর্ষৎ (National Development Council)। ১৯৫০ সালে ভারত সরকারের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, এটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে এর কাজগুলি হল দেশের সম্পদের পরিমাপ নির্ণয়, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিরূপণ, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য উপকরণসমূহের নির্ধারণ, পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরে অর্জিত অগ্রগতির ভিত্তিতে সামগ্রিক অগ্রগতির মূল্যায়ন।

১৯৫২ সালে সরকারি প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষৎ গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনার সফল রূপায়নের জন্য দেশের সম্পদ ও বিভিন্ন প্রচেষ্টাসমূহের সমন্বয়সাধন, গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির জন্য সাধারণ নীতি প্রণয়ন এবং দেশের সব অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের সুনিশ্চিতকরণ।

১৯৬৬ সালে ভারত সরকার একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করে। সরকারি কাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের দক্ষতা ও সততার নিশ্চয়তা প্রদান, সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি কার্যকর করার উপযোগী সংস্থা হিসাবে জনপ্রশাসনের গঠন, উন্নয়নের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্য অর্জন এবং জনপ্রশাসনকে জনগণের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা ইত্যাদি ছিল এই কমিটির লক্ষ্য।

১৯৬২ সালে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য সরকারগুলির কাছে পরিকল্পনা কমিশনের আদলে রাজ্য পরিকল্পনা কমিশন গঠনের জন্য প্রস্তাব করে। তাদের কাজ হবে রাজ্যের সম্পদ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। ১৯৬৬ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন একটি ত্রি-স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থার কথা বলে—রাষ্ট্রীয় এজেন্সি, ক্ষেত্রগত পরিকল্পনা এজেন্সি এবং আঞ্চলিক ও জেলা পরিকল্পনা এজেন্সি। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশ মেনে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যগুলিকে রাজ্য পরিকল্পনা কমিশন গঠনের জন্য পুনঃ সুপারিশ করে এবং সাধারণভাবে পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে বলে। কয়েকটি রাজ্যে এই সুপারিশ মত রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়। সেইসব রাজ্য স্তরের প্রত্যেক সরকারই নিজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা বিভাগ সেগুলিকে সমন্বিত করে এবং তাদেরকে খসড়া আকারে প্রস্তুত করে। রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড সেগুলি অনুমোদন করার পর সেগুলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়।

জেলা ও ব্লক স্তরেও পরিকল্পনা ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত আর শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এইভাবে কেন্দ্র, রাজ্য ও তার নিচের স্তরে পরিকল্পনা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীভবন ঘটানো হয়েছে। তবে এই নিচের স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলি খুবই দুর্বল। তারা প্রধানত তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না—চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারসমূহ। ভারতের সংবিধান সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণি, বিশেষত তপশিলি জাতি ও উপজাতি, মহিলা ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধারা অন্তর্ভুক্ত করে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে নীতি ও কর্মসূচিগত নেটওয়ার্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহের উদ্ভব ঘটেছে। ১৯৬৪ সালে সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ সংগঠিত হয় কেন্দ্রীয় স্তরে সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য। ১৯৬৬ সালে এর নাম হয় সামাজিক কল্যাণ বিভাগ আর ১৯৭৯ সালে তা একটি মন্ত্রকে রূপান্তরিত হয়—তার নাম হয় শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ মন্ত্রক। ১৯৮৫ সালে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য দায়িত্বসহ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (Welfare Ministry) প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী ও শিশু বিভাগকে ১৯৮৬ সালে মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রাজ্য স্তরের সমাজকল্যাণ বিভাগগুলি সমাজের দুবর্ল অংশসমূহের উন্নতির জন্য সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহ তদারকি করে। এ সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজ্য স্তরের একজন মন্ত্রীর অধীনে পরিচালিত কল্যাণ বিভাগের হাতে। এই বিভাগের অধীনে জেলা ও ব্লক স্তরের অফিসও আছে।

নারী ও শিশু বিকাশ বিভাগ নারী ও শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করে—পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে, আইন প্রণয়ন করে, এবং নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য কর্মরত সব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থানসমূহের কাজের সমন্বয়সাধন করে। এই বিভাগই জাতীয় মহিলা কমিশন ও রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ গঠন করে এবং জাতীয় পুষ্টিবিধান নীতি গ্রহণ করে, জাতীয় ক্রেশ তহবিল গঠন করে, ইন্দিরা মহিলা যোজনা ও গ্রামীণ নারীদের উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন প্রকল্প ইত্যাদি শুরু করে।

১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শিশুদের জন্য সমসুযোগ সুনিশ্চিত করার জন্য শিশুদের জন্য জাতীয় নীতি রচনা করে। অনেক পিতামাতার কাছেই কন্যা শিশু একটি বোঝা হিসাবে বিবেচিত হত। কন্যাশিশু যাতে বোঝা হিসাবে বৈষম্যের শিকার না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার একটি শ্লোগান তৈরি করে—“সুখী কন্যা শিশু হল দেশের ভবিষ্যৎ।” তাছাড়াও সরকার শিশুকন্যা হত্যা নিবারণের চেষ্টা করে এবং লিঙ্গভিত্তিক যাবতীয় বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল সরকারি সহযোগিতা ও শিশু উন্নয়নের জন্য জাতীয় ইনস্টিটিউট এবং শিশুদের জন্য জাতীয় কমিশন। এছাড়াও সরকার দেবদাসী-মেয়েদের কল্যাণ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইকো-নারীবাদী মনোভাব ও আন্দোলন এখন প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভারতে চিপকো ও নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন হল এ জাতীয় দুটি আন্দোলন। এই সব আন্দোলনগুলি নারীদের অধিকার এবং জল, জ্বালানি, পশুখাদ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন সময়ে সরকার বিভিন্ন আইন রচনা করেছে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য। যেমন—জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪, বায়ু (দূষণ ও প্রতিরোধ) আইন ১৯৮১, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬। ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় স্তরে স্বতন্ত্র পরিবেশ বিভাগ এবং ১৯৮৫ সালে সংযুক্তভাবে পরিবেশ ও অরণ্য মন্ত্রক গঠিত হয়। ভারত সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচির মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শিল্প দূষণ ও শিল্প বর্জ্য হ্রাস, ভারতবাসীদের জন্য বিকল্প শক্তি ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভারতের প্রথম পরিকল্পনা থেকেই তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রয়োজনগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়। সংযুক্ত গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা হল (Integrated Rural Development Plan) এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সংবিধানে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। তাদের জন্য গৃহীত সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলির মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন সৃষ্টি করা হয়। ১৯৫০ সালে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য কমিশনার হিসাবে একজন বিশেষ অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর কাজ হল সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং তাদের কল্যাণের দিকে নজর রাখা। উপজাতীয় কল্যাণ পরিচালনার জন্য রাজ্য ও জেলা স্তরেও কিছু অফিসারদের নিযুক্ত করা হয়। পশ্চাৎপদ হিসাবে চিহ্নিত গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ১৯৫৩ সালে প্রথম পশ্চাৎপদ শ্রেণী কমিশন গঠিত হয়। এজাতীয় দ্বিতীয় কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৮ সালে।

ভারত সরকারের সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচিগুলি ছিল প্রতিরোধমূলক, পুনর্বাসনমূলক ও উন্নয়নমূলক। সমাজের দুর্বলতর অংশগুলির অগ্রগতির সম্ভাবনাসমূহ যাতে বাস্তবায়িত হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এগুলি পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠাসমূহ এই জাতীয় কর্মসূচিগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

জনগণকে সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ভারতের রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.৫ ভারতীয় অর্থনীতি—উদারনীতিবাদী বা উদারিকরণ প্রবণতা—দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারিকরণের প্রচেষ্টা দেখা গেছে ১৯৬৬ সালে, কিন্তু ১৯৬৭ সালে যখন সমাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উদারিকরণ নীতি প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী উদারিকরণের আরো একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি হালকা সংস্কার, লাইসেন্স রাজের সংকোচন এবং টেলিকম শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদির সূত্রপাত করেন, কিন্তু ১৯৮৭ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (১৯৮৯-৯০) ও চন্দ্রশেখর (১৯৯০-৯১) কোন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের দিকে যাননি।

উদারিকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়ণ নীতিসমূহকে অনুসরণ করে ১৯৯১ সালে ভারতে অনেকগুলি সংস্কার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ভারতের বিধ্বস্ত অর্থনীতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তখন সংস্কারমুলক অবস্থার প্রয়োজন ছিল। ভারত সরকারের সমাজকল্যাণমূলক নীতিগুলি ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক ছিল না। ১৯৫০-৮০ সালের মধ্যে ভারতের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৫%, যদিও একই সময়ে পাকিস্থানে তা ছিল ৫%, ইন্দোনেশিয়ায় ৯%, থাইল্যান্ডে ৯%, সাউথ কোরিয়ায় ১০% এবং তাইওয়ানে ১২%। একই সময়ে ভারতে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১.৩% মাত্র। ১৯৮৩-৮৪ সালে ব্যয় ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১০ বিলিয়ন, ১৯৮৪-৮৫-এ তা হয় ৩২ বিলিয়ন আর ১৯৮৫-৮৬ সালে ৩৬ বিলিয়ন। ১৯৬১ সালে বিদেশী ঋণ ছিল ১০৭৩ কোটি, ১৯৬৫ সালে ২৩৪১ কোটি আর ১৯৮০ সালে তা বেড়ে যায় চোদ্দ-পনেরো গুণ। ভারতীয় মূলধনের ৩০% বিদেশী ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয়। ১৯৯০ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল ৩.২% আর তার ৭৬% ব্যয় করা হয় বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য। রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল খুব সামান্য। ১৯৮৯ সালে সরকারি কর্মীদের সংখ্যা

ছিল ১৮.৫ মিলিয়ন আর বেসরকারি এজেন্সিগুলিতে কর্মীসংখ্যা ছিল মাত্র ৭.৪ মিলিয়ন। ভারতীয় অর্থের অনেকটাই কর্মচারীদের বেতনের জন্য খরচ হয়ে যায়। ফলে সে সময় কোন উন্নয়নই সম্ভব হয়নি। ভারতের অধিকাংশ সরকারি কোম্পানিগুলিতে উপযুক্ত প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাব ছিল এবং অত্যধিক বেশি কর্মীদের ভারে সেগুলি ভারাক্রান্ত ছিল। অল্প লাইসেন্স প্রদান করা হত। যারা লাইসেন্স মালিক ছিলেন, তাঁরা বিশাল শক্তিশালী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য স্থাপন করতেন। সরকারি ক্ষেত্রের একচেটিয়া কারবারের ফলে প্রতিযোগিতা ব্যাহত হত এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হত। রাষ্ট্র অধিকৃত সংস্থাগুলি বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। লাইসেন্সরাজ্যের ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে দায়িত্বহীন স্থায়ী আমলাতন্ত্র এবং দুর্নীতি প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

এগুলি ছাড়াও ভারতে তখন অভিনব ঋণ পরিশোধের হিসাব বা ব্যালান্স অফ পেমেন্ট সংকট দেখা দেয়। ১৯৮৫ থেকে ভারত এই সংকটের মুখে পড়ে এবং ১৯৯০-এর শেষে দিকে অবস্থা ভয়াবহ হয়। ভারত তখন ঋণ পরিশোধে অক্ষম বা ডিফল্টার অবস্থায় পৌঁছায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন ক্রেডিট দিতে অস্বীকার করে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবস্থা এমন হয় যে ভারত মাত্র তিন সপ্তাহের মত আমদানি ব্যয় করতে পারে। ভারতকে সুইস ইউনিয়ন ব্যাংকের কাছে ২০ টন সোনা এবং ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ডের কাছে ৪৭ টন সোনা বন্ধক রাখতে হয় এবং আই.এম.এফ.-এর সঙ্গে অর্থসংক্রান্ত চুক্তি সম্পাসন করতে হয়। ভারতের প্রায় দেউলিয়া অবস্থা হয়। ভারতকে তখন বিকল্প নীতি হিসাবে সমষ্টিগত অর্থনৈতিক সমন্বয় নীতি এবং কাঠামোগত সমন্বয় নীতি অনুসরণ করতে হয়। আই.এম.এফ.-এর চুক্তির শর্তের ভিত্তিতে ভারত সংস্কারমূলক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও দেশকে এই ব্যালান্স অফ পেমেন্ট সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি গ্রহণে বাধ্য হন। তাঁর আমলের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতের নতুন সংস্কারমূলক অর্থনৈতিক নীতিটির ঘোষণা করেন, যা ছিল উদারনীতিবাদ (লাইসেন্স রাজের বিলুপ্তি, সরকারি একচেটিয়া ব্যবস্থার অবসান), বেসরকারিকরণ (বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহ দান), এবং বিশ্বায়ন (বিদেশি বিনিয়োগ ও এফ. ডি. আই.-এর অনুমোদন) নীতি। ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য তখন অর্থনৈতিক সংস্কার অনিবার্য ছিল। নরসীমা রাওয়ের অর্থনৈতিক সংস্কার বিলটি পার্লামেন্টে পাশ করা হয়, যদিও তাঁর দলের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেখানে ছিল না। ৫২০টি আসনের মধ্যে পার্লামেন্টে তাঁর দলের মাত্র ২৩২টি আসন ছিল। সাত মাস পর পাঞ্জাবের নির্বাচন থেকে তাঁর দল আরও ১২টি আসন লাভ করে। প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ২৭২টি আসন তাঁর দল সংগ্রহ করতে পারেনি। ডি.এম.কে. ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলের সমর্থনে তাঁর দল শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়—(২৩২+১২+২৮) বা ২৭২টি ভোট পায় (৫২০+২৩)টি আসনের মধ্যে।

রাও আমলের অর্থনৈতিক সংস্কার বিলটি ভারতীয় অর্থনীতিতে নতুন ধারার সংস্কারের সূচনা করে। অর্থনীতির ওপর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হয়, লাইসেন্স ব্যবস্থার অবসান ঘটে, শুল্ক বা করের হারের ক্রমাগত হ্রাস করা হয়, ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য ভারতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশি বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগসমূহের কাছে ভারতীয় অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা হয় এবং জাতীয়করণ নীতির উল্টো পথে হাঁটা শুরু হয়।

উদারনীতিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল মূলধনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিপ্লব, মূলধনের ব্যবহারের পিছনে প্রধান

উদ্দেশ্য হল মুলধন থেকে মুনাফা বৃদ্ধি, সামান্য সুদের বিনিময়ে ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখা নয়। মূলধনকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা সাবধানতার সঙ্গে বিনিয়োগ করতে হবে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনসন প্রকল্প ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাজারে বিনিয়োগ করতে হবে। ব্যাঙ্কে আমানত জমা রাখার ব্যবস্থা ছাড়াও মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যবস্থা আছে—যেখানে সাবধানতার সঙ্গে তার ব্যবহারের কথা লেখা আছে। এখন অর্থনীতিতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদেশী মূলধনের ব্যবহার হচ্ছে। ভারতীয় বাজারের এখন তিনটি ধরন দেখা যায়—ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের বাজার, বিদেশি পণ্যদ্রব্যের বাজার এবং অর্থ বাজার।

নরসীমা রাওয়ের পর জাতীয় জনতা দলের নেতৃত্বে বাজপেয়ী পরিচালিত এন.ডি.এ. সরকার পাঁচ বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে সংস্কারনীতি চালিয়ে যায়। বাজপেয়ী সরকার কর কমানোর ব্যবস্থা করে এবং সরকারি মালিকানাধীন ব্যবসা সংস্থাগুলিতে বেসরকারিকরণ করে—তার মধ্যে ছিল হোটেল, ভি.এস.এন.এল., মারুতি সুজুকি, বিমানবন্দর ইত্যাদি। রাজস্ব নীতির লক্ষ্য হয় ঋণ ও ঘাটতি হ্রাস।

২০১১ সালের শেষ দিকে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ.পি.এ.-২ জোট সরকার খুচরো বাজারে ৫১% বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা এফ.ডি.আই.-এর ব্যবস্থার কথা বলে, কিন্তু জোটসঙ্গী দলগুলির এবং বিরোধী দলের চাপের জন্য তা প্রত্যাহার করে। তবে ২০১২ সালে তা আবার অনুমোদিত হয়।

২০১৫ সালে বি.জে.পি.-র নেতৃত্বে পরিচালিত নরেন্দ্র মোদির এন.ডি.এ. সরকার ইনসিওরেন্স বা জীবনবীমা ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেয়—সেখানে ৪৯% পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বরদাস্ত করা হয়। তাছাড়াও কয়লা শিল্পকেও এই সরকার উন্মুক্ত করে দেয় এবং কয়লা খননের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটায়।

সংস্কার প্রক্রিয়া ও উদারিকরণ এখনও চলছে। এখন সব রাজনৈতিক দলই তা সমর্থন করছে। তবে তার গতি অনেক সময় কায়েমি স্বার্থ ও জোট রাজনীতির জন্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৪.৬ উদারনীতিকরণের নতুন অর্থনৈতিক নীতি এবং এই সংক্রান্ত কিছু আইন

ভারতের নতুন উদারনীতিকরণ নীতির উদ্দেশ্যগুলি হল—

(ক) উচ্চতর অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার অর্জন।

(খ) মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস।

(গ) বিদেশী মুদ্রার তহবিল নির্মাণ।

ভারতের উদারনীতিকরণ কর্মসূচির বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় পার্লামেন্ট কিছু নতুন আইন পাশ করেছে। সেগুলির কয়েকটি হল—

(১) ফেমা (FEMA বা Foreign Exchange Management Act) : ১৯৭৩ সালের বিদেশি বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনকে বাতিল করে ফেমা পাশ করা হয়, যার বিভিন্ন ধারাগুলি বহুজাতিক সংস্থাসমূহের ভারতে প্রবেশকে সহজতর করেছে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) আমদানি রাজস্ব হ্রাস।

(ii) রপ্তানি সাবসিডির অপসারণ।

(iii) Current account-এ টাকার পূর্ণ রূপান্তরনীয়তা।

(iv) বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহদান।

(v) বিদেশি সংস্থার সঙ্গে দেশীয় সংস্থার যুক্ত উদ্যোগ।

(২) কয়লাখনি (বিশেষ ব্যবস্থা বিল), ২০১৫ [Coal Mines (Special Provisions Bill), 2015] : এই আইনটি কয়লা খননের ক্ষেত্রে সরকারি একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়, যা ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণের পর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এই আইনটি কয়লা খনন ক্ষেত্রে বেসরকারি ভারতীয় ও বিদেশি মূলধন বিনিয়োগকে উৎসাহদান করে। দেশি ও বিদেশি বেসরকারি কোম্পানিগুলি কয়লার লাইসেন্সের জন্য টেন্ডারে যোগ দিতে পারে এবং বাণিজ্যিকভাবে কয়লা খনন করতে পারে। ফলে কয়লাশিল্পে লক্ষ লক্ষ ডলার বিনিয়োগের সম্ভাবনা, প্রযুক্তিগত উন্নতির সুযোগ এবং বিশালসংখ্যক কয়লাশ্রমিকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশা থাকছে।

(৩) ২০০৫ সালের তথ্য অধিকার আইন [Right to Information (RTI) Act of 2005] : এই আইনটি সব রকম সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—কেন্দ্রীয় স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্থানীয় স্তর পর্যন্ত। এই আইন অনুসারে তথ্য হল আকরে যে কোন বিষয়—রেকর্ড, দলিল, উপদেশ, মতামত, আদেশ, চুক্তি, প্রতিবেদন, কাগজপত্র ইত্যাদি। এই আইনটি জনগণকে সরকারি সংস্থাসমূহের যে কোন তথ্য জানার সুযোগ প্রদান করে। সরকারি দলিল, ফাইল ইত্যাদি জনসমক্ষে হাজির করার ব্যবস্থা করে। এই আইনের ব্যবহারের ফলে সরকার জনগণের কাছে তার কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকে এবং সরকারের সব কর্মচারীদেরকেই দেশের দরিদ্রতম নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

৪.৭ ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারিকরণের প্রভাব

তিনটি ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর উদারিকরণের প্রভাব দেখা যায়—

(i) গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতি ।

(ii) শিল্প ও বাণিজ্য।

(iii) প্রযুক্তিগত ও তথ্য সংক্রান্ত উন্নয়ন।

ভারতে উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের পর যন্ত্রপাতি, ফার্টিলাইজার বা সার (কৃত্রিম ও জৈবিক)-এর প্রয়োগ, উন্নত বীজের ব্যবহার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সাহায্য ইত্যাদির জন্য গ্রামীণ ভারতের কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রথম দিকে এই বৃদ্ধির হার বেশ কম ছিল পরে তার গতি বেশি হয়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও যানবাহনের উন্নতি ইত্যাদি গ্রামের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়েছে, বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, মোটরবাইক ইত্যাদি গ্রামীণ সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি গ্রামে সহজলভ্য হয়ে গেছে। পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং তথ্যের প্রয়োগ ও প্রসারের

কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। এখন তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষাকেন্দ্র বা স্কুল কলেজ ইত্যাদি গ্রামে পৌঁছে গেছে, যেখানে গ্রামের ছেলে ও মেয়েরা শিক্ষালাভ করছে। গ্রামের লোকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা প্রচার মাধ্যমগুলির সাহায্যে তাদের মতামত প্রকাশ করছে। গ্রামেও প্রচারমাধ্যমগুলির উপস্থিতি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন ভারী শিল্পের দ্রুত বিকাশ সম্ভব করেছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল ৮.৪%, এখন তা বহুগুণ বেড়ে গেছে। অর্থনীতিবিদ্‌দের ধারণা যে ২০২৫ সালে জাতীয় আয় ৬% থেকে ১১% বৃদ্ধি পাবে। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এখন তৃতীয় স্থানের অধিকারী—আমেরিকা ও চিনের পর। উদারিকরণ—বেসরকারিকরণ—বিশ্বায়ন ভারতের বাজার ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো ভারতও তার পুরনো অর্থনৈতিক আচরণ ও সাবেকি রীতিনীতির পরিবর্তন করেছে। এম.আর.টি.পি. আইন, ১৯৬৯ (সংশোধিত), করব্যবস্থার সংস্কার, মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ, বিদেশের সঙ্গে প্রযুক্তিগত চুক্তি, বিদেশি বিনিয়োগ, সাগর পারের লেনদেন ইত্যাদি ভারতে উন্নয়নের উপযোগী শিল্প পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বস্তুত, যে কোন অনুন্নত অর্থনীতির বিকাশ বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিল্প উন্নয়ন অপরিহার্য্য।

ভারতে উদারিকরণজনিত সংস্কার নীতিসমূহের প্রবর্তনের প্রভাবে ভারতের সামগ্রিক বিদেশিক বিনিয়োগ (প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, পোর্টফোলিও বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার থেকে উত্থিত বিনিয়োগ) ১৯৯১-৯২ সালের, ১৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫.৩ বিলিয়নে পৌঁছে যায়। মাথাপিছু জি.ডি.পি. (GDP) $১\frac{১}{৪}$% থেকে বেড়ে $৭\frac{১}{২}$% হয়। বিশেযজ্ঞরা মনে করেন যে কয়েক বছরের মধ্যে তা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

পরিষেবা ক্ষেত্রের মধ্যে যেসব দিকে নিয়ন্ত্রণ অনেক পরিমাণে তুলে দেওয়া হয় বা কমিয়ে দেওয়া হয়, সেসব দিকে সন্তোষজনক অগ্রগতি ও বিকাশ ঘটেছে, যেমন জীবনবীমা, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ইন্টারনেট যোগাযোগ, প্রযুক্তিগত পরিষেবা ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে এবং প্রতিযোগিতার দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে। টেলিকম, বেসামরিক বিমান চলাচল ইত্যাদিতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ কার্যকর অবদান রাখতে পেরেছে।

চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, নয়ডা, গুরগাঁও, গাজিয়াবাদ, পুনা, ইন্দোর, জয়পুর ও আহমেদাবাদ শহরগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে গেছে। তারা বিদেশি সংস্থানের দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। ভারত সরকারের উদারনীতিকরণের নীতি লাইসেন্স প্রথার কঠোরতা হ্রাস করে এবং বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করে বিদেশি বাণিজ্য ও এফ.ডি.আই.-এর পথ সুগম করেছে, ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সংযুক্ত করেছে এবং বিশ্বায়নকে সম্ভব করেছে। অতিরিক্ত সংরক্ষণপন্থী ভারতীয় বাজার বিদেশি কোম্পানি এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে উন্মুক্ত করার পর শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে—গত দু'দশকে শিল্পের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ভারতের শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ঘটেছে এবং ভারতের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিল্প লাইসেন্স নীতি, শিল্পের স্থানগত নীতি, ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির জন্য নীতি, পরিবেশ নীতি ইত্যাদির পরিবর্তন হয়েছে এবং ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন দিকের উন্মোচন হয়েছে। তাদের

মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সফটওয়্যার (Software) শিল্প, যা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ১৯৯১-৯২ সালে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৫.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে যায়।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০১৩ সালের ৩রা জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১০০তম বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনে জানান যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত ২০০৩ সালের নীতির পরিবর্তন করা হবে। তারপর সাততি মিটিং-এ দীর্ঘ আলোচনা চলে, বিভিন্ন শিল্পের প্রতিনিধিরা এবং বিখ্যাত বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়ে ২০১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ঘোষণা করেন। এর উদ্দেশ্য হল জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology), রসায়ন বিজ্ঞান, পৃথিবীসংক্রান্ত বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ইত্যাদি সংক্রান্ত গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং মহিলা বিজ্ঞানীদের উৎসাহ প্রদান। ভারতের এই নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ছিল ভারতের দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ এবং পরবর্তী সময়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ছিল এর লক্ষ্য। ভারতের নতুন উদারিকরণ নীতি ভারতে ওষুধ শিল্প উন্নতি ঘটিয়েছে, যা জনগণের স্বাস্থ্যোন্নতি, আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্ভব করেছে। উদারনীতিকরণের নতুন নিয়ন্ত্রণগুলি ভারতের ইনসিওরেন্স ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নতি করেছে, অধিকতর টেকসই (sustainable) উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে এবং খাদ্যদ্রব্য ও শক্তিসংক্রান্ত ক্ষেত্রকে উন্নততর করেছে।

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি হল সিমেন্ট, ইস্পাত, সফট্‌ওয়্যার, খনন কাজ, পেট্রোলিয়াম, ওষুধ ব্যবসা, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং উল, সিল্ক ও মৃৎশিল্প। এইসব ধরনের শিল্পেই আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া দেখা গেছে। ভারত এখন বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)-কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং প্রবাসী বা অনাবাসিকে ভারতীয় বা NRI-দের আকর্ষণীয় সুযোগ প্রদান করছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ঘটছে। বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ এবং সাধারণ কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যেগুলি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর কাছে শিক্ষার সুবিধাগুলি পৌঁছে দিচ্ছে।

শেয়ারবাজার বা স্টকমার্কেট হল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে কর্পোরেট নিরাপত্তা বা সিকিওরিটি নিয়ে লেনদেন বা ব্যবসা করা হয়, যা মুক্ত বাজারের প্রাণকেন্দ্র। ভারতীয় স্টক মার্কেট দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করেছে এবং সেখানে শিল্প সংস্থাগুলি তাদের সিকিওরিটিসমূহকে স্বাধীনভাবে ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারছে। উদারিকরণ নীতি গ্রহণের পর থেকে ভারতীয় বেসরকারি তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিকম পরিষেবা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে এবং ভারতীয় টেলিভিশন পরিষেবার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। ভারতের সফট্‌ওয়্যার পণ্যদ্রব্যের আমদানি বেড়ে গেছে, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩.৫ মিলিয়ন লোক সফটওয়্যার শিল্পে নিযুক্ত। তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষার চাহিদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে ভারতে বেসরকারী তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্র ব্যাঙের ছাতার মত এখানে সেখানে গজিয়ে যাচ্ছে।

সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটেছে। তাছাড়াও তাদের মূল্য, শেয়ার মূল্য, অর্থসংক্রান্ত নীতি, বাজেট ইত্যাদি বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থবাজার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় অর্থনীতি এখন বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত।

৪.৮ উদারিকরণের অসুবিধাসমূহ

উদারনীতিকরণ কি একটি সর্বব্যাপী উন্নয়নের কৌশল কিংবা নয়, তা হল সাম্প্রতিক বিতর্কের বিষয়। তবে

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে উদারনীতিকরণ যেসব অসুবিধার সৃষ্টি করে সেগুলির জন্য তার সমালোচনা করা হয়। সেই অসুবিধাগুলি হল—

ভারতে কৃষি হল অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ, যেখানে ৬০% লোক নিযুক্ত আছে। কৃষিক্ষেত্রের বৃদ্ধি ঘটেছে ধীর গতিতে। কৃষক তার জমির জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ বা দামি বস্তু বা সোনা বন্ধক রেখে বড় কোম্পানির কাছ থেকে সার বা প্রযুক্তি কেনে। উভয় ক্ষেত্রেই তাকে উচ্চ হারে সুদ প্রদান করতে হয়। যদি কৃষক তার প্রত্যাশিত উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়, কিংবা যদি অতিরিক্ত বৃষ্টি বা খরার জন্য তার উৎপাদন নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা যদি সে তার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য যথেষ্ট মূল্য না পায়, তাহলে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ২০০৯ সালের সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে গত পনেরো বছরে ২.৫ লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিল নাড়ু, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে কৃষক আত্মহত্যার অসংখ্য উদাহরণ আছে। উদারিকরণ—বিশ্বায়ন—বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। ২০০৯ সালে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি হয় যে ইউরোপীয় ইউয়িনভুক্ত দেশগুলি ভারতের বাজারে পাস্তুরিত বা স্কিম দুধ আমদানি করবে। দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে ১৪.৮ লক্ষ ভারতীয় যুক্ত আছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি থেকে স্কিম দুধ আমদানির ফলে তাদের আয় ৬০% কমে যায়। তাছাড়াও দেখা গেছে যে ৫০% লোক পোলট্রি ফার্মিং বা হাঁসমুরগী চাষের সঙ্গে যুক্ত। তারা ডিম বা মাংস বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ইউরোপীয় বহুজাতিক সংস্থাগুলি এই বাজারেও প্রবেশ করছে। ফলে ভারতের পোল্ট্রি ফার্মিং ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা খাদ্য ও বাসস্থান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

৩৫ থেকে ৩৮ মিলিয়ন লোক ভারতীয় বাজারে বা রাস্তার ধারে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করে। বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলি, যেমন মেট্রো, বিগ বাজার, স্পেন্সার তাদের পেশাকে ব্যাহত করছে, কারণ তারা একই ছাদের নিচে বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। ফলে লোকে ঘুরে ঘুরে রাস্তা বা বাজার থেকে দ্রব্য ক্রয়ে কম উৎসাহ দেখায়।

২০০৫ সালে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে ‘কৃষি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরিষেবা ও বাণিজ্য সংযোগ সংক্রান্ত উদ্যোগ, বিষয়ে একটি চুক্তি হয়, যা এ.কে.আই. (AKI) নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুসারে কৃষি উৎপাদনের জন্য জিন প্রতিস্থাপিত বীজ (Gene manufactured seeds বা G.M.) ব্যবহৃত হবে। এই জাতীয় উৎপাদনের জন্য প্রচুর জল লাগে আর কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়, যার মধ্যে আবার আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড থাকে। জি.এম. উৎপাদন তাই আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষণ বৃদ্ধি করছে। অর্থাৎ মাটির নিচের জলস্তরের পরিমাণ কমে যাচ্ছে আর দূষণ বৃদ্ধি ঘটছে। জি. এম. ব্যবহারের ফলে শুধু যে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, জমিও নিষ্ফলা হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও জি. এম. উৎপাদনের ফলে গ্রামীণ লোকদের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা যাচ্ছে আর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৃষি পণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় ৪০০০ ধরনের বৈচিত্র্যযুক্ত ধান ছিল, সেগুলির অধিকাংশই এখন আর পাওয়া যায় না। অত্যধিক নিয়ন্ত্রণমূলক শ্রম আইন, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, অতিরিক্ত দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান হ্রাস, দুর্নীতি বা ঘুষের ক্রমবর্দ্ধমান উদাহরণ, প্রতারণার সংখ্যা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ইচ্ছা ও মতৈক্যের অভাব এবং আয়গত বৈষম্য বৃদ্ধি—এই বিষয়গুলি ১৯৯২ থেকে শিল্পক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। দেখা গেছে যে দরিদ্রদের মধ্যে খরচের পরিমাণ স্থিতিশীল, কিন্তু ধনীদের খরচ বৃদ্ধির প্রবণতা প্রবল। তাছাড়াও ২০১২-১৩ সালে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি খুব কম ছিল—৫% মাত্র।

নতুন সংস্কারমূলক অর্থসংক্রান্ত নীতি রপ্তানি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং খাদ্য ও ক্যালোরির দিক থেকে পুষ্টি বৃদ্ধি ঘটাতে পারেনি এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ঘাটতি বাড়িয়ে দিয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে সাইবার অপরোধ বেড়ে গেছে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

ভারতের ১৭% কৃষক ৮০% জমির অধিকার ভোগ করে, আর ৮৩% কৃষকের মাত্র ২০% জমির এক্তিয়ার আছে। জমিহীন কৃষকদের জমির অধিকার দেওয়া যায়নি। ১৮৯৪ সালের জমি অধিকার আইন এখনও অপরিবর্তিত, যদিও ব্যবসামালিক ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তার পরিবর্তন প্রয়োজন।

খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সব বিষয়ই অতিজাতিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন, যেমন ভারতের টাটা, আম্বানি ইত্যাদি শিল্পপতিদের উদ্যোগ বা বিদেশী অতিজাতিক সংস্থা, যেমন ওয়ালমার্ট। এর ফলে ভারতীয় ও বিদেশি শিল্পমালিক বা বহুজাতিক সংস্থাগুলির ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশীয় সাধারণ উদ্যোগের ক্ষতি হচ্ছে।

ভারতে অতি-আধুনিক ও অতি-প্রাচীন উৎপাদন ধারা পাশাপাশি অবস্থান করে—ব্যক্তিগত আইন বোর্ড ও খাপ্ বা ক্যাঙ্গারু কোর্ট পাশাপাশি দেখা যায়। সম্পদ ও দারিদ্র্যের পাশাপাশি অবস্থান হল ভারতের সামাজিক বৈশিষ্ট্য। ভারতে বড় বড় মনোরম প্রাসাদোপম অট্টালিকার পাশেই দেখা যায় নোংরা অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ বা বস্তি।

তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব ও তথ্যের অবাধ যাতায়াত এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ভারতে সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ও সন্ত্রাসবাদী ধ্বংসপ্রবণতা অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

ভারতে উদারিকরণের ফলে সাধারণভাবে শিল্পক্ষেত্রের অনেক উন্নতি ঘটেছে। যদিও তা যথেষ্ট উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়। তাই আমদানির বিকল্প সন্ধান সম্ভব হয়নি। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দিকে গবেষণা কাজের ক্ষেত্রেও অনেক ঘাটতি দেখা গেছে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বিপুল সংখ্যক সরকারি ক্ষেত্রের অবলুপ্তি বা ধ্বংস ঘটেছে। অসুস্থ শিল্প এককগুলিকে অপসারণ করা হচ্ছে। চাকরি ক্ষেত্রের ওপর তার গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বায়ন ও বিশ্ববন্ধন ভারতের জাতীয়তার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলে ভারতীয় রাষ্ট্র বা ভারতীয় জাতির ধারণা এখন দুর্বল হয়ে গেছে ; পরিবর্তে পশ্চিমীকরণ বা পশ্চিমী সংস্কৃতির অনুকরণ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতা দেশীয় সংস্কৃতির ধ্বংস ডেকে আনছে।

৪.৯ উদারিকরণের সুবিধাসমূহ

ভারতে উদারিকরণের নীতি গৃহীত হওয়ার পর প্রথম দিকে কৃষিক্ষেত্রের বেশি উন্নতি ঘটেনি। তবে শীঘ্রই ভারতীয় কৃষকরা কয়েকটি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে, যেমন গম, ধান, মেজ ইত্যাদি শস্যের উৎপাদন, সর্ষের তেল, সূর্যমুখী তেল ইত্যাদি তৈলবীজ থেকে উৎপাদন, আখ, বিট ইত্যাদি চিনি উৎপাদনকারী উদ্ভিদ, ডাল, চা, কফি ও ওষুধ উৎপাদনকারী প্রকল্প। ভারতের বাসমতী চাল রপ্তানি থেকে বিদেশি মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। ভারতীয় তুলসি গাছও রপ্তানির অন্যতম বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অনেক চাকরি সৃষ্ট হয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে এই সব বিষয়ের

ওপর ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বেড়ে গেছে। ভারতে বি.পি.ও. ও কে.পি.ও. বুম পরিলক্ষিত হয়েছে। এগুলি থেকে ভারতের রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় বেড়ে গেছে।

উদারনীতিকরণ ভারতে নীতিগত নমনীয়তা, শিল্প উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত বৃদ্ধি, গবেষণার নতুন সুযোগ ও সৃজনশীলতার অগ্রগতি এনেছে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের বিভিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা গেছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে দক্ষতা ও কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও সংবেদনশীলতা, ব্যবসাসংক্রান্ত উচ্চ ধরনের কৌশল এবং আধুনিক বাণিজ্য নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতে সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ঘটেছে। সরকারি ক্ষেত্রের অনেক কাজ এখন চুক্তি দ্বারা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে প্রদান করা হচ্ছে আর আমলাতন্ত্রের কিছু কাজ বেসরকারি সংস্থা ও এন.জি.ও.গুলিকে হস্তান্তরিত করা হচ্ছে। সরকার মন দিচ্ছে শুধুমাত্র সমাজের নিচুতলার বাসিন্দদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজগুলির প্রতি। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ এখন অনেক পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনীতির ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল করা হয়েছে। ফলে প্রশাসনের ওপর কাজের চাপ অনেক কম হয়েছে।

বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং তাদের বিশেষীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি শুধু যে উৎপাদনের পরিমাণগত ও গুণগত উন্নতি এসেছে তাই নয়, মূল্য হ্রাস, প্রযুক্তিগত ও পরিচালনা সংক্রান্ত উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার উচ্চতর মান সম্ভব করেছে। আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলি প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। সাবেকি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ফাইল সংরক্ষণ, গোপনীয়তা, দীর্ঘসূত্রতা এবং লাল ফিতের বাঁধন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এগুলির বদলে এখন দেখা যাচ্ছে বিনিয়ন্ত্রণ, তথ্য যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, দ্রুতগতিতে কাজ, কম্পিউটারের ওপর নির্ভরতা, সরকারি দপ্তরের কর্মীসংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি।

প্রশাসনসংক্রান্ত তথ্যসমূহ এখনকার উদারনৈতিক ভারতে সহজলভ্য। যোগাযোগ ও প্রচারমাধ্যমসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইন্টারনেটের সুযোগের ফলে ভারতের জনগণ এখন সরকার, প্রশাসন এবং বিভিন্ন ব্যবসা সংগঠন সম্বন্ধে তথ্য জানতে পারছে। তারা এইসব মাধ্যমগুলিতে তাদের মতামতের প্রতিফলিত করতে পারছে। এগুলি প্রশাসন সম্বন্ধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করছে এবং প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করছে।

উদারনীতিকৃত ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রশাসনের অনেক কাজ এখন সাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ। বর্তমানে র‍্যাশন কার্ড প্রস্তুতি, জাতীয় ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি, জমিসংক্রান্ত রেকর্ডের হিসাব, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পেন্সন জাতীয় ইনসিওরেন্স ইত্যাদি আধুনিক তথ্য যুক্ত। অর্থাৎ উদারিকরণ—বেসরকারিকরণ—বিশ্বায়ন ভারতীয় সরকারের কাজ ও দায়িত্বভারকে সীমাবদ্ধ ও লঘু করেছে, কিন্তু বেসরকারি ক্ষেত্রের কাজ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করেছে। শুধু ভারতীয় বেসরকারি সংস্থা নয়, বিদেশি বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও আধুনিক ভারতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে; বিশ্ব অর্থনীতিতে পরস্পর-নির্ভরশীলতা ও ঐক্যপ্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় অর্থনীতি এখন বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে এবং ভারতে বিদেশি মূলধনের অবাধ প্রবাহ দেখা যাচ্ছে। ভারত এখন প্রবলভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে। নতুন উদারিকরণ—বিশ্বায়ন—বেসরকারিকরণ নীতি ভারতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদের সন্তোষজনক ব্যবহার, মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, উচ্চস্তরের নাগরিক জীবনযাত্রা, খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্ভব করেছে। তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিকম ক্ষেত্রের উন্নতি হয়েছে, অবাধ বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য

ভারত এবং অন্য একটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। ভারত এখন সার্ক, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও ডব্লিউ.বি.টি.ও, (SAARC, United Nations & WTO)-র সদস্য। ভারত সরকার উপলব্ধি করেছে যে অন্যান্য দেশের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তনের প্রতি নজর না রাখলে ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্য টিকে থাকতে পারবে না। ভারত এখন বিশ্ব অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং অনেক রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসার অংশীদারিত্বে যুক্ত। বর্তমান বিশ্বে পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বিশ্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হচ্ছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাজপেয়ীর নির্বাচন এবং তাঁর উদারনীতিকরণ—বেসরকারিকরণ—বিশ্বায়ন কর্মসূচি (মুক্ত অর্থনীতি, বেসরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহ) ভারতীয় অর্থনীতিতে কাম্য পরিবর্তন ছিল। তিনি সমাজকল্যাণ ও সংরক্ষণমূলক অভিভাবকের পুরনো নীতিকে পুরোপুরি বিদায় জানান। বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বের অল্পদিন পরেই পশ্চিমের দেশগুলি ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি ও বি.পি.ও.-কে পছন্দ করতে থাকে এবং ২০০৪ সালে তারা ভারতে বিনিয়োগ নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা করে। বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ দিকে বিদেশি বিনিয়োগের উপযোগী কাঠামো গড়ে তোলা হয়। পরবর্তী সরকারগুলি ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য সেই কাঠামোকে আরো দৃঢ়তর করে। এ.টি.কিয়ারনির মতে কারখানাজাত উৎপাদন, টেলিকম ও উপভোগ সংস্থাগুলির মধ্যে ভারতের শক্তিশালী ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যায়।

৪.১০ উপসংহার

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের জন্য সংস্থা (Organisation for Economic Cooperation and Development বা OECD)-র প্রতিবেদনে ভারতের সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা হয়। সেখানে বলা হয় যে শ্রমবাজারে সেই সব সংস্থাগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে, যেগুলিতে শ্রম আইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আর সেইসব ক্ষেত্র, যেখানে শ্রম আইন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়, সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমহ্রাসমান। সেই সব ভারতীয় সংস্থাগুলি ক্রমশ মূলধনভিত্তিক হয়ে পড়েছে, যদিও দেশের মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় ও সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায়। ব্যাপক-ভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব করার জন্য এবং ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমশক্তির জন্য পর্যাপ্ত ও উচ্চ ধরনের কর্মসংস্থানের জন্য শ্রম-বাজারের সংস্কার প্রয়োজন।

পণ্যদ্রব্যের বাজারে অদক্ষ সরকারি পদ্ধতিসমূহ উদ্যোগপতিদের কাছে বাধা হিসাবে প্রতিভাত হয়। সেগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন। সরকারি কোম্পানিগুলি বেসরকারি কোম্পানিগুলির তুলনায় কম উৎপাদনশীল। তাই বেসরকারিকরণ কর্মসূচিকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

অর্থবাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এবং কিছু পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে উন্নয়নের ব্যাপারে বাধাগুলির দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সরলীকরণ প্রয়োজন, যাতে প্রকৃত জাতীয় বাজার গড়ে উঠতে পারে, তা দেখা প্রয়োজন আর প্রত্যক্ষ করের বোঝা কমানো প্রয়োজন। সরকারি খরচ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে এবং সাবসিডি কমাতে হবে। সামাজিক সুযোগসুবিধা দরিদ্রদের কাছে যাতে পৌঁছতে পারে, এমন সামাজিক নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে মানব মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে।

OECD রিপোর্টের উপসংহারে বলা হয় যে যদি পরিকাঠামো, শিক্ষা ও মূল পরিষেবাগত উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

৪.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিত থেকে উদারনীতিবাদী দর্শনের আলোচনা করুন।

(২) সদ্যস্বাধীন ভারতে সামাজিক কল্যাণ ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক নীতিটি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) বিংশ শতকের শেষ দিকে ভারত সরকার কেন উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করে?

(৪) ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারীকরণ নীতির প্রভাব আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) উদারীকরণ নীতির কি কি সুবিধা আছে?

(২) উদারীকরণ নীতির কি কি অসুবিধা দেখা যায়?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) উদারনীতিবাদ বলতে কী বোঝেন?

(২) সামাজিক কল্যাণ নীতিটি স্বাধীনতার কিছু বছর পর ভারত সরকার কেন পরিত্যাগ করেছিল?

(৩) ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত নতুন অর্থনৈতিক নীতির কি কি উদ্দেশ্য ছিল?

(৪) ভারতে উদারীকরণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতীয় সংসদ দ্বারা গৃহীত চারটি আইনের উল্লেখ করুন।

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

Chandrasekharan, Balkrishnan, *Impact of Globasation on Developing Countries and India.*

Gills, S. and Law, D., *The Global Political Economy : Perspectives, Problems and Policies*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1988.

Goyal, Krishnan A., "Impact of Globalisation on developing countries with special reference to India", *International Journal of Finance and Commerce,* issue 5.

Hettne B and others, *Globalisation and the New Regionalism*, MacMillan Press Ltd., London, 1999.

Todaro, M. P., *Economic Development*, Longman, New York, London. 1994.